সুলেখক 'শঙ্করকে'
গুণমুগ্ধ
শচীন ভৌমিক

ভূমিকা

এ যাবৎ প্রকাশিত আমার যাবতীয় রচনাসম্ভার থেকে মনোনীত করে এই ওমনিবাস জাতীয় সংকলনটি প্রকাশ করা হ'ল। কিছু পাঠক মনে করেন আমার লেখা ঘুমপাড়ানীয়া, আবার কেউ কেউ বলেন লেখাগুলো ঘুমকাড়ানীয়া। বোঝা যাচ্ছিল দু'পক্ষই আমার লেখা শুয়ে শুয়ে পড়েন। সুতরাং যেহেতু আমার লক্ষ্য বৃহৎ পাঠকসমাজ, সেজন্যে সবাইকার শোবার ঘরে ঢুকে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নামকরণ করেছি তাই—'বেডসাইড শচীন ভৌমিক'। বন্ধুদের মতে আমার শ্রেষ্ঠ গল্প, রম্যরচনা ও সমালোচনা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সংকলন এইটি। শত্রুরা কি বলবেন জানি। কিন্তু তাঁদের মতামত লেখবার জন্য এই 'ভূমিকা' লিখতে বসিনি।

আজ শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র, সাগরময় ঘোষ ও রমাপদ চৌধুরী এই তিনজনের কথা মনে পড়ছে। কেননা প্রথম যখন লেখা শুরু করি তখন এঁরা অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন। এঁরা ভেবেছিলেন হয়তো যে একদা সাহিত্য মন্দিরের প্রধান পূজারীদের মধ্যে আমি একজন হতে পারবো। সাধ ছিল। কিন্তু হয়তো সাধ্য ছিল না, সাধনা ছিল না। তাঁদের ও আমার সে স্বপ্ন সফল হয়নি। কিন্তু আজ এ বই দেখে ওঁরা বুঝতে পারবেন আমি প্রধান পূজারী হইনি, তবে নাস্তিকও হইনি। মন্দিরের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে এখনও পুষ্পাঞ্জলি ছুড়ে যাচ্ছি। এই সামান্য পুস্তক সে পুজোরই একটি ক্ষুদ্র অঞ্জলি।

শচীন ভৌমিক

শেষ পর্যন্ত বাসা পেলাম ভারসোবায়। শহর দূর, তবে সমুদ্র কাছে। একেবারে গায়েই বলা যায়। ঘরটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এসে প্রথমেই বইয়ের ট্রাঙ্ক খুলে বই সাজাতে বসলাম। প্রথম বইটা তুলেই জিভ কাটলাম। বন্ধুর বই, ফেরত দেওয়া হয়নি। অনেকবার চেয়েছিল বেচারা, কিন্তু বলেছি—ও বই আমার কাছে নেই। এখন ট্রাঙ্ক খুলতেই বেরুলো। জিভ কেটে বইটা শেষ পর্যন্ত র‍্যাকে রাখলাম। র‍্যাকে সবসুদ্ধু বাহান্নখানা বই ধরল। এই বাহান্নখানা বই সাজাতে আমি মোট বত্রিশবার জিভ কেটেছি। অন্য বইয়ের ট্রাঙ্কটা খুলে যখন আমি তেত্রিশবার জিভ কাটলাম তখনই শুনতে পেলাম। কড়া নাড়ছে কেউ। দরজা খুলে দেখি বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়েসের একজন লোক দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই সেলাম করল। বলল—আমি গুর্খা।

ঃ গুর্খা? কই চেহারা দেখে তো তোমাকে নেপালের লোক মনে হচ্ছে না।

ও বলল—না আমি ইউ. পির লোক। আমি রাত্তিরে এ-পাড়ায় পাহারা দিই, তাই সবাই আমাকে গুর্খা বলেই ডাকে।

আমি চুপ করে রইলাম। ইতস্ততঃ করে ও বলল—সবাই আমাকে এর জন্যে মাসে এক টাকা করে দেয়।

বললাম—বেশ, আমিও তাই দেব।

আবার নির্বাক গুটিকয়েক মুহূর্ত। তারপর গলা খাঁকরি দিয়ে বলল—আজই এলেন বুঝি?

ঃ হ্যাঁ, এখনো কিছু গুছোনো হয়নি।

ঃ তা ইয়ে, বাঈকে কবে আনবেন?

হাসলাম, বললাম—বাঈ আসবে না এখন, এ ভাই-ই শুধু থাকবে। পরিষ্কার করে বললাম--আমি সাদী করিনি। একা থাকব।

ঃ ও—একটু যেন আহত হল,—আপনার রান্নাবান্না কে করবে?

ঃ চাকর।

ঃ আর অফিসে খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য ডব্বাওয়ালাকে ঠিক করবেন তো?

ঃ না,—বললাম, —আমি সিনেমা লাইনে কাজ করি, কোন অফিস-টফিস নেই।

একটু কৌতূহলী হল গুর্খা—আপনি প্লে করেন?

ঃ না, লিখি।

ঃ কাহিনী?

ঃ হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আপনার সকালের দুধ আমি কিন্তু আনব।

ঃ তোমার গরুও আছে নাকি?

ঃ না বাবু, সকালে গরমেন্টের মিল্ক সেন্টার থেকে লাইন দিয়ে আমি দুধের বোতল এনে

সব বাড়ি বাড়ি দিই, বোতল পিছু সবাই আমাকে দু'পয়সা দেয়।

ঃ বেশ, আমার চাকরকে জিজ্ঞেস করে তোমাকে বলে দেব ক'বোতল দুধ দরকার, বিকেলে এস।

ঃ আচ্ছা জী সেলাম, --চলে গেল গুর্খা।

রাত্তিরে অভ্যাসমত বুকের নীচে বালিস চেপে উপুড় হয়ে লিখতে লিখতে চোখ চলে গেল জানালার বাইরে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভারসোবার তটে আরব সাগর সগর্জনে ফসফরাসের মুক্তো ছিটিয়ে জোনাকী-জোনাকী খেলছে। জানালা দিয়ে সেই নীল জোনাকী-পাড় ঢেউ-শাড়ির খেলা দেখছিলাম আর ভাবছিলাম তারারা একাগ্র চোখে যে পৃথিবীর নাটক দেখে চলেছে তার শেষ কবে? কখন আসবে পৃথিবী-নাট্যের ক্লাইমেক্স? কখন আসন ছেড়ে মেঘের রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যাবে তারারা। কখন, কবে?

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। চমকে উঠলাম লাঠির শব্দে। সজোরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কে আসছে এত রাতে? শব্দ বাড়তে বাড়তে আমার দরজায় এল। তারপর শুনতে পেলাম গুর্খার গলা- সিন্‌মা বাবু, জেগে আছেন?

দরজা খুলে বললাম--হ্যাঁ। তুমি বুঝি পাহারায় বেরিয়েছ?

ঃ হ্যাঁ বাবু, এখন বারোটা, এটা আমার চক্কর। ফের দুটোয় একবার ঘুরবো, আবার চারটের দিকে। তা আপনি জেগে যে?

বললাম--রাত্তিরেই আমি লিখি। রাত্রে কাজে মন বসে। বলেই মনে হল কাজে এতক্ষণ আমার মন মোটেই ছিল না। আরব সাগরের আরব্য উপন্যাস থেকে মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ঃ দেশলাই আছে বাবু?

ঃ হ্যাঁ। দিলাম। বিড়িটা জ্বালিয়ে গুর্খা বলল--কি কহানী লিখছ বাবু, মোহাব্বতের?

হেসে বললাম--হ্যাঁ।

ঃ আপনা জীন্দগীকা?--

ঃ না না, বললাম সকৌতুকে, --আমার জীবনের প্রেমের কোন গল্প নয়। বানানো।

ঃ ও, বানায়োটী।

ঃ হ্যাঁ, --বললাম--বানায়োটী। সিনেমার গল্প তো বানায়োটীই হয় ভাই।

গুর্খা তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বলল--বানায়োটী! আচ্ছা সাব সেলাম। চলে গেল ও।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর লাঠির কর্কশ শব্দ শুনলাম। তারপর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে কলম নিয়ে লিখলাম--থার্ড সিকোয়েন্স। ব্রাকেটে লিখলাম ড্রিম সিকোয়েন্স। সিন নম্বর ৩২। তারপর শুরু করলাম লিখতে হিরোইন কি করে পরী সেজে ইন্দ্রের সভায় পৌঁছে গেল ও কি করে হুলা-হুপে রম্বা নাচতে নাচতে ভগবানদের একেবারে মুগ্ধ করে ফেলল ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর প্রায় রাতেই প্রথম চক্করে ওর সঙ্গে দেখা হতে লাগল, কখনো কখনো দ্বিতীয় চক্করেও। অনেকবার বলেছি আমার নাম মানসবাবু, সিন্‌মাবাবু নয় কিন্তু ও আমাকে সিন্‌মাবাবুই ডাকত। আমিও অবিশ্যি ওর নাম যে কিশোরীলাল তা জেনেছিলাম কিন্তু গুর্খাই ডাকতাম। দিনে ওর সঙ্গে কোনদিন দেখা হয়নি। একদিন বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ কানে এল-- সিন্‌মাবাবু! ঘুরে দেখি গুর্খা।

কি খবর ?

গুর্খা খুব কাঁচুমাচু মুখে বলল—আমায় মাপ করে দিন বাবু।

অবাক কাণ্ড, হঠাৎ কি অপরাধ ও করেছে যে ক্ষমা চাইছে। নেশাটেশা করে নি তো ? বললাম—কি বলছ তুমি! কি করেছ যে মাপ চাইছ আমার কাছে ?

জী,—বলল গুর্খা,—চিমন আমাকে আজ থেকে দুধ দিতে মানা করেছে। চিমন আমার চাকরের নাম।

কেন ?

বাবুজী, এতলোকের জন্য দুধ আনি, কার হোল-মিল্কের বাট্‌লী ক'টা, টোন-মিল্কের বাট্‌লী ক'টা সব সময় মনে রাখতে পারি না, তাই গণ্ডগোল হয়ে যায়। আপনার বাট্‌লীতে দু'বার গণ্ডগোল হওয়াতে চিমন চটে যায়, আমিও চটে গিয়েছিলাম। ফলে চিমন আমাকে দুধ আনতে বারণ করে দিয়েছে। অপরাধ আমারই বাবু, অন্যায় আমারই। কি জানেন বাবু সারারাত না ঘুমিয়ে সেন্টারে লাইন দিয়ে দুধ এনে সবাইকে পৌঁছে দিতে দিতে খিটিমিটি লাগলে চট্ করে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। পরে বুঝতে পারি গরীবের গুস্যা কত ক্ষতিকর। বাবুজী, গরীবকে মাপ করে দিন, এবার থেকে চিমনকে বলে দেবেন বাট্‌লীর কোন গণ্ডগোল হবে না।

তাড়াতাড়ি বললাম—ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেব না। দুধ যেমন দিচ্ছিলে দিয়ে যাও।

বহুৎ বহুৎ মেহেরবানি আপনার,—বলে গুর্খা প্রায় কোমর পর্যন্ত মাথা নোয়ালো। বড্ড অস্বস্তি লাগছিল। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য চট্ করে বললাম—টিফিন ক্যারিয়ার কাঁধে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো ?

মেহতা সাহেবের ছেলেমেয়েদের স্কুলের টিফিন নিয়ে যাচ্ছি বাবু। এছাড়া, গোসাবী সাহেবের বাচ্চাদের, কোয়েলা সাহেবের বাচ্চাদেরও টিফিন পৌঁছে দিই। মাসে বাচ্চা-পিছু দু'টাকা পাই। দেরি হয়ে গেল বোধ হয়। ক'টা বাজে দেখুন তো।

বললাম—একটা পাঁচ।

যাই তাহলে, সেলাম,—চলে গেল গুর্খা। আমি বিস্মিত হয়ে, তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। লোকটা সারারাত জেগে পাহারা দেয়, শেষরাত্রে দুধের সেন্টারে লাইন দিয়ে পাড়ায় প্রায় সব বাড়ির দুধের বোতল সংগ্রহ করে, দুপুরে বাচ্চাদের খাবার পৌঁছে দেয় স্কুলে। কেন এত পরিশ্রম করে ? খুব বড় সংসার ? খরচে বৌ ? অর্থলোভী স্বভাব ?

বাস এসে গেল।

সেদিন রাতে আমার মেজাজ খারাপ ছিল। প্রডিউসার বলেছে আমার লাভ্-সিন নাকি একেবারে বাঙালীমার্কা হয়েছে। পুরো সিনটা নাকচ করে দিয়েছে। বলেছে সম্প্রতি একটি ছবিতে নায়িকাকে বেদিং কস্টুম পরানো হয়েছিল, আর সেজন্যে ছবিটাতে খুব কাটতি হয়েছিল সুতরাং আমাকেও এ ছবির নায়িকাকে বেদিং কস্টুম পরিয়ে একটা লাভ্-সিন লিখতে হবে। নায়িকা যদিও কলেজের প্রফেসর তবুও তাকে বেদিং কস্টুম পরাতে হবে। প্রযোজকের হুকুম—সিনে বাৎ পয়সা করতে হবে ও প্রচুর গরম মশালা দিতে হবে। গরম মশালা মানে সেক্স। 'দশ-আনে ওয়ালা সিন' লেখার আদেশ হয়েছে অর্থাৎ দশ আনার দর্শকদের জন্য লিখতে হবে দৃশ্যটা! বারো আনাওয়ালা এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক উড়ে গেল, কিন্তু দশ আনার সিনের এক আনাও লেখা হল না। স্বভাবতই আমার মেজাজ গরম। কলম বন্ধ করে উঠে পড়লাম। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম ভারসোবার সমুদ্রতটে। শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল রাত। জোয়ার এসেছে সমুদ্রে। সেই সফেন জলের দিকে তাকিয়ে আমার শিক্ষয়িত্রী নায়িকাকে মনে মনে বেদিং কস্টুম পরাবার চেষ্টা করছি এমন সময় দেখতে পেলাম। দূরে নির্জন তটভূমিতে কে একজন চুপচাপ বসে

আছে। কে লোকটা? মেয়েও হতে পারে তো? ব্যর্থ প্রেমিক-টেমিকা? উঠলাম। কৌতূহল না মেটালে শান্তি পাচ্ছিলাম না। একটু এগিয়েই ভুল ভাঙল। গুর্খা। পাশে লম্বা লাঠিটা দেখেই চিনলাম। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। কাছে গিয়ে ডাকলাম—গুর্খা।

চমকে মুখ তুলল। মনে হল তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে নিল ও, বলল—সিন্‌হাবাবু, আপনি এখানে কি করছেন?

হাওয়া খাচ্ছি, কিন্তু তুমি এখানে বসে কাঁদছ কেন?

ধরা পড়ে যাওয়ায় চমকে উঠল গুর্খা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল—কাঁদি আমার গরীবীর জন্য, আমার অক্ষমতার জন্য। পকেট ভরে অর্থ দেন নি ঈশ্বর, কিন্তু চোখ ভরে জল দিয়েছেন অনেক। বাবুজী, এ সমুন্দর দেখে অবাক হন আপনারা, কিন্তু জানেন না, প্রত্যেক গরীবের চোখে এর চেয়েও বড় সমুন্দর দিয়েছেন ভগবান। আর তার জল এ সমুন্দরের জল থেকে অনেক বেশী নোনা বাবুজী, অনেক বেশী নোনা। বুঝলাম আজ শুধু আরব সাগরেই জোয়ার আসে নি, গুর্খার হৃদয়-সমুদ্রেও জোয়ার এসেছে। বললাম—তোমার কি কষ্ট গুর্খা? কেন এত বিমর্ষ হয়ে আছে? কার কথা ভাবছ তুমি?

ছোট্ট জবাব এল—নির্মলার।

এরপর আমি কোন প্রশ্ন করি নি। দরকার নেই বলেই করি নি। জানি গুর্খা নিজেই সব বলবে। বিকেলের আকাশের একটা তারা যখন ফোটে তখনই জানা যায় বাকী তারাদের ফোটবার আর দেরি নেই।

ধীরে ধীরে গুর্খা সমস্ত কথাই বলল। হ্যাঁ, নির্মলাকে সে পেয়ার করে। তাদের গ্রামেরই মেয়ে। এত নরম চোখ, এত ঘন চুল, এত লাজুক মেয়ে যে মনে হয় ও বঙ্গালকা লেড়কী। পয়েণ্টসম্যানের মেয়ে নির্মলা, একমাত্র মেয়ে। অনেকদিন থেকেই নজর ছিল ওর ওপর কিন্তু মেয়েটা বড় বেশী গর্বিতা মনে হত গুর্খার। আসলে গর্বিতা ছিল না ও। একধরনের রূপ আছে যা দেখতে গর্বিত মনে হয়। নির্মলা ছিল সে গর্বিত রূপে রূপসী। একদিন মাঠে লাঙ্গল দিয়ে দুপুরে খেতে ফিরে আসছিল গুর্খা। হঠাৎ মেয়েলী চিৎকারে সচকিত হয়ে দেখল মুন্সীদের বড় ষাঁড়টা শিং নেড়ে এগিয়ে গেছে নির্মলার দিকে। দেখতে দেখতে নির্মলাকে এক গুঁতোয় মাটিতে ছিটকে ফেলে দিল ষাঁড়টা। এক লহমায় লাঠি হাতে দৌড়ে গেল গুর্খা। লাঠি ঘোরাতে ওস্তাদ ও। প্রচণ্ড বেগে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে দূর করল ষাঁড়টাকে। পরমুহূর্তে কাছে গেল নির্মলার। কোমরের নিচে একটা শিং বসে গেছে ষাঁড়ের। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি বেঁধে দিতে গেল গুর্খা। কিন্তু নির্মলা কিছুতেই তার শাড়ি সরাতে দেবে না, দেওয়া যায় না। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ কিন্তু তবু দু'হাতে কাপড় চেপে কাতরাতে লাগল ও। ঠাস করে পুরো ওজনের এক চড় কষালো গুর্খা। —আই, ম্যায় মর গিয়া,—বলে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল মেয়েটা। ভালো করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পাঁজাকোলা করে তুলে পয়েণ্টসম্যানের বাড়ি নিয়ে এল ওকে। নির্মলার বাবা মা ছোট ভাই সবাই চোখ বড় বড় করে গুর্খার মাংসল চেহারা দেখতে লাগল আর অজস্র ধন্যবাদ জানাল তার সাহায্যের জন্য। জ্ঞান ফিরে পেয়েও চোখ খুলল না একজন। সে নির্মলা।

এরপর অনেকবার নির্মলার সঙ্গে দেখা হয়েছে গুর্খার। কথা বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু জবাব বড় সংক্ষিপ্ত পেয়েছে। যেমন একদিন বলেছিল—নিমু, তবয়িৎ ক্যায়সি হ্যায়? নির্মলা জবাব দিয়েছিল—বদমাস।

আরেকবার বলেছিল—নিমু, তুই তো জানিস লক্ষ্ণৌর ট্রেনটা আজকাল ক'টায় এখানে আসে?

নির্মলা জবাব দিয়েছিল—বেশরম।

আরেকবার বলেছিল—নিমু, এ নীল শাড়িতে তোকে শহরের মেয়ের মতো দেখাচ্ছে একেবারে।

নির্মলা বলেছিল—বুদ্ধু কাঁহিকা।

তারপর একদিন নির্মলার জবাব ভেংচিতে পৌঁছুল। দ্বিতীয় ভেংচিতেই ওকে খপ করে ধরে ফেলল গুর্খা। দু'হাতে বুকে টেনে নিয়ে বলল—এইবার?

নিমু ছটফট করে বলল—ছাড়ো কেউ দেখে ফেলবে। তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল গুর্খা, নির্মলা তাকে পেয়ার করে। 'কোই দেখ লেগা'র একটাই অর্থ হয়। সেটা হচ্ছে আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তারপর থেকে দিনে রাতে নির্মলা। সারাদিন সুযোগ পেলেই ওর সঙ্গে দেখা করত আর সারারাত স্বপ্ন দেখত। কত কাণ্ডই না করেছে ওরা। একবার মাঠে লাঙ্গল দিয়ে বিরাট অক্ষরে লিখেছিল 'নির্মলা'। নির্মলা দেখে কি খুশীই না হয়েছিল। তারপর গুর্খার দাদাকে আসতে দেখে দু'জনে তাড়াতাড়ি মাটি ঢেলে ঢেলে অক্ষরগুলো মিলিয়েছিল। একবার নির্মলার মাকে আসতে দেখে নির্মলাকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রেখেছিল গুর্খা। তাঁর ষাঁড়দুটো খড় খেতে খেতে নির্মলার আঁচল খেতে শুরু করেছিল। নির্মলা একবার আঁচল টেনে নেয় আবার ষাঁড়দুটো আঁচল খেতে শুরু করে। ভাগ্যি ভালো নির্মলার মা টের পান নি। তবু যাবার সময় তামাক-খাওয়া পানের পীক ফেলে গেলেন খড়ের গাদায় আর সেটা পড়ল নির্মলার চোখে। সে-চোখ জল দিয়ে কত করে ধোয়া হল তবু চোখ ফুলে উঠেছিল। দিন তিনচার সে চোখ নিয়ে কষ্ট পেয়েছিল নির্মলা।

শেষ পর্যন্ত বিয়ের কথা বলল গুর্খা নির্মলার বাবার কাছে। বুড়ো তিন হাজার টাকার কমে মেয়ে দেবে না বলল। কিছুতেই না। কিন্তু কোথায় পাবে গুর্খা তিন হাজার টাকা! দাদাদের বলল, তাঁরা হাঁকিয়ে দিলেন। বললেন মরদ হলে নিজে কামাক। এক পয়সাও দিতে রাজী হলেন না তাঁরা। এক ভাবী সহানুভূতিশীলা ছিলেন। উনি তাঁর জমানো একশ টাকা আর রূপোর পৈছা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিন হাজার টাকা এতে হয় না। না, রোজগারই করবে সে। নির্মলার বাবাকে জিজ্ঞেস করল যতদিন না সে টাকা সংগ্রহ করতে পারে ততদিন মেয়েকে রাখবে কিনা। নির্মলার বাবা বললেন তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে কোন তাড়া নেই। একমাত্র মেয়ে তাই তাকে সহজে পর করতে চান না। দু'চার বৎসর অপেক্ষা করতে সে রাজী আছে।

তারপর বোম্বাই। উদ্দেশ্য তিন হাজার টাকা সংগ্রহ। নির্মলা আসবার সময় অনেক কেঁদেছে, কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে গুর্খা ওকে সান্ত্বনা দিয়েছে। হেসে বলেছে—আমি থাকছি না। মুন্সীদের ষাঁড় থেকে সাবধান থাকিস। দেখিস আবার না গুঁতোতে আসে। আর যদি গুঁতোয়ও, আর আমার মতো কোন মরদ এসে বাঁচায়, তবে প্রতিজ্ঞা কর, এবার কিন্তু তাকে দিয়ে কিছুতেই পট্টি বাঁধাবি না।

জল-টলমল চোখে হেসে বলেছিল নির্মলা—বদমাস।

বোম্বে এসে অর্থ সংগ্রহের অনেক চেষ্টা করে প্রথম সফল হয় নি। ভারসোবার পাশের গ্রামের পরিচিত একজনকে পেলো, যে এখন ড্রাইভারী করে। তার সঙ্গেই গ্যারেজে থাকে। সে-ই পাহারাদারী কাজটা নিতে বলল। আগে একজন নেপালী পাহারা দিত। সে কোন কারখানার দারোয়ানের কাজ পেয়ে চলে গেল। সে জায়গায় শুরু করল পাহারাদারী। সেজন্যে নামও হয়ে গেল গুর্খা। কিন্তু রাতজালি করে প্রতি ঘরে একটাকা হিসাবে মাত্র পঞ্চাশ টাকা হয়। এ থেকে খেয়ে পরে বাঁচিয়ে কতদিনে তিনহাজার হবে?

তাই দুধের সেন্টার থেকে দুধের বোতল আনার কাজ নিল। ধীরে ধীরে বাচ্চা স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, টিফিন নিয়ে যাওয়া, বিকেলে ভারসোবার সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাঁরা গাড়ি নিয়ে আসেন তাঁদের গাড়ির ধুলো মুছে দেওয়া, এসমস্ত কাজগুলো নিয়েছে ও। এখন ওর রুটিন হল সারারাত লাঠি ঠক্-ঠক্ করে পাহারা দেওয়া, সাড়ে পাঁচটার আগে মিল্ক কলোনীর দুধের গাড়ি এলে সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো, থলেভর্তি পুরনো বোতল ফেরত দিয়ে হোল-মিল্ক ও টোন-মিল্কের আলাদা আলাদা বোতল সংগ্রহ করা, তারপর সে বোতল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। স্মৃতিশক্তি বেচারার প্রবল নয় তাই কে ক' বোতল হোল-মিল্ক বলেছে, ক'বোতল টোন-মিল্ক বলেছে মনে থাকে না। স্বভাবতই বাড়ির গিন্নীরা ঝগড়া করেন এ নিয়ে। ও ক্ষমা চেয়ে নেয়। বোতল পৌঁছে দিতে দিতে আটটা বেজে যায়। তারপর ঘরে গিয়ে ও ঘুমোয়। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য। ন'টায় উঠেই আবার গোসাবী সাহেব, কোয়েলা সাহেব আর মেহতা সাহেবের বাচ্চাদের ব্যাগগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে আঙ্কেরী স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে ওদের। ফিরে এসে চারটি রেঁধে-খেয়ে নিয়েই ফের ছোটে বাচ্চাদের বাড়ি থেকে টিফিনের বাক্স সংগ্রহ করে স্কুলে।। প্রতিটি বাচ্চাদের বুলিয়ে-ভালিয়ে আদর করে সব খাইয়ে আড়াইটে-তিনটে নাগাদ ফেরে ও। ফিরে একঘণ্টা শুয়ে ফের চারটেয় চলে যায় ভারসোবা বীচে। গাড়ির ধুলো মুছে দেয়। খুশী হয়ে কেউ এক আনা দু আনা দেয়, কেউ না জিজ্ঞেস করে গাড়ি মোছায় পয়সা তো দেয়ই না উল্টে বিরক্তি প্রকাশ করে চলে যায়। বীচ্ থেকে ফিরে চারটি রেঁধে-খেয়ে নিয়ে ফের শুরু হয় তার রাত্রি জাগরণ, শুরু হয় পাহারাদারী, ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ওর কথা শেষ হতে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। আস্তে করে কাঁধে হাত রেখে এবার বললাম—আজ কতদিন ধরে এভাবে টাকা জমাচ্ছ তুমি?

আড়াই বছর হয়ে গেছে বাবু।

মেয়েটির খোঁজখবর পাচ্ছ তো?

হ্যাঁ বাবুজী, আমার সেই যে ভাবী আছে, সে-ই মাঝেসাঝে চিঠি দিয়ে ওর খবর লেখে। মেয়েটি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে জানি, দরকার হলে সারাজীবন। বাবুজী এ তো আপনাদের ফিলিমের বানায়োটী মোহব্বতের গল্প নয়। এ সাচ্চা মোহব্বৎ। বড় দাম এর! খুনপাসিনা অনেক খরচ হয় এতে। জানেন মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হয়, জ্বর হয়। কিন্তু জ্বর নিয়েও কাজ করি, নষ্ট করবার মতো সময় যে আমার নেই। একটা পয়সাও খোয়ালে চলবে না আমার। যতদূর হবে তিন হাজার টাকা, ততদূর থাকবে নির্মলা। সেজন্য আড়াই বছরের একটা রাতও আমি ঘুমুতে পারি নি বাবু, একটা রাতও নয়।

বললাম—আজ কাঁদছিলে কেন?

বাবুজী আজ টাকাটা গুনে দেখলাম। তিন হাজার টাকা হতে আর মাত্র বিশ টাকা বাকি। আগামী সপ্তাহেই হয়ে যাবে তিন হাজার টাকা, আমার স্বপ্ন। তাই কান্না পাচ্ছিল। আমার মেহনতের ঘাম খুশীর আঁসু হয়ে চোখে এসে গিয়েছিল। নিজের গরীবী, নিজের অক্ষমতার জন্য কি নিদারুণ কষ্ট করেছি তাই আজ সব পেয়েও নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছে আমার জীবন থেকে এই যে আড়াইটে নিরানন্দ বছর খসে গেল, এ শুধু আমার গরীবীর জন্য। এ গরীবী আমাদের একত্র জীবনকেও কি কম ভোগাবে বাবু? তবে সেটা শুধু একজনই বহন করবে না, দু'জন করবে। তার সাহচর্যে হয়ত কষ্টগুলোও এমন কাঁটা থাকবে না, ফুল হয়ে উঠবে। কী বলেন বাবুজী?

নিশ্চয়ই—বললাম আমি।

একটু পরে ও উঠল—যাই আমার দ্বিতীয় চক্করের সময় হয়ে গেছে। সেলাম বাবুজী।

গুর্খা—ডেকে উঠলাম। ও ঘুরে দাঁড়ালো,—তিন হাজার টাকা হতে যে ক'টাকা বাকি আছে সেটা আমি তোমাকে দিতে পারি। নেবে?

ও একটু হাসল—না বাবুজী। ভিক্ষা নিয়ে আমার প্রেমকে ছোট করতে পারব না। আচ্ছা, সেলাম। বালির ওপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ও চলে গেল। খানিক বাদে কানে এল ঠক্ ঠক্ লাঠির শব্দ। বুঝলাম ও রাস্তায় পৌঁছে গেছে। অ্যাসফল্টে লাঠি ঠোকার শব্দ ক্রমে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

দ্বিতীয় সপ্তাহে সকালে একদিন হাজির হল গুর্খা। নতুন পোশাক পরেছে হাসিটাও নতুন পরেছে মনে হল। লম্বা একটা সেলাম ঠুকে বলল—সিন্‌মাবাবু আজ সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যাচ্ছি গাঁওতে!

হয়ে গেছে তোমার তিন হাজার টাকা?

জী সরকার। আজ ওর মেজাজটা বেশীরকমই খুশী, তাই আমাকে বাবুজী থেকে সরকার বানিয়ে ফেলেছে একেবারে।

বললাম,—নির্মলাকে চিঠি দিয়েছ তো?

ওর চোখদুটোতে দুষ্টু হাসি খেলে গেল। বলল,—না, গত সপ্তাহে ভাবীকে চিঠি লিখে শুধু জানিয়েছি। আমি নির্মলাকে অচানক্ গিয়ে দেখা করে চমকে দিতে চাই। ভাবীকে লিখেছি আমার যাওয়ার খবর যেন কাউকে না দেয়।

কিন্তু তোমার ভাবী বলে দেবে না নির্মলাকে? লেড়কী লোগোকা পেটমে বাৎ নেহি বাচ্‌তি।

না, আমার ভাবীর মধ্যে কিছু কিছু লেড়কাপনও আছে। আমি জানি উনি কিছুতেই বলবেন না।

বৌ নিয়ে কবে ফিরবে?

এখন ফিরব না বাবু, ওখানেই থাকব। তারপর নির্মলা যা বলবে তাই করব। বিয়ের পর আর আমার মতামত কিছু থাকবে না। ওর ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে হবে।

আচ্ছা এখন থেকেই স্ত্রৈণ হয়ে উঠেছো!

ও হেসে বলল,—নির্মলার মতো মেয়ে পেলে চেঙ্গিস খাঁও স্ত্রৈণ হয়ে যেত বাবুজী, ও মোতীর মত মেয়ে। সাচ্চা মোতী। আচ্ছা বাবুজী।

পকেটে হাত দিয়েছিলাম বকশিশ দেবার ইচ্ছেয়, কিন্তু ওর আত্মসম্মানের কথা ভেবে হাতটা আর পকেট থেকে বার করলাম না। শুধু আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাটুকু জানালাম। ও চলে গেল বিদায় নিয়ে। মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু প্রোডাকশনের গাড়ির হর্ন শুনলাম। আজ হিরোইনের মাকে গল্প শোনাতে যেতে হবে। অনেক কাজ।

সেদিন অনেক রাত্তিরে ফিরলাম। বাথরুমে গিয়ে ঝরনা খুলে চান করছি এমন সময় চমকে উঠলাম পরিচিত লাঠির শব্দ শুনে। কলটা বন্ধ করে কান পাতলাম। ঠিক। সেই ঠক্ ঠক্ লাঠির আওয়াজ। তবে কি এ অন্য পাহারাদার? তাড়াতাড়ি গা হাত পা মুছে বেরিয়ে এলাম। লাঠির শব্দ এগিয়ে আসছে। দরজা খুলে তাকিয়ে অবাক। গুর্খাই। বিকেলের ট্রেনে তো ওর যাওয়ার কথা। যায় নি কেন? গুর্খা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর ভাঙা-গলায় বলল—আমিই। যাওয়া আমার হয় নি বাবুজী।

কেন? যাও নি কেন?

ভাবীর চিঠি পেয়েছি দুপুরে। নির্মলা স্টেশনমাস্টারের সালার সঙ্গে পালিয়ে গেছে সাতদিন আগে।

নির্মলা পালিয়ে গেছে?

হ্যাঁ বাবুজী, পালিয়ে গেছে। অনেকদিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত আর বোধ হয় পারে নি। কিন্তু আর ক'টা দিন যদি ও অপেক্ষা করত!

কি বলব জানি না, ভাষা আমার ফুরিয়ে গেছে। অমানুষিক পরিশ্রম করে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে যে মেয়ের ভালবাসার জন্য তার এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতায় নপুংসক ক্রোধে জ্বলতে লাগলাম আমি। অনেকক্ষণ পরে বললাম—কেন এমন করল নির্মলা?

আমিও তো একথাটাই জানতে চাই, কেন করল ও?—তারপর একটু থেমে বলল—আড়াই বছর বড় দীর্ঘ সময় বাবুজী। আর অপেক্ষার বছর বছর মনে হয় না, যুগ মনে হয়। কিন্তু নির্মলা তা,—অর্ধসমাপ্ত রেখে চুপ করে গেল গুর্খা। তারপর হঠাৎ হনহন করে হেঁটে চলে গেল। বুঝলাম গলা বুজে গেছে ওর, চোখ জলে ভরে গেছে, তাই পালিয়ে গেল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে।

দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম গুর্খার লাঠি ঠোকবার আওয়াজ। মনে হচ্ছিল ঠক্ ঠক্ করে যেন ভাগ্যদেবতা অট্টহাসি হাসছেন। দাবার নিষ্ঠুর চালে একটা প্রেমের নৌকো গ্রাস করার আনন্দেই যেন এই কর্কশ উল্লাসের দন্তবিকাশ।

এরপর থেকে গুর্খা আর আমার সঙ্গে দেখা করত না। রাত্রিতে ওর পাহারার সময় আমার বাড়িতে আলো থাকলে কাছে আসত না। দিনে দেখা হলেও এড়িয়ে যেতো, বুঝতাম ওর বেদনা। আমিও তাই জোর করে কোন কথা বলতাম না। ওর কান্নার সাগরে ঢেউ তুলে কি লাভ, কি লাভ ওর অশ্রুর মেঘকে মল্লারের ধুন শুনিয়ে?

এভাবে মাস ছয়েক কেটে গেল। এ ছ'মাসে মনে হল গুর্খা অনেক বুড়িয়ে গেছে। আজকাল ওর শরীর বিশেষ ভালো থাকে মনে নয় না।

একদিন আমাদের স্যুটিং-এর জন্য দরকার হল একজন লাঠিয়ালের। সময় স্বল্প অথচ লাঠিয়াল না হলে কিছুতেই চলছে না। আমার স্বভাবতই মনে পড়ল গুর্খার কথা। বিকেলে বীচেই খুঁজে পেলাম ওকে। গাড়ি মুছছে ও। নির্মলার জন্য টাকার আর প্রয়োজন না থাকুক গুর্খা আর রুটিন বদলায় নি। হয়ত ভোলবার জন্যেই এই যান্ত্রিক কর্মব্যস্ততা। যাই হোক ডেকে বললাম ওকে। রাজী হল। বলল—বেশ বাবুজী, আপনি যখন বলছেন যাব।

আর স্টুডিওতে ঘটল কাণ্ডটা। মারামারি। প্রোডাকশন ম্যানেজার দৌড়ে এসে খবর দিল একস্ট্রাদের মধ্যে মারামারি লেগেছে। বেরিয়ে দেখি গুর্খা রক্তাক্ত নাক আর ভাঙা হাত নিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কেউ জল ছিটোচ্ছে চোখমুখে, কেউ হাওয়া করছে। কে মেরেছে জানতে চাইলাম। একটা লিকলিকে লোক এগিয়ে এসে বলল—আমি স্যার। এ গুর্খা আমার বৌ-এর গায়ে হাত দিচ্ছিল। পাক্কা বদমাস লোকটা।

দূরে বাগানে শ্বেতপাথরের ফোয়ারা পরীর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। বিস্রস্ত চুল, মেক-আপ করা লালচে মুখে ঘামের রেখা নেমেছে সুতোর মতো। ওকেই নাকি আক্রমণ করেছিল গুর্খা। মেয়েটি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ভিড়ের দিকে। চোখ ফিরিয়ে এগিয়ে গেলাম গুর্খার কাছে। কিন্তু একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না গুর্খা। পুলিসকেও নয়।

জামিন নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। গুর্খা জামিন চায় না। কেন? অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ও। বলল,—মেয়েটি নির্মলা বাবুজী। ও ছোকরা ওকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে বোম্বেতে। শেষ পর্যন্ত ফিল্মে নামিয়েছে।

এই তাহলে নির্মলা। বার বার ফোয়ারা-পরীর গায়ে হেলান দেয়া ঘাম-গড়ানো মেকআপ করা নির্মলার মুখটা মনে করবার চেষ্টা করলাম।

বাবুজী, আমি ওকে কিছু করি নি। ওকে দেখে ওর কাছে গিয়ে আস্তে

বলেছিলাম,—নির্মলা তুই আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করলি? জবাবে নির্মলা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কে। মুন্সীদের ষাঁড়টা গুঁতোতে তেড়ে আসতে যেমন করে চেঁচিয়েছিল তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছোকরা এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে কি মারই মারল ছেলেটা। আমি নাকি ওর স্ত্রীকে আক্রমণ করেছিলাম।

বললাম,—তুমি পড়ে পড়ে মার খেলে কেন? ঐ তো ছোকরার লিকলিকে চেহারা। উল্টে মারতে পারলে না ওকে।

হাসল গুর্খা—পারতাম না কেন বাবুজী, খুব পারতাম। এক চড়ে ওকে অজ্ঞান করে ফেলতে পারতাম।

তবে মারলে না কেন?

একটু চুপ করে রইল গুর্খা। তারপর বললে,—ওকে মারলে নির্মলা বড় কষ্ট পেত বাবুজী।

রাগে গা রী-রী করে উঠল—তাতে তোমার কি? নির্মলা তো তোমাকে ভালোবাসে না। নির্মলা তো—

আমাকে কেটে দিয়ে বলল,—হ্যাঁ বাবুজী, নির্মলা আমাকে ভালোবাসে না জানি। নির্মলা ভালোবাসে ঐ ছোকরাকে। কিন্তু আমি তো ভালোবাসি নির্মলাকে। আমি কি করে ওর মনে কষ্ট দিই?

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। পরমুহূর্তেই উঠে চলে এলাম। পাগলের সঙ্গে বসে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।

তারপর আর যাই নি ওর সঙ্গে দেখা করতে। কতদিন জেল হয়েছিল তার সংবাদও রাখি নি। রাত্রিতে শুধু ওর অনুপস্থিতি টের পেতাম। নিঃশব্দ রাত্রিতে আজকাল আর লাঠির ঠক্ ঠক্ শোনা যায় না।

মাসখানেক বাদে হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় দরজার কড়া নড়ে উঠল। গুর্খা দাঁড়িয়ে। বললাম,—কি খবর? কবে খালাস হয়েছ?

আজই বাবুজী।

তারপর ইতস্তত করে বলল—বাবুজী, একটা অনুরোধ করতে এসেছি। আপনাকে কিন্তু রাখতেই হবে।

বলো কি বলবে?

আপনার সঙ্গে নির্মলার দেখা হবে তো বাবুজী?

আবার নির্মলা। বললাম,—জানি না! ও একস্ট্রাদের দলে যোগ দিয়েছে মনে হচ্ছে। তা হলে হতেও পারে। কেন?

বাবুজী, আপনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখা করবেন ওর সঙ্গে?

রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম, বললাম—কেন সেটা তো আগে বলো।

ও এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর একটা রুমালের পুঁটলি রাখল। বলল—বাবুজী, এতে তিন হাজার টাকা আছে। এটা দিয়ে দেবেন।

আমি থ হয়ে তাকিয়ে রয়েছি দেখে গুর্খা ঢোক গিলল একবার। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল—বাবুজী, সেদিন দেখেই বুঝেছি ওর বাচ্চা-টাচ্চা হবে। এ সময় মেয়েদের কাজ কর্ম করতে হয়না, ভালো খেতে-টেতে হয়। ও ছোকরার রকমসকম দেখে মনে হয় না বেশী পয়সাকড়ি আছে। থাকলে এ শরীর নিয়ে ওকে কাজ করতে দিত না। তাই বলছিলাম এ টাকাটা ওকে দিয়ে দেবেন। ওর জন্যই তো জমিয়েছিলাম, ওর জন্যই খরচ করা উচিত। আমি আর এ টাকা দিয়ে কি করব বলুন!

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম গুর্খার দিকে।

।। মোমিনপুরের চাঁদমারি ।।

ভোর হল চাঁদমারিতে। নরম রোদ শিশির ভেজা ঝোপজঙ্গলে ছড়িয়ে দিল ঈষদুষ্ণ আদুরে ওম। সময় হয়েছে শঙ্খচূড়ের, কোটরে ফিরতে হবে এবার। আস্তে করে আড়মোড়া ভেঙে এগুতে থাকে শঙ্খচূড়। বাঁদিকে গা ছোঁয়ানো মাত্র একগাদা লজ্জাবতীর পাতা বুজে গেল, ডানদিকে দ্রুত পালিয়ে গেল কি একটা। ফণা উচিয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে দেখে নেয় শঙ্খচূড়। না, ও কিছু নয়, একটা মেঠো ইঁদুর পালিয়ে গেল লেজ উঁচিয়ে। শঙ্খচূড় ফণীমনসার ঝোপ কাটিয়ে চলে এলো বটগাছটার কাছে। বটগাছের বাঁদিকে ওটা কি? একটা শালিকছানা না? সতর্ক শিকারীর মতো সাবধানে এগুতে থাকে সে, একটু একটু করে ঠিক পেছন দিক দিয়ে বুনো বাতাবীর ঝোপটার মাঝে চলে এলো শঙ্খচূড়। কিন্তু শালিক পাখিরা বোকা নয়, ওদের চোখও তীক্ষ্ণ কম নয় নেহাত। ওরা দেখতে পেয়ে গেছে শঙ্খচূড়কে। বটগাছের ডাল থেকে ওরা চেঁচিয়ে উঠল সুতীব্রকণ্ঠে, উড়ে বার বার পাক খেতে লাগল শঙ্খচূড়ের মাথার ওপর। শালিকছানা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ওড়বার চেষ্টা করে সে। তবু, বিফল হবে জেনেও, মুহূর্তের মধ্যে ছোবল মারল শঙ্খচূড়। কিন্তু তাতে বটগাছটার গুঁড়ির একটা অংশের ছালবাকল উঠে গেল শুধু, ছানাটা উড়ে এরই মধ্যে গাছের ডালে গিয়ে বসেছে। ব্যর্থ আক্রোশে শুধু শুধুই আরেকটা ছোবল মারল শঙ্খচূড়, খানিকটা বিষ ঢেলে দিল বটগাছের গুঁড়ির ওপরই।

'উরে বাপরে কতো বড় সাপ'—লোকটি লাফ দিয়ে ছিটকে তিন হাত দূরে সরে গেল। হাত থেকে ঘটিটা পড়ে গড়াতে গড়াতে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গ ঘরটার ভেতরে।

মানুষ? বিদ্যুতের মতো শঙ্খচূড় গা ঢাকা দিল ঝোপে। এ ঝোপ ওঝোপ দিয়ে তীব্রগতিতে চলে এলো বেশ খানিকটা দূর। তারপর কাঠগোলাপ গাছের ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে পলকহীন চোখে দেখতে থাকে লোকটাকে। বেশ ভয় পেয়েছে লোকটা সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিয়ে সে ধীরে ধীরে ঘটিটার জন্যে এগুতে থাকে সুড়ঙ্গ ঘরটার দিকে।

'এ্যাঁ, ঘর, মানুষ থাক্‌তে নাকি!' লোকটা বিড়বিড় করতে করতে চারদিক দেখে নেয়। ঘরটার মেঝেতে ঘটিটা ঠুকে ঠুকে দেখে সত্যি সত্যি সিমেন্ট রয়েছে কিনা তলায়। হুস্‌হাস্ করে, দু'চারটে চামচিকে মাথার ওপর দিয়ে এ-কোণ থেকে ও-কোণে উড়ে গিয়ে অভিযোগ জানাল। ঘটিটা নিয়ে বাইরে এসে খানিকক্ষণ বোবা চোখে ঘরটার বাইরেটা দেখে নেয় সে। তারপর কি ভেবে দৌড়ে ওপরের দিকে উঠে যেতে থাকে। কোথায় গেল বুঝতে পারে না শঙ্খচূড়। কিন্তু অবাক চোখে দেখলে শঙ্খচূড়, লোকটি নেমে আসছে ঢালু পথ বেয়ে, হাতে একটা ফুল আঁকা টিনের স্যুটকেস, বগলে বিছানার একটা

ছেঁড়াখোঁড়া স্তূপ আর পেছনে রীতিমতো ভারী বোঁচকা হাতে একটি বৌ।

'এই দেখ বৌ, এই ঘর,—

কোন কথা বলল না বৌটি। শুধু ক্লান্ত পাণ্ডাশরঙা চোখদুটো তুলে তাকিয়ে রইল অন্ধকার ঘরটার দিকে। নির্বাক মাটির প্রতিমার মতো পলকহীন দৃষ্টি। শঙ্কামেদুর। ব্যথাম্লান।

চাঁদমারিতে আবার মানুষ? আবার নতুন বাসিন্দা?...

কবে কোন্‌কালে এখানে সায়েবসুবো পুলিশ-সিপাইরা বন্দুকের নিশানা ঠিক করতে আসতো শঙ্খচূড় তা জানে না। ব্রিটিশ আমলের আগে দেশীয় রাজারাজড়ার চাঁদমারিই ছিল কিনা এটা, তাও বলতে পারবে না শঙ্খচূড়। শুধু মনে আছে শঙ্খচূড়ের, সেই যে বড় বন্যা হল দেশে, গ্রামকে গ্রাম ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সে সময় একটা উপড়ানো পলাশ গাছের ডালে বসে ভাসতে ভাসতে সে এসে ঠেকেছিল এই পাহাড়ে। পাহাড়? হ্যাঁ, পাহাড়ই। ঢিপি বলার কোন মানে হয় না চাঁদমারির বিরাট এই স্তূপটিকে, ছোটখাটো পাহাড় বলাই ঠিক। ঝোপেজঙ্গলে ভর্তি এই বন্য পাহাড়টিকে সে সেই থেকে একই রকম দেখছে। নির্জন জঙ্গলময় চাঁদমারির পূর্ব ইতিহাস তার অজানা। সেই যে বটগাছের কোটরে আস্তানা পেতেছে শঙ্খচূড়, আজও সেই একই আস্তানা রয়েছে তার, অপরিবর্তিত একই বাসস্থান। বটগাছটা চাঁদমারির পশ্চিম পাশ থেকে অজস্র শিকড়বাহু মেলে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মতো। যেখানে শঙ্খচূড়ের কোটর, সেখানে বটগাছটায় অজস্র শিকড়ের আড়ালে একটা ঘর রয়েছে সুড়ঙ্গের মতো। লোহার দরজার একটা দিক মাটিতে একেবারে চাপা পড়ে গেছে, অন্যদিকটা বটগাছের শিকড়ের আড়ালে কাত হয়ে রয়েছে কতোকাল ধরে কে জানে! ভেতরটা দিনের বেলায়ও অন্ধকার, শুধু বিকেলের দিকে সূর্য যখন পশ্চিমে অস্ত যায়, তখন বটগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা তির্যক সূর্যরেখা সবুজ শ্যাওলাজা ইঁটের মেঝের ওপর এসে পড়ে, আদ্যি-কালের এই ঘরটা একটু আবছা আবছা আলোকিত হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আবার জমাট অন্ধকারের রাজ্যে। ঘরটার ভেতরে চারদিকে অজস্র ফাটল, ছোট ছোট অনেক বট, অশ্বত্থ গাছ মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে এদিকে ওদিকে আর সবুজ শ্যাওলার পুরু আস্তরণে চারদিক ছাওয়া। প্রথমে ঘরটার ভেতরেই কোন ফাটলে আস্তানা করবে ঠিক করেছিল শঙ্খচূড়, কিন্তু সূদূর প্রসারী ভাবনা ভেবে শেষ পর্যন্ত দরজার বাইরে এই বটগাছটার কোটরটাই বেছে নিয়েছে সে, ভেতরের ফাটলে দু' চারটে বাস্তুকেউটে থাকে, আর বেশ কিছু চামচিকে।

চাঁদমারিতে মানুষ এই নতুন নয় অবিশ্যি। ক'বার মানুষ এসেছে এখানে শঙ্খচূড়ের স্পষ্ট মনে আছে, গুণে গুণে ঠিক ঠিক বলতে পারে সে। এই ধরো প্রথমে এক কোবরেজ আর তার সাকরেদের কথা। প্রতি বছর কার্তিক মাসে এরা দু'জন আসবেই এই চাঁদমারিতে, বুনো লতাপাতা ঘেঁটে কি সব সংগ্রহ করবে, তারপর বটগাছের ছায়ায় বসে দু'জন দুটো বিড়ি খেয়ে সন্ধ্যা হওয়ার একটু আগেই চলে যাবে। সারা বছরে আর তারা আসবে না একটি বারও। আবার বছর ঘুরে কার্তিক মাস এলেই দেখতে পাওয়া যাবে এই দুজনকে, ঝোপজঙ্গল হাতিয়ে ফিরছে কি সব লতাপাতার সন্ধানে।

আর মনে পড়ে শঙ্খচূড়ের একদিন রাতে শিকারে বেরিয়ে ঝিলটার পাশ দিয়ে কচুবনের মাঝে বসে হঠাৎ নজরে পড়েছিল একটি সবুজ তরুণকে হনহন করে ব্যস্ত-সমস্তভাবে চাঁদমারিতে আসতে। হাতে ছিল পুঁটুলীর মতো কি একটা। মাথা তুলে দেখেছে শঙ্খচূড় ছেলেটি অতিরিক্ত সন্ত্রস্ত, ভয়ের ছাইরঙা মেঘে সমস্ত মুখটা মলিন। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে ছেলেটি নিচু হয়ে কি যেন করছে! কি করছে ও?...শঙ্খচূড়

কৌতূহল চেপে রাখতে পারলে না। আস্তে আস্তে ছেলেটির কাছাকাছি একটা নিরাপদে ঝোপে গিয়ে লুকোয় সে। কি আশ্চর্য, ছেলেটি চাঁদমারির কংক্রিটের মতো মাটি খুঁড়ছে ছোট্ট লোহার শাবলের মতো কি একটা দিয়ে। তারপর একটু গর্ত হতেই হাতের পুঁটলীটা খুলে ফেলে সে। আর উত্তেজনায় শঙ্খচূড়ের চেরা-জিভটা হিসিয়ে ওঠে একবার। একটি সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর রক্তাক্ত মৃতদেহ! গায়ের রঙ এখনো তরতাজা মনে হচ্ছে, হয়তো বড় জোর আধঘণ্টা আগে পৃথিবীতে এর আবির্ভাব ঘটেছিল। গর্তের ভেতর শিশুটাকে শুইয়েই মাটি চাপা দিতে থাকে ছেলেটি। তারপর ত্রস্তে রক্তমাখা ন্যাকড়াটা আর লোহার শাবলটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে যায় ও ঝিলটার দিকে। ফণীমনসার চূড়োর ওপর ফণা উঁচিয়ে দেখলে শঙ্খচূড়, ছেলেটি ঝিলের জলে ন্যাকড়াটা লোহার সেই শাবলটার সঙ্গে জড়িয়ে ডুবিয়ে দিল। তারপর হাতের রক্ত ভাল করে ধুয়ে ঝিলের পাড় দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ছায়াশরীর। তাকে আর কোনদিন দেখে নি শঙ্খচূড়। একবারও নয়।

কিন্তু এরা সব ছুটকো মানুষ চাঁদমারির বাসিন্দা নয় কেউ। এই সুড়ঙ্গ ঘরটার প্রথম বাসিন্দা হলো দু'জন সাধু। শঙ্খচূড়ের যদ্দূর মনে পড়ে, একদিন চৈত্রমাসে ভরদুপুর বেলায়, যখন বটগাছের মাথার ওপর বাজপাখির চোখের মতো জ্বলছিল সূর্য, ঝিলের জলে পানকৌড়িরা অনবরত ডুব দিচ্ছিল হয়তো গরমের জন্যেই কাঠগোলাপ গাছগুলির সাদা সাদা ফুলের প্রতিটি পাপড়ি অস্বাভাবিক সাদা আলোয় ঝিকমিক করছিল কাঁচের মতো, ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছিল কয়েক ঝাঁক প্রজাপতি, কাঠবেড়ালীরা মাঝে মাঝে শুধু ঝরাপাতার ওপর আওয়াজ তুলে ছুটে যাচ্ছিল এদিক ওদিক, তখন, ঠিক সেই সময়, দু'জন জটাজূটধারী সাধু এসে দাঁড়ালো এই বট গাছটার তলায়। দু'জনেরই সারা গায়ে ছাই মাখা, পরনে শুধু কৌপীন। একজনের এক হাতে ত্রিশূল আর চিমটে, অন্য হাতে একটা ঘটি, বগলে ভাঁজ করা কম্বল একখানা। আরেকজন দু'হাতে প্রায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টেনে নিয়ে আসছে বেশ বড় রকমের সুতীক্ষ্ণ কাঁটাতারের একটা বোঝা। কাঁটাতারের বোঝাটা বটগাছের শেকড়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে দ্বিতীয় সাধুটি আস্তে করে বলে উঠল—

'ইখানেই থাকা চলে, না কি বল?'

'হুঁ'—প্রথম জনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ওদের ঘরকন্না ঠিক বুঝতো না শঙ্খচূড়। ভোর হতেই দু'জন চলে যেতো কোথায় কে জানে। একজন ত্রিশূল চিমটে হাতে আর দ্বিতীয় জন সেই কাঁটাতারের বোঝাটা নিয়ে। কাঁটাতারের বোঝাটা দিয়ে কি করে ওরা? রোজ ওটা কোথায় নিয়ে যায় বয়ে বয়ে? ব্যাপারটা যেন হেঁয়ালি মনে হয় শঙ্খচূড়ের। সন্ধ্যেয় দু'জনেই ফিরে আসতো পরিশ্রান্ত হয়ে। তিনটে পাথর দিয়ে উনুন করে নতুন কেনা মাটির হাঁড়িতে চাপিয়ে দিত চাল ডাল সব কিছু। জড়ো করা ডালপালায় রান্না করতো নিঃশব্দে। বড় মানকচুর পাতা পেতে খেয়ে দেয়ে দু'জন দু'চারটে কথা বলতো পরের দিন রাস্তার কোন্ মোড়ে বসতে হবে, কোন্ মোড় পুলিশ বসতে দেয় না, এ ধরনের। তারপর দু'জনেই আকণ্ঠ পচাই গিলে গাঁজার কল্কে সাজিয়ে বসত মৌজ করে। এবার নেশাগ্রস্ত দু'চারটে জড়ানো কথা যা বলত ওরা তা সবই আদিরসাত্মক নারীদেহঘটিত। এরপর কম্বলে শুয়ে নাক ডাকানো। নিত্যনৈমিত্তিক একই জীবনযাত্রা, একই কার্যক্রম ওদের।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় দেখলে শঙ্খচূড়, দু'জনে নয়, তিনজন এসে দাঁড়ালো সুড়ঙ্গ ঘরের সামনে। দু'জন সাধু আর তৃতীয়জন একটি সাতাশ আটাশ বছরের সুদেহী মেয়ে।

মেয়েটি এসে কোমরে কাপড় জড়ালো তক্ষুনি। সামনেটায় ঝাঁট দিয়ে উনুন সাজাতে লাগলো সযত্নে। যেন এ ঘরকন্না তার অনেক দিনের পুরনো, এ জীবনযাত্রার জন্যেই যেন সে তৈরী করেছে নিজেকে। বোকা নয় শঙ্খচূড়, একটুক্ষণ বাদেই বুঝতে পারে, যে মেয়েটি এক নম্বর সাধুর আমদানি, দু'নম্বরের নয়। পচাই গেলার পর গাঁজার সঙ্গে সঙ্গে নেশা হয় সাধুবাবাদের। এক নম্বরের চেয়ে দু'নম্বরের বেশী আজ। দু'নম্বর সাধু অশ্রাব্য কুশ্রাব্য কথায় গাঁজিয়ে তোলে আসর।

'আ মলো যা, মিন্‌সে কি শুরু করলো দেখো'—মেয়েটি ধমক দিয়ে ধাক্কা দেয় সাধুকে। হঠাৎ দু'নম্বর মেয়েটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

'আঃ ঢং করো না। তোমাদের কাঁটাতারের চেয়ে বেশী ধার আছে আমার জানো, ছাড় মিন্‌সে'—

প্রথম সাধু জানোয়ারের মতো তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর কোনরকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে জোর এক ঘুষি মারে দু'নম্বরের চোয়ালে,—'ছাড় শালা'—

ছিটকে দূরে পড়ে যায় দ্বিতীয়জন। বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে চোয়ালের ওপর হাত বুলোয় সে।

'চলো গো, শুতে যাই'—কালকেউটের মতো কালো মসৃণ সরু হাত দিয়ে এক নম্বর সাধুকে জড়িয়ে ধরে সুড়ঙ্গ ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে মেয়েটি।

হ্যাঁ, জানা গেল। কাঁটাতারের রহস্য জানতে পারলো শঙ্খচূড়। রোজগার মতো সন্ধ্যের পচাই টানার আসর জমে উঠেছে তখন। মেয়েটি হঠাৎ কটাক্ষ হেনে এক নম্বরকে বলল—'আচ্ছা গো সাধু, তুমি ঐ তারগুলোর ওপর শোও কেমন করে? গা'য়ে বেঁধে না একটুও?'

'হুঁ হুঁ সাধনা, বুঝলি সাধনা করতে হয়। সিদ্ধি না হলে কি আর ঐ কণ্টকশয্যায় শুতে পারে মানুষ? আর সবাই ঐরকম শুতে পারলে তো অবাক থাকতো না আর, লোকে আর পয়সা দিত না তাহলে। মাগীমানুষ তো মানুষ, কোন বেটা শালারও ক্ষ্যাম্‌তা নাই রে'—

'ইস, কি সিদ্ধ বাবাঠাকুর রে'—মেয়েটি বলে ওঠে—'সব জোচ্চুরী। সাধনা করেন, আমার সঙ্গে রাত্তিরে বুঝি সাধনা করা হয়, না? মাগীমুখো মিন্‌সের আবার সাধুগিরি'—মেয়েটিও হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে।

পচাই নেশায় এক নম্বর সাধু তখন অশ্লীলতার বান ডাকাচ্ছে কিন্তু আশ্চর্য, দু'নম্বর একেবারে চুপ, যেন নেশাই হয় নি তার। যেন এসব কথায় তার কিছু এসে যায় না। বদলে গেল নাকি দু'নম্বর?...

হ্যাঁ, এক নম্বরের কাছে সেই মার খাওয়ার পর থেকেই বদলে গেছে দু'নম্বর। একেবারে অন্য মানুষ। মেয়েটির ওপর তেমন লক্ষ্য নেই তার। মেয়েটি আসায় যে দু'জন ওরা তিনজন হয়ে গেছে তাতে যেন কোনই কিছু পরিবর্তিত হয় না। দু'জনে একসঙ্গে সুড়ঙ্গ ঘরে থাকার বদলে এখন যে তাকে একা বটগাছের তলায় শুতে হচ্ছে তাতেও যেন তার কিছু আসে যায় না। এক নম্বরের সঙ্গে মেয়েটির রঙ্গরসিকতা যেন চাঁদমারির বটগাছটার মতোই নীরস সাধারণ ব্যাপার। শঙ্খচূড় একটু অবাকই হ'ল।

কিন্তু আরো অবাক হতে বাকী ছিল শঙ্খচূড়ের।

একদিন শঙ্খচূড় শিকারে বেরুলো না। দুটো ব্যাঙ আর কিছু খাবার যা পাওয়া গেছে সন্ধ্যেয় তাতে আর না বেরুলেও চলবে। কুণ্ডলী পাকিয়ে আয়েস করে সে বসেছিল কোটরে। রাত নিশুত। বট ডালে তক্ষকটা খানিক আগে ডেকে চুপ করেছে। একটা

রাত-জাগা পাখি দু'বার চেঁচিয়ে উঠে পাখা ঝাপটালো। আবার সব চুপচাপ। কোথাও একটুকু আওয়াজ নেই। হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ। সাবধানী পায়ের আওয়াজটা যেন বটগাছের গুঁড়ির দিকেই আসছে। কে?...শঙ্খচূড় মাথা উঁচোল। আশ্চর্য, সুড়ঙ্গ ঘর থেকে ছায়ার মতো বেরিয়ে আসছে কে যেন। হ্যাঁ, মেয়েটি। দু'নম্বরের বিছানার কাছে এসে থেমে গেল ছায়াকন্যা। তারপর আস্তে করে শুয়ে পড়ে দু'নম্বরের পাশে। কালকেউটের মতো মসৃণ কালো হাতদুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরল দু'নম্বরকে।...ভোর হবার একটু আগে উঠে চলে গেল আবার। চলে গেল সুড়ঙ্গ ঘরের ভেতর। নেশাগ্রস্তের মতো শঙ্খচূড় দেখল এমনি কয়েকটি রাত। তারপর হঠাৎ এক রাতে মেয়েটি হাতে একটা পুঁটুলী নিয়ে চলে আসে দু'নম্বরের কাছে। দুজন ফিসফিস করে কি বলল—ফণীমনসার অত কাছের ঝোপে থেকেও শুনতে পেল না শঙ্খচূড়। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে দু'নম্বর। নিচের কম্বলটা ভাঁজ করে বগলদাবা করে। তারপর সুড়ঙ্গ ঘরটার দিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে মেয়েটির হাত ধরে তাড়াতাড়ি পালাতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে থমথমে রাতের অন্ধকারে দু'জোড়া পায়ের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল চাঁদমারি থেকে। নির্জন চাঁদমারিতে আবার নেমে এলো রাত্রির আদিম নীরবতা!

শেষরাতে বেরিয়ে ভোরবেলায় ফিরতে একটু দেরিই হয়ে যায় শঙ্খচূড়ের। কোটরের কাছে এসে হঠাৎ হাউমাউ কান্না শুনে একটু চমকে ওঠে সে। রীতিমতো চিৎকার করে কাঁদছে এক নম্বর সাধু।

'বজ্জাত মাগী পালাইছে, আমার সব সম্পত্তি চুরি করে পালাইছে শালী, গণাশালা নেমকহারামী কইরা মাগীরে ভাগাইয়া লিছে। হায় হায় সব গেল, সর্বনাশ করছে আমার, একেবারে সর্বনাশ করল আমার মাগী'...

সাধুবাবার অবস্থা শোচনীয়। কুৎসিত অশ্লীল গালাগালির খৈ ফুটছে তার মুখে। বাইরে দাঁড়িয়ে আরো কয়েকবার দাঁত কিড়মিড় করে সে। তারপর ভাঁড়টা টেনে নিয়ে তলানীর পচাইটা গিলে ফেলে সে।

'আচ্ছা শালী, গণা তরে কি সুখ দেয় তাই দেখি'—বিকৃত মুখে বলে ওঠে—'মাগীর পাখা হইছে! পলাইয়া তুই যাবি কুথা, দেখি কুনখানে তুই থাকস'—ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোটা কম্বল চিমটে ত্রিশূল গুছিয়ে নেয় সে। তারপর একপাশে পড়ে থাকা কাঁটাতারের বোঝাটাকে টানতে টানতে ধুলো উড়িয়ে চলতে শুরু করে। চাঁদমারি থেকে নেমে দক্ষিণদিকের কল্কিফুলের জঙ্গলের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল একনম্বর সাধু। তালগাছগুলোর আড়ালে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সেই যে সে গেল আর ফেরে নি। চাঁদমারির সুড়ঙ্গ ঘর আবার জনহীন হয়ে গেল। আবার সেখানে চামচিকের পুরো রাজত্ব গড়ে উঠল। উদ্বাস্তু বাস্তুকেউটেরা আবার এসে ঘর বাঁধল ফাটলে। ঘরের সামনে নিকনো দাওয়া আবার ভরে উঠল আগাছায়। বটগাছের শিকড় কেটে যে রোদ্দুর যাবার পথ করে নিয়েছিল এরা, আবার সেখানটা বটের অজস্র শিকড়ে আকীর্ণ হয়ে উঠল ক্রমশ।

দিন যায়, মাসও গড়িয়ে চলে। চাঁদমারিতে শীত এল। বটগাছের তামাটে হয়ে আসা পাতাগুলো ঝরে পড়ে সব। রিক্ত বটগা[illegible] ড়া দেখায়। ঝিলের ও-পাশে কৃষ্ণচূড়াটাও বিধবা হয়ে গেছে এর মধ্যে। চাঁদমারির লজ্জাবতীরা রাতের শিশিরে একেবারে নেয়ে ওঠে আজকাল ভোরবেলায় ঝিলের কচুবনে রামধনু জ্বলে কচুপাতায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুর মুক্তোতে। আজকাল আর বাইরে বেরোয় না শঙ্খচূড়। কোটরেই বসে থাকে। আর শুধু ভাবে শীতকালটা এত কষ্টকর, সাত বছরের চেয়ে এবার বুঝি অনেক বেশী শীত! উঃ, কাটবে না এই বদ-ঋতুটা!

কাটল।

শীত গেল ফুরিয়ে। নতুন পাতা গজিয়ে উঠল বটগাছে। কুঁড়ি ফুটলো সব বুনো ফুল গাছে গাছে। কৃষ্ণচূড়া তন্বী হয়ে উঠল। দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে চলে গেল টিয়েপাখির ঝাঁক। পূবধারে ঝাউগাছে বসে কোকিলরা মাঝে মাঝে মিঠেকণ্ঠে ডাক দিয়ে অনুরণিত করে চাঁদমারির বাতাস। খোলস পালটাবার সময় হয় শঙ্খচূড়ের। নাগিনীদেহের গন্ধ খোঁজবার তাগিদ দেখা দেয়।

তারপর আরো একজন।

সন্ধ্যের দিকে লোকটা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল চাঁদমারির দিকে সুড়ঙ্গ ঘরটার কাছে। হঠাৎ মস্তোবড় কোন কিছু আবিষ্কার করেছে যেন সে, এমনি উজ্জ্বল মুখে ঘরটার ভেতর গিয়ে ঢুকল। দেশলাই-এর কাঠি জ্বলিয়ে দেখে নিল ঘরটার ভেতর। তারপর কি ভেবে হনহন করে চলে গেল কোথায়। মাঝরাত্তিরের দিকে লোকটি ফিরে এল আবার। সঙ্গে আরো দু'জন লোক। একজনের হাতে ছোট একটা বিছানার বোঁচকা অন্যজনের কাঁধে একটা ব্যাগ।

ঘরটার ভেতর ঢুকে একজন একটা মোমবাতি ধরাল। কিচিরমিচির করে উঠল চামচিকের দল।

'ওঃ ওয়াণ্ডারফুল মণিদা,'—

পরের দু'জনের একজন চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল—'খাঁটি জায়গা হয়েছে এটা। পুলিশের বাবারও সাধ্যি নেই খুঁজে বার করে—'

'অত আনন্দিত হয়ো না সতু—প্রথমজন বলে উঠল এবার—'পুলিশের চোর ধরতে না পারার দুর্নাম থাকলেও আণ্ডারগ্রাউণ্ড পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ধরতে খুব বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয় না। আণ্ডার এস্টিমেসন কোন সময়েই ভালো নয়, বিশেষ করে শত্রুশক্তির। আর তেমনি, মিত্রশক্তি সম্পর্কে ওভার এস্টিমেসনও মারাত্মক—'

দু'জনেই চুপ করে শুনল তার কথা। একজন কম্বলটা টেনে বিছানাটা করে দিতে থাকে।

'আমরা তাহলে যাই মণিদা—'

'হ্যাঁ, যাও। খুব সাবধানে; আর একমাত্র রঙনাথ আর সাধনা ছাড়া কাউকে এ আস্তানার খোঁজ দেবে না। আর শোন, কাল রাতে মন্তাজ মিয়াঁর ওখানেই মিটিং-এ আমি যাচ্ছি। দুপুরে শুধু তুমি গৌর আমার ভাতটা নিয়ে আসবে এখানে, আর কেউ যেন না আসে। যদি টিকটিকি খুব জ্বালাতন করছে বলে মনে করো ডোণ্ট কাম্ হিয়ার বুঝলে? বি এলার্ট—'

'আচ্ছা'—গৌর নামধারী ছেলেটি বলে।

'এবার চলি আমরা তাহলে'—সতু বলল।

'হ্যাঁ, যাও—'

অন্ধকারে ধীরে ধীরে ওরা দু'জনে চলে গেল। শঙ্খচূড় দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে দেখল ওদের দু'জনকে চলে যেতে। আর খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চাঁদমারির এই নতুন আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। চাঁদমারির নতুন বাসিন্দা! কেমন ধারা এই জীবননাট্য কে জানে!

বিচিত্র এই লোকটির চলাফেরা থাকা খাওয়া সবকিছুই। কি করে, কেন এমন লুকিয়ে আছে, কিছুই পরিষ্কারভাবে বুঝে উঠতে পারে না শঙ্খচূড়। সারাদিন অন্ধকার ঘরের ভেতর মোমবাতি জ্বালিয়ে কি সব লেখাপড়া করে লোকটি। দুপুরে খাবার নিয়ে এলে সেটা খেয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে রাতের কর্মতালিকা নিয়ে আলোচনা করে ছোট্ট দু'চার কথায়। তারপর সন্ধ্যার আবছায়া কেটে গিয়ে যখন ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায় বুনো

চাঁদমারি, ঝিঁঝি পোকারা ঐকতান শুরু করে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি পোকারা ঝোপ থেকে ঝোপে ঘুরে বেড়ায়, তখন সতর্ক পায়ে লোকটি দ্রুত চলে যায় যেন কোথায়, কোন দিন মাঝ রাতে ফেরে। ফিরতে ফিরতে কোনদিন আবার ফিরে আলো-আঁধারির শেষ রাত্রিরও গড়িয়ে যায়।

কিন্তু বেশীদিন নয়, সতেরো দিনের মধ্যেই এ নাটকের যবনিকাপাত ঘটল। সতেরো দিন, হ্যাঁ, শঙ্খচূড়ের স্মৃতিপটে একেবারে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এই সতেরো দিনের মানুষ সঙ্গীটির ছবি। ভুল হয়ে যাবার যো নেই।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পুড়ছিল চাঁদমারি। ঘরের ভেতর অন্ধকারে বসে কি সব লেখাপড়া করছিল লোকটি। হঠাৎ দৌড়ে আসতে থাকে একটি মেয়ে। যদ্দূর জোরে ওর পক্ষে দৌড়ুনো সম্ভব তত জোরেই দৌড়চ্ছিল ও। একবার দাঁড়িয়ে বটগাছটার অবস্থান দেখে নেয় ও, তারপর সুড়ঙ্গ ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'মণিদা—'

'কে সাধনা ?'—লোকটি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।—'কি ব্যাপার ?'

'শীগগির মণিদা,'—মেয়েটা বেদম হাঁপাতে থাকে,—শীগগির পালাবে চলো। গৌর ধরা পড়েছে। ওর হাতে তোমার সেই রঙনাথের চিঁট্‌টা ছিল। পুলিশ ওটা পেয়ে থাকলে প্রথমেই এদিকে আসবে। এছাড়া এমনিতেই গৌর খুব উইক নার্ভের ছেলে। কোন কিছুই ওর পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। শীগগির মণিদা, আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না—শঙ্কিত চোখে চারদিকে চোখ বুলোয় মেয়েটি।

ঘরে ঢুকে ত্রস্তে যা হাতের কাছে পেল সব কিছু একটা ব্যাগে পুরে ফেলল লোকটি। তারপর তক্ষুনি বাইরে এসে মেয়েটির হাত ধরে বলল,—'চলো। দু'জোড়া দ্রুত পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল চাঁদমারি থেকে।

তারপর পুরো আধঘণ্টাও কাটে নি—মচমচ জুতোর আওয়াজে ভরে ওঠে চাঁদমারি। প্রায় ত্রিশজন ভূসো-রঙা পোশাক পরা লোক এসে ঢুকল চাঁদমারিতে। হাতে বন্দুকগুলো বাগিয়ে চাঁদমারির চারদিক দিয়ে গোল হয়ে ওপরে উঠতে থাকে ওরা। আশ্চর্য, শঙ্খচূড় একটু অবাকই হয়, লোকগুলোর চোখও কি পাথরের মতো নিরেট, ওদের মতোই পলকহীন ?' কিন্তু মানুষের চোখে তো নরম পাপড়ি থাকে ?

সুড়ঙ্গ ঘরটার সামনে এসে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়ায় ওরা।

'মণিবাবু'—একজন রিভলভারধারী বলে ওঠে—'পালাবার বৃথা চেষ্টা করলে গুলি করতে বাধ্য হবো। হাত তুলে বেরিয়ে আসুন আপনি—'

কোন সাড়া নেই !

'যাও, অন্দর ঘুঁস যাও—'

বন্দুক বাগিয়ে ধীর সতর্ক পায়ে দশজন ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গ ঘরটার ভেতর। খানিকবাদে ফিরে এল তারা।

'অন্দরমে কোই নেই হ্যায় সাব। তবে এ' মিলা'—বলে লোকটা দু'টো দুমড়ানো কাগজ ও একটা কম্বল তুলে ধরে।

দুমড়ানো কাগজটা খুলে ফেলে সে। তারপর আঁকিবুকি লেখাটার সঙ্গে পকেটের আরেকটা চিঠির লেখা মিলিয়ে দেখে নিল।

'ওঃ, আবারো ফস্কে গেল। দেন্ এগেন হি হ্যাজ ম্যানেজড টু এসকেপ'—সমস্ত মুখটা কালো হয়ে উঠল রিভলভারধারীর। পরাজিত সৈন্যাধ্যক্ষের মতো খানিকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকে স্থাণুর মতো। তারপর হাত দিয়ে সবাইকে ইশারা করে চলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে ত্রিশজনের লম্বা লাইনটা চাঁদমারি থেকে নেমে কৃষ্ণচূড়ার পাশ দিয়ে মিলিয়ে গেল।

জনশূন্য চাঁদমারি আবার জনহীন হয়ে গেল। সুড়ঙ্গ ঘরটা সেই থেকে খালি পড়ে আছে। বেওয়ারিস। ধীরে ধীরে আবার সেটা বাস্তুকেউটে, চামচিকে, আর আদিম অন্ধকারের রাজত্ব হয়ে উঠল। পা'য়ে দুমড়ানো কোমর ভাঙা আগাছাগুলো ঘাড় উঁচু করল আবারো। জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে উঠল সুড়ঙ্গ ঘরের সুমুখটা।

তারপর.......

আবারো মানুষ। শঙ্খচূড় ফণীমনসার ঝোপের পাশ দিয়ে ধীরে কোটরের দিকে এগোতে থাকে। সুড়ঙ্গ ঘরে আবারো নতুন বাসিন্দা ?.....

লোকটি টিনের স্যুটকেস, বিছানা, বোঁচকা সব এক এক করে ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখল। বৌটি এবার একটু হাসল।

'এমুন জঙ্গলে বুঝি এক্‌লা এক্‌লা থাকন্‌ যায় ?'—

'এক্‌লা থাক্‌বি কেন্‌, দোক্‌লা হইতে পারছ না বুঝি ?'—লোকটি কাপড় কেচে গামছা আঁটো করে কোমরে বাঁধল। কাটারীটা হাতে নিয়ে ঘরের সামনে আগাছা সাফ করতে লেগে গেল।

—'দ্যাহো, ঐরকম করলে কিন্তু বালো অইব না কইয়া দিলাম, অসইভ্যটা,'—কৃত্রিম কোপে রমণীয় হয়ে গেল বৌটি।

তারপর আঁচলটা টেনে কোমরে জড়াল সে। একটা ছোট কলসী মতো ভাঁড় নিয়ে চলে গেল ঝিলে। জল আনতে। লোকটি আগাছা সাফ করে এবার ঘরের সুমুখের শিকড়বাকড় কেটে ঘরটায় আলো ঢোকবার ব্যবস্থা করে দেয়। বেশ লাগে শঙ্খচূড়ের। কোটরের ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর ঘর গুছানো দেখে। নতুন সংসারের পত্তন। নীড়ের নিবিড়তা। মোটামুটি গৃহস্থালির ঝড় ঝামেলা চুকলো শেষ পর্যন্ত। ঘর গুছানো থেকে ঝিলের ঘাট বানানো পর্যন্ত হয়ে গেল। পশ্চিমী আকাশে তখন অস্তগামী সূর্যের লালিমা। নতুন উনুনে ডাল চড়িয়ে দিয়েছে বৌটি। বিকেলী রোদ বটগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বৌটির কর্মক্লান্ত শরীরে লালচে ওড়না জড়িয়ে দিয়েছে। স্নান সেরে লোকটি চুপ করে বসে আছে একটা পাথরের ওপর। স্নেহ মাখা দৃষ্টিতে সে দেখছে বৌটিকে।

'ভাত অইয়া গেছে না ? আবার মোমিনপুর বাজারডা ঘুইর‍্যা আইতে অইব। রাইত অইয়া যাইতাছে যে—'

'এই অইলো বইলা। বাজার থিক্যা সকালে ফিরবা কিন্তু। এক্‌লা এই জঙ্গলে রাইতে আমার ডর করব না বুঝি ?'—

'আরে যামু আর আমু'—

চাঁদমারিতে সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। শিকারে বেরুবার সময় হয়ে এল শঙ্খচূড়ের। আড়মোড়া ভেঙে শরীরটা একটু মুচড়িয়ে নেয় শঙ্খচূড়। পলকহীন চোখে লোকটির খাওয়া দেখে। ফেনাভাত খাচ্ছে লোকটি।

'পেট ভইরা খাইও। অনেক খাটনি গেছে সারাদিন'—বৌটি বলে।

লোকটি একটু হাসল। কোন কথা বলল না। শুধু একটানা খাওয়ার আওয়াজ। একটা পরিতৃপ্তির আমেজ যেন শব্দের বাজনায়। স্বাদের সারং।

দিন কাটে। ওদের জীবনযাত্রা দেখে ক'দিনের ভেতরই ওদেরকে বুঝে নিয়েছে শঙ্খচূড়। বুঝে নিয়েছে ছোট্ট এই উদ্বাস্তু দম্পতির দৈনন্দিন ঘরকন্না। রাণাঘাট না পোনাঘাট কোথাকার এক ক্যাম্পে প্রথমে উঠেছিল ওরা। তারপর ওখান থেকে লক্ষ্যহীন কচুরীপানার মতো ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত ঠেকেছে এই চাঁদমারিতে। আর সব

পাড়াপড়শী ভাইবন্ধু কে কোথায় ছিটকে পড়ছে কে জানে। লোকটি টিনের স্যুটকেস হাতে ভোরবেলায় খেয়ে দেয়ে কোথায় বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে কোনদিন বিকেল গড়িয়ে যায়, কোনদিন রাত্তির হয়ে যায় এক প্রহর। টুকটাক কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে বৌটি। বিকেলে স্বামী যত শীগ্‌গিরিই ফিরুক তবুও 'আরো আগে' কেন এলে না বলে অভিমানে ঠোঁট ফোলাবেই সে। তারপর এলোমেলো কিছু মিষ্টি রঙরসের দাম্পত্য কথামালা। আশ্চর্য লাগে শঙ্খচূড়ের, এমন অভাবী কষ্টের সংসার, তবুও ওরা বেঁচে আছে, স্বপ্ন দেখে, ঝগড়া করে, অভিমান করে, ভালোবাসে। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির মধ্যে যে একটা অপূর্ব ছন্দ মেলে, তেমনি এদের জীবনেও যেন একটা মিষ্টি ছন্দের নূপুর শুনতে পাওয়া যায়, একটা ছন্দময়তার সুষম ছবি ভেসে ওঠে শঙ্খচূড়ের চোখের সামনে। বেশ লাগে ওর। ভালো লাগাটাও কি কেয়াফুলের গন্ধের মতো নেশা ধরানো?...

হঠাৎ একদিন একটা মজা ঘটে গেল। এ রহস্যের হদিসই পেলো না শঙ্খচূড়, বুঝতে পারলো না এ আনন্দের উৎস কোথায়। ভোরবেলা মেয়েটি হঠাৎ চুপিচুপি বেরিয়ে এসে উনুনের তলা থেকে এক চাক্‌লা মাটি তুলে নিয়ে কামড়ে কামড়ে বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেতে থাকে। নিঃশব্দে, পায়ের এতটুকু আওয়াজ না করে স্বামীটি এসে পেছনে দাঁড়ালো।

'হুঁ, আবার মাটি খাওন হইতাছে—'

চমকে পিছনে ফিরল বৌটি। লজ্জায় সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে। দু'হাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকোয় সে।

'অ্যাঁ, সত্যিই নাকি বৌ? কি কছ্ তুই?' বৌকে দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধরে লোকটি।

'কবে?'

স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলল বৌটি। কিছুই শুনতে পেলো না শঙ্খচূড়।

'তবে এতদিন কছ্ নাই কেন?'—লোকটির সমস্ত মুখ আনন্দোজ্জ্বল। আবার কি ফিসফিসিয়ে বলে বৌটি।

'বাহা রে মাইয়ালোক, নিজের ই নিজেই বুঝতে পারছ নাই?'—স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে শুধু বৌটি কেঁপে কেঁপে উঠল আনন্দে।

জানতে পারল শঙ্খচূড়।

জানতে পারল কয়েকদিন বাদে। নতুন জীবন আসছে, নতুন মানুষ। কামনার ফসল আসছে কমনীয় কান্তি বসন্তের। আগে শীতশেষের অপেক্ষামদির নম্রতার মতো নবজন্মের সূচিপত্র তৈরি হয়ে গেছে। ফুলের সম্ভাবনার কুঁড়ি ধরেছে গাছে, শেষ রাতের শুকতারায় জানানি পাওয়া গেছে, ভোর হতে আর দেরি নেই।

'বৌ বৌরে, কুঞ্জর লগে দেখা হইয়া গেল আউজগা। শিয়ালদার ইস্টিশনেই থাকে অরা। কাইল আমার লগে এইহানে লইয়া আমু হেরে। কুঞ্জ এই হানে থাকতে চায়। মাইয়াডারে লইয়া একটা মাচা কইরা থাকলে তো বালোই। তর লগে তো জবর খাতির আছিল মাইয়াডার। এই সময় একজন বন্ধুর লগে থাকতে তর বালোই সময় কাটব, না কি কছ্?'—

'ও, বাঁচি তা অবলে আমি। উঃ, এই লঙ্কাপুরীতে একবারে সময় কাটে না গো। কাউলকাই মালতী আর কুঞ্জকাকারে লইয়া আইবা, বুঝ্‌লা?'—বৌটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

'ইস, সই আইবো দেইখ্যা খুসী যে, অ্যাঁ?'—টিনের স্যুটকেসটা খুলে চিরুনিগুলো গুণতে গুণতে বলে লোকটি। তারপরে গোণা শেষ করে বলে,—আমি ঠিক করছি, এইহানে আবার আমাগো গেরামটারে লইয়া আমু। হগলতেরে এই জায়গায় আইনা নতুন গেরামের পত্তন করুম। অই বিলটার দক্ষণদিকে মেলাই বাঁশঝাড় আছে, ঘরটর করতে আর অসুবিধাটা কি ক তো?'—

'কিন্তু'—স্বামীর পিঠে মুখ রেখে বলে বৌটি,—'এহান থিক্যা খেদাইয়া দিব না ত আমাগো?'—

'হুঁ', অমন কাঁচা পোলা না আমি। সব খবর লইছি। এইটা গরমেণ্টের জমি। কবের থন পথিত পইরা রইছে। এই জঙ্গলে থাকুম নিজেরা গেরাম কইর‍্যা, ত খেদাইব কেল্‌লিগা? কইলকাত্তার সহরে তো থাক্‌তাছি না রে বাপু?—

মেয়েটি আশ্বস্ত হয়।—'উঃ, তবে যে কি বলো অইব! মানুষের মেলে না থাকলে কি বালো লাগে, কও?'

'কেন্‌ আমি বুঝি মানুষ না?' স্যুটকেস বন্ধ করে মুখ ফেরায় লোকটি।

'আহা কথার কি ঢং, তুমি তো আছই। তুমি তো আমার হগল সময়ের মানুষ। অন্য দশজনের মধ্যে বুঝি থাকন্‌ দোষের?'—

'ও, একজনে কুলায় না বুঝি, দশজন লাগব্‌?'—

'দূর বদমাইস অসইভ্য কুন্‌খানের। তোমার লগে যদি আর কথা কই আমি'—মেয়েটি ঠোঁট ফুলিয়ে উঠে যায়। হাসিতে ভেঙে পড়ে লোকটি।

ছেলেমানুষ বৌটির রকমসকম দেখে শঙ্খচূড়েরও হাসি পায় কিন্তু এমন হাসলে চলবে না, পেটের ভেতর সুবোধ্য দাহন শুরু হয়ে গেছে। কোটর থেকে ধীরে বেরোতে থাকে শঙ্খচূড়, শিকারে বেরুবার সময় হয়ে যাচ্ছে, আর দেরি করা যায় না। অথচ ওদের জীবনযাত্রার টুকিটাকি দেখতে খুব ভালো লাগে, ও জিনিস দেখার লোভ কাটানো আজকাল মুশকিলই হয়ে পড়েছে শঙ্খচূড়ের। তবুও, না বেরুলে তো চলবে না!...

আবার একটি পরিবার। আবারো একটি নতুন সংসার এলো চাঁদমারিতে। শঙ্খচূড় দেখলে। মালতী ওর বাবা কুঞ্জ আর ছোট ভাই রতন। ঝিলের দক্ষিণের বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ এনে কেটে কেটে ওরা ছোট বেড়ার ঘর তুলল চাঁদমারির লাগোয়া মাঠটার এককোণে। মানুষের আওয়াজ আরো একটু শোনা যেতে লাগল চাঁদমারিতে। চাঁদমারিতে দুটো সংসারের আস্তানা এখন। নতুন আশ্রয়ভূমি।

তারপর আরো একটি পরিবার। আরো একটি ঘর। তারপর আরো, আরো অনেক।

চাঁদমারিতে বর্ষা কাটল। টইটম্বুর ঝিলে কাকচক্ষু জলে রুপোলী মাছেরা মাঝে মাঝে ধার ঘেঁষে ঘুরে বেড়ায় এখনো। বর্ষাভেজা বকদের পাখা শুকিয়েছে। কচুবন আরো হাত চারেক জমিতে তাদের বংশবৃদ্ধি করেছে এ বর্ষাতেও। বর্ষাটা নেহাত মন্দ কাটে নি শঙ্খচূড়ের। বর্ষার পর শরৎও ঘুরে গেল চাঁদমারিতে। আজকাল হেমন্তের কুয়াশা আকাশে ঝুলে থাকে অনেক রোদ পর্যন্ত। এরপরই শীত আসছে। শঙ্খচূড়ের সবচেয়ে অপ্রিয় ঋতু। রিক্ততার দেবী তুহিন ঋতু।

এদিকে ঋতুচক্রের চাকায় কাটছে সময়, প্রাকৃতিক যোগবিয়োগ চলছে গতানুগতিক ছন্দে, আর ওদিকে শুধু যোগ, শুধু সংযোজন। জনপদ গড়ে উঠেছে। একটির পর একটি নতুন ঘর উঠেছে। নতুন আবাস। "চাঁদগড় বাস্তুহারা কলোনী"।

অবাক চোখে শঙ্খচূড় দেখলো নতুন জনপদের আবির্ভাব। মানুষের মৈত্রীঘন আস্তানা। খুব খারাপ লাগল না শঙ্খচূড়ের। এ গড়ে ওঠার দর্শক তো সেই। এ ইতিহাসের সাক্ষী। শুধু আগের চেয়ে অনেক বেশী সাবধান হতে হয়েছে শঙ্খচূড়ের। মানুষ তার জাতের মিত্র নয়, একথা জানে শঙ্খচূড়। শঙ্খচূড়ের সমবেদনাময় মানসিকতা বুঝবে না ওরা, মানুষের পক্ষে সেটা বোঝা সহজ নয়। তাই শঙ্খচূড় নিজেই সতর্ক থাকে আজকাল। আর শুধু দেখে যায়, জীবনের জায়যাত্রার গুণমুগ্ধ দর্শক সে।

চাঁদমারির মাঠে একটি ঘরে হঠাৎ যেন আনন্দের উৎসব লাগে। সুড়ঙ্গ ঘরের বৌটি ভোরে সেই যে গেছে সেদিকে, সারাদিনে ফেরে নি। কি ব্যাপার? কিসের উৎসব এটা? কিন্তু দিনে বেরুলে তো চলবে না শঙ্খচূড়ের, মানুষের চোখে পড়া তো মৃত্যুদণ্ডের মতো। তাহলে?....

টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।

ঢাকের আওয়াজে কেঁপে উঠল শঙ্খচূড়। রাত ঘনাচ্ছে। এবার তার পক্ষে বেরুনো চলে। ধীরে সে উৎসব মুখরিত ঘরটার পাশে জামরুল গাছটার আড়ালে দাঁড়ালো। সুন্দর! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দুটো পিঁড়িতে বসে। চারপাশে হাসিমুখ সারা চাঁদগড়ের মেয়ে পুরুষ শিশুদের ভিড়। বিয়ে! বিয়ে হচ্ছে চাঁদগড় কলোনীতে। বিয়ে? খুসীর দমক বয়ে গেল শঙ্খচূড়ের হিসিয়ে ওঠা চেরা জিভে। আবার একটি নতুন দম্পতি হল। হয়তো সুড়ঙ্গ ঘরের স্বামী-স্ত্রীর মতো মিষ্টি হবে এই নবদম্পতির জীবনও। এই মেয়েটি হয়তো অমনি সে বৌটির মতোই একদিন স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে জানাবে নতুন অনাগত এক মানুষের আগমন সংবাদ। তারপর একটি নতুন জীবন একদিন বিস্ময়ের জগৎ থেকে এসে ভুমিষ্ঠ হবে এই মাটির পৃথিবীতে। নতুন মানুষ। নতুন পৃথিবী।.......

নতুন মানুষ আসছে! সুড়ঙ্গ ঘরের সামনে ছোট্ট বাঁশের বেড়ার নতুন ঘরটার দরজার বাইরে ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছে লোকটি। কলোনীর আরো কিছু মেয়েরা এসেছে। তারাও অপেক্ষা করে আছে। হঠাৎ শিশুর কান্নার মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। বাঁশের দরজাটা খুলে একজন বর্ষীয়সী মহিলা বেরুলেন হাসিমুখে, 'পোলা, হইছেরে'—

'অ্যা, পোলা অইছে'?—আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লোকটির মুখ। সমস্ত মেয়ের দল কলহাস্য করে উঠল আনন্দে।

'কই নন্দদা, এইবার মিষ্টি আনেন। মিষ্টি না খাইয়া আর যাইতেছি না আমরা, হ্যা'—

'খাওয়ামু, খাওয়ামু।'—কেমন একটা লজ্জিত হাসি ফুটে ওঠে লোকটির ঠোঁটে।

এমন আনন্দের প্রকাশ শঙ্খচূড় আর দেখে নি। বিদ্যুতের মতো শুধু তার মনে পড়ল চাঁদমারিতে সেই মৃতশিশু কবর-দিতে আসা ভয়ার্ত তরুণ ছেলেটির মুখ। যেন রাত আর দিন। এত তফাত কেন, কে জানে!...

শীত এল তার রিক্ততা নিয়ে। কিন্তু শীতই শুধু এলো না চাঁদমারিতে, শুধু শীতের দুঃসংবাদই নয়, আরো কি একটা দুঃসংবাদ এলো 'চাঁদগড় বাস্তুহারা কলোনীতে। সমস্ত কলোনী কেমন থমথম করছে। ঝড়ের পূর্বাভাস?

প্রথম কিছু বুঝে উঠতে পারল না শঙ্খচূড়। বুঝল দিন কয়েক পরে।

'আমাগো এইহান থিক্যা উইঠ্যা যাইতে কয় রে বৌ'—আঁতুড় ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে লোকটি বলে।

'অঁ, কে কয়, কেন্?' উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে বৌটি।

'গরমেন্ট থিক্যা উইঠ্যা যাইতে কয়, এইহানে বলে কি সব গরমেন্ট করব। আমাগো

খেদাইয়া দিতে চায়—'

'তাইলে কি অইব গো ?' বৌটির গলার স্বরে কান্না।

'দেহি, কি করন যায়। এত কইর‍্যা এত মানুষ জমাইয়া এমন সুন্দর কলোনীটা কবলাম। হালারা আমাগো বাঁচতে দিতে চায় না। গরমেন্টের কাছে বৈকুণ্ঠ রাজেন্দ্র অরা দরবার করতে গেছিল। তাগো ফিরাইয়া দিছে, কথাই কইতে দেয় নাই। কি যে অইব বুঝি না'—লোকটি চিন্তাক্লিষ্ট মুখে গাছের একটা গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে।

'জঙ্গলে আইয়া নিজেরা সব করলাম, মুখপোড়া গরমেন্টের খালি খালি বজ্জাতি, মরারা মরেও না'—আপন মনে শাপান্ত করে বৌটি।

'আউজগা এউগ্যা মিটিন অইবো এইহানে। দেহি হগলে মিলা পরামর্শ কইরা কি করন যায়'—

বুঝল শঙ্খচূড়। আহত হল একটু।

মিটিং শুনে বুঝলো আরো। এ জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে এ সপ্তাহের মধ্যে। ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া আদেশ। ওরা অনেক আলাপের চেষ্টা করেছে, কিন্তু হয় নি। সাতদিনের ভেতরে না ছাড়লে পুলিশ দিয়ে তুলিয়ে দেবে।

যাবো আমরা ? কিন্তু কোথায় যাবো ? কেন যাবো ?....ওদের শুধু প্রশ্ন। তেত্রিশ ঘর মেয়েমরদের নিরুপায় জিজ্ঞাসা।

রক্তমুখী দিন। ঐতিহাসিক একটা দিন এলো চাঁদমারিতে। প্রথমে জনা পঁচিশেক পুলিশ এলো। তারপর ক্রমে আরো, আরো। কলোনীর মাঠ থেকে সমস্ত মেয়েরা এসে ঢুকল সুড়ঙ্গ ঘরের ভেতর। ছেলেরা রইল ঘর আগলে। পুলিশ সব মাঠটা ঘেরাও করে ধরেছে। হোক দিন, তবু এ দৃশ্য না দেখে থাকতে পারবে না শঙ্খচূড়, খুব সতর্ক হয়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল শঙ্খচূড়। না, মাটিতে নয় বটগাছের একটা শুকনো ডালের সঙ্গে গা মিশিয়ে তাকিয়ে রইল মাঠটার দিকে।

ভোলা যায় না। নির্বিবাদে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঁশের দুর্বল ঘরগুলোর ওপর। ভেঙে চুরমার করে মিশিয়ে দিল মাটিতে। যারা বাধা দিতে চাইছে তাদের নির্মম লাঠি মারা হচ্ছে, ধরে ধরে বেঁধে ফেলা হচ্ছে দড়ি দিয়ে। অবাক চোখে তাকিয়ে এই ধ্বংসলীলা দেখল শঙ্খচূড়।

এদিকে সুড়ঙ্গ ঘরেও কান্নার রোল উঠল মেয়েদের। এখানেও হামলা করল পুলিশ। আশ্চর্য, ঘরে ঢুকে মেয়েদের টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হচ্ছে। আঁতুড় ঘরটা থেকে বৌ আর তার কচি ছেলেকে বের করে দিয়ে ওঘরটাও ভেঙে ফেলা হল। ধ্বংসের নাটক যেন। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন দুর্বোধ্য মনে হয় শঙ্খচূড়ের। এ নির্মমতার মানে কি ? কেন এই মানুষে মানুষে এমন হিংস্র বিরোধ ?

একজন রিভলভারধারী দাঁড়িয়ে ছিল বটগাছটার নিচের ঢিপিটার ওপর। আরেকজন রিভলভারধারী মাঠ থেকে উঠে চলে এলো তার কাছে।

'সিগারেট আছে দত্ত ?"

'হ্যাঁ নাও। আচ্ছা চ্যাটার্জি, তুমি কি মনে করো এখানে গভর্নমেন্ট টাউন আদৌ হবে ?'

'আলবৎ না। কি বলব দত্ত, আমি বাজী রেখে বলতে পারি, টাউন হবে তো কাঁচকলা, ঐ তোমাদের প্রাইম মিনিস্টারের দিল্লী থেকে আসবার কথা আছে না ফাউণ্ডেশন স্টোন লে' করতে, সে ব্যাটা শেষ পর্যন্ত আসে কিনা দ্যাখো। ভেবেছো শালার এ গভর্নমেন্টকে আমি চিনি নি ? হাড়ে হাড়ে চিনি। লালবাজার থেকে

স্পেশাল নোট দিয়ে খুব হম্বিতম্বি করল বড়কর্তারা, এবার দেখি কবে এখানে তোমার 'গভর্নমেন্ট টাউন' হয়। শালার এ কলোনী ভেঙে লাভের মধ্যে এই হল যে অপোনেন্ট কাগজগুলো 'পুলিশী অত্যাচার' বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এবার বাজার মাৎ করবে। আরে আরে দত্ত,—হঠাৎ মাঝের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চ্যাটার্জি,—'বলো, বলো ওদের, বেশী আরেস্ট করে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। অ্যারেস্ট করে তারপর শালা কোর্টের ঝুক্কি'—বলতে বলতে দু'জনেই নেমে চলে গেল মাঠের দিকে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপল শঙ্খচূড়।

ভাঙাচোরা ঘর থেকে যার যেটুকু জিনিস পাওয়া গেল মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে বেঁধে ফেলল সব। তারপর সেগুলো তুলে নিয়ে সবাই এক সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। কারুর মুখে এতটুকু আওয়াজ নেই। কচি শিশুরাও নিশ্চুপ। সঙ্গে কিছু পুরুষও রয়েছে, অনেকেই আহত।

সমস্ত দলটা ধীরে সারি বেঁধে নেমে চলে গেল চাঁদমারি থেকে। আবার জনশূন্য হয়ে গেল চাঁদমারি। জনহীন নিঝুমপুরী।

কোটরে বসে কেমন বিশ্রী ফাঁকা লাগে শঙ্খচূড়ের। সুড়ঙ্গ ঘরের দম্পতিটিই ওর মনে সবচেয়ে বেশী দাগ কেটেছিল। একটা গোপন আত্মীয়তা ঘটে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। ওরা কি আর ফিরবে না? নতুন শহর হবে চাঁদমারিতে, নতুন জনপদ?....সে শহরে কারা থাকবে?....সেই বৌটি থাকবে না? সেই ছেলেটি?....মোমিনপুরের মতো শহর হবে সেটা?....শঙ্খচূড়কে পালাতে হবে এ কোটর ছেড়ে?...

কৌতূহলী শঙ্খচূড় অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে। নতুন শহর দেখবে সে, নতুন জনপদ। কবে?

কিন্তু....

দীর্ঘ একটি বছর কেটে গেল। কোথায় শহর? কোথায় নতুন মানুষের উপনিবেশ?...চাঁদমারির বটগাছ যথারীতি আরেকটা শীত কাটিয়ে নতুন পাতায় শ্যামলী হয়ে উঠল, কৃষ্ণচূড়ার বিধবা ডালে আগুন জ্বলল কুমারী আবির-রঙা ঠোঁটের মতো, সাদা ফুলের মৌসুম এলো কাঠগোলাপ বনে, কোত্থেকে কয়েকটা মোরগফুল গাছ এসে মাথা তুলেছিল ঝিলধারে, তাতে করমচা-লাল ফুলের ঝুঁটি জাগলো বসন্তের প্রশ্রয়ে, আর আগের মতো মিনিটে মিনিটে স্পর্শ পেয়ে চোখ বুজতে হচ্ছে না বলে লজ্জাবতীরাও খুশীতে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন নতুন জায়গায়, টিয়েপাখিরা ঝাঁক বেঁধে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে উড়ে চলে গেছে যথারীতি, পানকৌড়িরা ফিরে এসেছে ফের ওদের পুরোনো ঝিলে। নতুন নয় কিছু, এসব চাঁদমারির চিরকালের রূপসজ্জা। বসন্তমাতাল চাঁদমারি চিরদিনেরই।

কিন্তু আরেক দিকও আছে চাঁদমারির, আরেক কাহিনী। বিধ্বস্ত কলোনীর সেই মাঠটা আগাছা ঝোপে ছেয়ে গেছে এরই মধ্যে। বুনো ঘাসের তলায় কোথায় চাপা পড়ে গেছে বাঁশবেড়ার ভগ্নস্তূপ কে জানে!

আর সুড়ঙ্গ ঘরটার সমস্ত মুখ ছেড়ে বটের শিকড় নেমেছে মাকড়শার জালের মতো। নিকনো দাওয়ায় বাঁধভাঙা নদীর ঢেউ-এর মতো এক কোমর আগাছার জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। কোত্থেকে কয়েকটা শেয়াল এসেছে চাঁদমারিতে, অধুনা ওগুলোরই বাসস্থান সুড়ঙ্গ ঘরটা। বিকেলের দিকে যদি খুব তীক্ষ্নভাবে লক্ষ্য করো, তবে গোটা দুয়েক সূর্য রেখা আবিষ্কার করতে পারবে হয়তো, যে'দুটো বটগাছের শেকড়ের পাশ কাটিয়ে কোনরকমে শ্যাওলাজমা সুড়ঙ্গ ঘরের মেঝে পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে। আর রাতে যদি ঘরটার ভেতর ছোট্ট ছোট্ট অঙ্গার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাও, ভেবো না ওগুলো কোন দলছুট

জোনাকি পোকা, আসলে শেয়ালের চোখ ছাড়া আর কিছু ওগুলো নয়।

বয়স হয়েছে শঙ্খচূড়ের। এ জীবনে অনেক দেখেছে সে। সে দেখেছে এখানকার প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি অধিবাসীকে। দেখতে তার ভালোই লাগে। কলোনী উঠে যাওয়ার দু'বছর পর সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে শহর এখানে হবে না, নতুন জনপদ গড়ে ওঠার আর কোন সম্ভাবনা নেই। তবু আশা করে সে, দু'চারজন ইতিউতি মানুষ নিশ্চয়ই আসবে চাঁদমারির সুড়ঙ্গ ঘরে, অন্তত এ ঘরটায় কেউ না কেউ কোনদিন হুট করে চলে আসবে নিশ্চয়ই। সে সেই সাধুদের মতো কোন সাধুও হতে পারে, হতে পারে কোন পুলিশ পালানো পড়ুয়া বিপ্লবী হতে পারে বাস্তুহারা দম্পতিটির মতো কোন সুখী পরিবার, আরো কতো রকমই হতে পারে, কতো বিচিত্ররকম মানুষ, কে জানে!...

দিন যায়, মাস ফুরোয়, ঋতু পাল্টায়, বছরও গড়িয়ে যায়। কিন্তু না, কোন মানুষের পদশব্দই আজ বাজে না চাঁদমারির বুকে।

একদিন শিকার শেষে ফিরে কোটরে ঢুকতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় শঙ্খচূড়। না, আর কোন আশা নেই। আর কোনদিন মানুষ আসবে না এই চাঁদমারিতে। আর কোন দিন কোন পুরুষ কণ্ঠের হাসি বা নারীকণ্ঠের অভিমান জড়ানো ঝর্ণাস্বর শুনতে পাওয়া যাবে না এখানে, কোন বিপ্লবী পারবে না পুলিশের চোখ থেকে আত্মগোপন করে এখানে থাকতে, কোন সাধু তার অসামাজিক জীবনের আস্তানা করতে পারবে না এখানে, কেউ এক রাতের জন্যেও মাথা গুঁজতে পারবে না আর চাঁদমারিতে।

মাটি ধসে পড়ে সুড়ঙ্গ ঘরটা বুজে গেছে চিরকালের জন্যে।

।। সাঁজালিজেঁ ।।

ওদের চিনতে অসুবিধে হয় না। ইওরোপের সব শহরেই দেখতে পাওয়া যায়। ওরা ছেলেধরা। সাঁজালিজেঁর মধ্যমণি আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফের নিচেই দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। নিজেকে সোচ্চার করে দাঁড়িয়েছিল শরীরের ঢেউ কামড়ানো স্কার্টের খাঁচায়। চোখে চোখ পড়লেই চলো-যাই চাউনিতে বিদ্ধ করে। মিস্টি হাসির আক্রমণে বিধ্বস্ত করতে চায়। মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে গেছে মনে হল। চাউনিটা বিবর্ণ, হাসিটা বিধবা। সুকুমার মেয়েটির হাসিকে ব্যর্থ করে দিয়ে টিকিট কেটে উঠে গেল আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফের ওপরে। ওপর থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখল প্যারিস শহরের অসামান্য রূপ, সাঁজালিজেঁর জনারণ্য আর দ্রুত যানবাহনের চলচ্চিত্র। কয়েকটি ছবি তুলল পথঘাট যানবাহনের। নামবার সময় আবার দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি ত্রিভঙ্গিমায় আবেদনময়ী হয়ে আবার কিছুটা মরা হাসি আর ভরা চাউনি খরচ করল। সুকুমারের কষ্ট হল। কে জানে কখন থেকে মেয়েটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বেচারী! আজ ১৪ই জুলাই। সুকুমার জানে আজ ফরাসীদের উৎসবের দিন, আজ ব্যাস্টিল ডে। আজকের আনন্দের দিনে, সুকুমার ভাবল, মেয়েটার সঙ্গ ভালোই লাগবে বোধ হয়। সুকুমার মনস্থির করে ফেলল। মেয়েটার কাছে গিয়ে বলল,—আসবে আমার সঙ্গে?

মেয়েটি খুশিতে উপচে বলল,—উই মঁসিয়ে।

হাতে হাত দিয়ে সাঁজালিজেঁ ধরে হাঁটিতে থাকে ওরা। সুকুমার বললে,—আজ তোমাদের উৎসবের দিন সেজন্যে আজ তুমি আমার গাইডের কাজ করো।

মেয়েটি মাথা নাড়ল। আলাপ বাড়াবার জন্য সুকুমার নিজের নাম জানিয়ে মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি জবাব দিল,—মণিক।

সুকুমার হেসে বলল,—মণিকা হলে আমাদের দেশের মেয়ের নাম হত। মণিক বলল, তুমি চাও তো মণিকাও ডাকতে পারো। এরপর সুকুমার সিগারেট বার করে বলল, সিগারেট?

মেয়েটার চোখ লোভে চকচক করে উঠল,—ইংলিশ সিগারেট। ইস কতদিন খাই নি।

সুকুমার উদারতায় দাতাকর্ণ হয়ে বলল,—প্যাকেটটাই তুমি রেখে দাও।

মণিক গদ্‌গদ হয়ে শুধু বার বার বলল,—মের্সি, মের্সি মঁসিয়ে। এরপর আলাপে মুখর হয়ে উঠল ওরা। অপরিচয়ের বরফ গলে গিয়ে দু'জনেই সহজ হয়ে উঠল। সাপ, যোগ, হাতী, মহারাজা সম্পর্কিত ভুল ধারণা নির্মূল করে সুকুমার ভাবতবর্ষের অনেক গল্প করল। মেয়েটি যুদ্ধ, অলিম্পিয়া প্রেসের বই, মডেলিং, ব্রিজিট বার্ডট শুরু করে প্রিয় ককটেলের গল্প শোনাল সুকুমারকে।

আর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল সাঁজালিজেঁর রাজপথে। মেয়েটার তেষ্টা পেয়েছিল। ওরা একটা বারে ঢুকে দু'বোতল বিয়ার খেয়ে গলা ভেজালো।

এরপর ?...

এরপর যা হওয়া উচিত, এতকাল হয়ে এসেছে, তাই হলে এ গল্প লেখার দরকার হত না। স্বভাবতই আপনাদের মনে হবে এরপর বুঝি সুকুমার আর মেয়েটি অনেক গল্প করবে, আলোকমালায় সজ্জিত শহর দেখবে, দেখবে রং-বেরঙের বাজী পোড়ানো আর আনন্দ-উদ্বেলিত জনতা। তারপর রাত গভীর হলে ওরা যাবে কোন নাইটক্লাবে। সেখানে বসে দেখবে ফ্লোর শো, কোন সুন্দরী বাজনার তালে তালে বস্ত্রত্যাগ করবে, স্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে দিয়ে তাই দেখে ওরা কিছুটা উত্তেজিত হবে। তারপর কিছুক্ষণ নাচবে গায়ে গা ঠেকিয়ে। শেষ রাতে ওরা যাবে হোটেলে। সুকুমারের বিছানায় গা এলিয়ে মেয়েটি এক রাতের জন্য সুকুমারের বধূ হবে। সকালে মেয়েটা উঠে পোশাক পরে চুলে চিরুনি চালিয়ে সুকুমারের কাছ থেকে টাকা নেবে গুণে গুণে, হাসবে, তারপর চলে যাবে। সারাদিন মেয়েটি বিশ্রাম করবে, ঘুমুবে। পরদিন সন্ধ্যায় আবার এই নিশাচরী সাঁজালিজেঁর পথে খুঁজবে সে রাতের জন্য আর এক সংযমহীন পুরুষক্ষুধাকে। আর সুকুমার অনেক বেলায় উঠে স্নান করে বেরুবে শহর দেখতে। অসংযমী রাতটা সে ভুলতে চাইবে। হয়তো ভুলেই যাবে।

সত্যি বলতে কি, এভাবেই সুকুমার-মণিকের গল্প শেষ হতে পারত। স্বাভাবিকভাবে তাই হওয়া উচিত। কিন্তু হল না। হল না বলেই এই গল্প লেখা।

গল্পের মোড় ঘুরল মেডেলিনে এসে। হেঁটে হেঁটে মেডেলিন চলে এসেছিল ওরা। সেখানে হঠাৎ জনস্রোতের মধ্যে থেকে একজন চোয়াড়ে চেহারার লোক বেরিয়ে এসে হাত চেপে ধরল মণিকের। চেঁচিয়ে বলল,—অ্যানা। (সুকুমার চমকালো না। ও জানে কোন বারবনিতা তার সত্যিকারের নাম বলে না। ও বুঝল আসল নাম অ্যানা, মণিক নয়।)

চমকে মণিক ঘুরে দাঁড়াল। তারপর দু'জনে অনর্গল ফরাসী ভাষায় অনেক কিছু বলে গেল। ছেলেটি হঠাৎ রেগে গিয়ে হাত চেপে ধরল, মেয়েটি কষে এক চড় লাগাল ছেলেটির গালে। হাতাহাতি শুরু হয় হয়। সুকুমার বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভিড় জমে গেল। সবাই কথা বলতে শুরু করল। শেষে মেয়েটি তীব্র ভাষায় গালি দিয়ে ছুটে চলে গেল সেখান থেকে। ছেলেটি পেছনে যেতে চাইছিল কিন্তু অন্যেরা আটকে রাখলো। সুকুমারের যখন সংবিৎ ফিরল তখন দেখল রাস্তায় রাস্তায় আনন্দ-উদ্বেল জনতার স্রোত চলেছে। মণিকের কোন চিহ্ন নেই। ছিঃ ছিঃ, ভাবল সুকুমার, কি বিশ্রী দৃশ্য। মনটা তেতো হয়ে গেল ওর। সামনে একটা বার দেখে ও ঢুকে বসল কোণের চেয়ারে। অর্ডার দিল ডবল স্কচের। ড্রিংকটা নিয়ে ও একটু একটু চুমুক দিচ্ছিল আর সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় মণিক বেরিয়ে এল সে বারেরই মেয়েদের বাথরুম থেকে। ওকে দেখতে পেয়ে মরা ঠোঁটে হাসল। সুকুমারের গা জ্বালা করছিল। ভাবছিল বলে, কেটে পড়, আমার তোমাকে আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু বলবার আগেই পাশের চেয়ারে এসে বসে পড়ল মেয়েটি। সুকুমারের হুইস্কিটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল। তারপর সুকুমারের দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সুকুমার মনে মনে ভাবল জীবনে আর কোন রাস্তার মেয়েকে সে ডাকবে না। শাস্তি অনেক হয়েছে। সত্যি বলতে, ও রেহাই চাইছিল। মণিক কান্না থামিয়ে বলল,—আমি দুঃখিত। তোমাকে আজ খুব বিপদে পড়তে হচ্ছে আমাকে নিয়ে।

সুকুমার কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। মেয়েটি হঠাৎ উঠে বলল,—চলো বেরোই।

বাইরে এসে সুকুমার বলল,—শোন তোমার যা টাকা প্রাপ্য বলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপর তুমি চলে যাও।

মেয়েটা সুকুমারের হাত চেপে ধরে বলল,—না না, আমাকে যেতে বলো না। টাকা আমি চাই না। জানি আমি তোমার সব আনন্দ মাটি করেছি কিন্তু জর্জের সঙ্গে এরকম দেখা হয়ে যাবে আমি ভাবি নি। ওকে দেখেই আমার মাথার রক্ত চড়ে গিয়েছিল।

জর্জ কে?—সুকুমার প্রশ্ন করল।

শয়তান, ছোট্ট একটা জবাব দিল মণিক,—মূর্তিমান শনি ও, শনি।

এর পর ওরা অজান্তেই সিন নদীর ধারে এসে বসল। মণিক যা বলার সব বলে গেল ধীরে ধীরে। সুকুমার জলের উপর আলোকমালার ঝিকিমিকি দেখল আর শুনে গেল। সুকুমারের করুণা হল। গল্পটা সত্যি করুণ। সুকুমারের চোখে জল এসে গেল, কান্না পেল সুকুমারের। মণিকের গল্পটা এই।

যুদ্ধের সময় জন্মেছি আমি। বাবা যুদ্ধে মারা গেছেন। মা আমাকে নিয়ে কিছুদিন কষ্টেসৃষ্টে চালালেন, তারপর একদিন আমাকে ফেলে কিছু সৈন্যের সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। দোষ দিই না। যুদ্ধে পুরুষ শুধু রক্তপায়ী জন্তু আর নারী শুধু সহজলভ্য মাংস। চরিত্রের মৃত্যু হলেই যুদ্ধ সম্ভব, সম্ভব মৃত্যুর চরিত্র। আমি বড় হলাম কিছু আত্মীয়ের বাড়িতে আর অনাথ আশ্রমে। চমকাবার মতো নয়, তাই এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, তের বছর বয়সেই আমি কুমারীত্ব হারিয়েছি! তখন থেকেই আমি বারবনিতা, আইসক্রিমের বদলে যে কারুর সঙ্গে শুয়েছি। ঈশ্বর আমাকে কিছুই দিলেন না। না পিতামাতার স্নেহ, না বিদ্যা বুদ্ধি কিন্তু মুক্তহস্তে দান করলেন যৌবন। যে যৌবন সম্বল করে আমার যাত্রা শুরু হল। সে যৌবনভরা দেহে আমি পুরুষকে শুধু জানোয়াররূপেই দেখলাম। ওদের পিতারূপ, ভ্রাতৃরূপ, স্বামীরূপ প্রেমিকরূপ—সব আমার কাছে মনে হত মিথ্যা। এমন সময় একটি আমেরিকান ছেলে আমার কাছে আসত। ছেলেটা কবি। আমাকে তার লেখা কবিতা শোনাত।

ভালোবাসার কবিতা। ওর কাছে প্রথম টের পেলাম পুরুষ ও মেয়ের সম্পর্ক বিছানাতেই শুধু হয় না, হৃদয়েও হয়। ওর কাছে জানলাম মন বলে একটা পদার্থ আছে, জানলাম স্বর্গে সবাই যেতে না পারুক, স্বর্গের স্বপ্ন দেখবার অধিকার সবারই আছে। এমন কি তুচ্ছ বারবনিতারও। আমি স্বর্গের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আমার সে স্বর্গের নাম আমেরিকা। ভাবলাম যে করে হোক আমি আমেরিকা যাব। ওখানে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করব। সেই আমেরিকা, যেখানে আকাশবিদ্ধ স্বপ্নের মতো উঁচু বাড়ি, যেখানে একশো ডলারের নোট টয়লেট পেপারের মতো সুলভ।

আমরা দু'জনে ইফেল টাওয়ারের উপর দাঁড়িয়ে ভাবতাম যেন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উপর দাঁড়িয়ে আছি। ভাবতেই কি রোমাঞ্চ!

ছেলেটা আমার প্রেমে পড়ল না। আগেই বলেছিল যে সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভালোবাসে। ও শুধু শরীরের তাগাদায় আমার কাছে আসত, মনের তাগাদায় নয়। ও আমাকে ভালোবাসার জগতের সন্ধান দিল, কিন্তু হাত ধরে সে জগতে নিয়ে যেতে রাজী হল না। আমার দেহে ও শুধু হৃদয় স্থাপন করে দিল। আমাকে নতুন এক যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ছেলেটি একদিন চলে গেল। ওর যাবার দিন আমি কেঁদেছিলাম। কোনো পুরুষের কথা ভেবে এতকাল মুখে থুতু আসত। সেই প্রথম পুরুষদের কথা ভেবে চোখে জল এসেছিল।

তারপর আমার ধ্যানজ্ঞান হল আমেরিকা। ঠিক করলাম আমি আমেরিকা যাব। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমেরিকায় যেতে হলে কমপক্ষে আমার দশ হাজার ফ্রাংক জমানো উচিত। শুরু করলাম অর্থসঞ্চয়। দিন রাত দেহ বিক্রি করতে লাগলাম। এমন কি

কম দরে নিজেকে বিকোলাম। উদ্দেশ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দশ হাজার ফ্রাংক চাই আমার। দশ হাজার ফ্রাংক মানে মুক্তি, মানে স্বপ্ন, মানে নতুন এক জীবনের সঙ্গে বর্ণপরিচয়। হয়তো তখন নিজেকে আর ঘৃণা হবে না। ভালোবাসতে পারবো নিজেকে। হয়তো আরও কোন হৃদয়বান পুরুষও পেয়ে যাবো যে আমাকে মনে করিয়ে দেবে আমি শুধু নারী নই, মানুষ। যে হয়তো আমার হৃদয় জয় করে আমাকে দেবে সে পদবীর স্বীকৃতি, সমাজে সোনার চাবি।

অন্যান্য মেয়েরা আমার পাগলামিতে হতবাক। আমার কৃপণতায় ওরা আমার নামকরণ করল 'টাইট ফিস্ট'। আমার স্বপ্নটাকে ওরা ভাবত একটা উৎকট বিলাসিতা। যে যাই ভাবুক আমি স্থিরসংকল্প। অসুস্থতা নিয়েও আমি শরীরটাকে রেহাই দিই নি। বিকারগ্রস্ত লোকের যে কোন বিকার মেনে নিয়েছি। নরকের আগুনে পুড়েছি শুধু চোখে স্বর্গের স্বপ্ন নিয়ে। নর্দমার জলে গা ডুবিয়েছি। কিন্তু শুধু গা'ই ডুবিয়েছি, মনকে ডুবিয়েছি শুধু স্বপ্নসরোবরে।

সে সব কি দিনই না গেছে! কিন্তু যখন একা বসে বসে টাকা গুণতাম তখন বুক ভরে যেত, দুঃখগুলোকে তুচ্ছ মনে হত।

সেদিন ছিল রোববার। সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ ছিল কিন্তু আমার জমানো টাকার পরিমাণ তখনও পাঁচ হাজার থেকে পাঁচশো কম। তাই সে শরীরেই বেরোলাম নরকের কোন জন্তুর সন্ধানে। পেলাম। একজন বৃদ্ধ। সে গত যুদ্ধে জেনারেল ছিল। লোকটার ব্যবহার ভালো। বলল,—সারা রাতের জন্য পাঁচশো দেবে সে। কাজ শুধু তার সখের ছবি আঁকার জন্যে পোজ দেওয়া। রাজী হলাম। এ যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া। সে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। ভালো খাবার এলো, এলো ভালো শ্যাম্পেন। খাবার-টাবার পর এলো আমার পোজ দেবার সময়। বিবস্ত্র হয়ে ডিভানে আমি পোজ দিলাম। জেনারেল ইজেলে গেল ছবি আঁকতে। খানিকক্ষণ এঁকে ঢক ঢক করে এক গাদা মদ গিলল জেনারেল। তারপর মুহূর্তে শিল্পীটা একটা নৃশংস পশু হয়ে গেল। চাবুক এনে আমাকে সে মারতে লাগল হঠাৎ। ছুরি নিয়ে আমার বুক ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। লোকটা নির্মম স্যাডিস্ট। চেঁচিয়ে উঠলাম। আরও নৃশংস হয়ে উঠল ও। আগেই অসুস্থ ছিলাম, মনে হল আজ ও আমাকে মেরেই ফেলবে। সারা শরীর রক্তাক্ত। শেষে আত্মরক্ষার জন্য একটা চেয়ার তুলে মারলাম ওর মাথায়। অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ফিরে এলাম। পকেট হাতড়ে পাঁচশো ফ্রাংক নিলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম সে অত্যাচারীর ঘর ছেড়ে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে পারলাম না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

চোখ খুলে দেখি আমি নতুন এক পরিবেশে শুয়ে আছি। একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছেলের মুখ ঝুঁকে আছে আমার উপর। চোখ খুলতেই বলল,—এখন কি ভালো বোধ করছেন?

বললাম,—একটু একটু।

বিদ্যুতের মতো সব মনে পড়ে গেল। প্রথমেই তাই ব্লাউজের নিচে হাত দিয়ে দেখলাম টাকাটা আছে কিনা। আছে। অত দুঃখেও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম। ছেলেটা বলল,—রাস্তায় আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আমি ছেলেটাকে ভালো করে দেখলাম। চমৎকার পুরুষোচিত চেহারা। সবচেয়ে মিষ্টি চোখ দুটি। নরম, নীল, মেয়েলী, বিশ্বস্ত। ছেলেটি বলল,—আমি কফি নিয়ে আসি। ও চলে গেল। আমি দেখলাম ওর ঘর। আগোছালো ব্যাচেলরের ঘর যে রকম হয়ে থাকে সেইরকম ঘর। ছেলেটা কফি নিয়ে এল। গরম কফি খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। ছেলেটার মমতাভরা ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে অনুরোধ করলাম আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে। ছেলেটা বলল,—আপনার অবস্থা এখন যেরকম

তাতে এত রাত্রে যাওয়ার আর মানে হয় না। কাল সকালে সুস্থ হয়ে চলে যাবেন।

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল ছেলেটা আমাকে সুস্থ করছে নিজের ক্ষুধা মেটাবার আশায়। আতঙ্ক হল। কিন্তু না, ছেলেটা আমাকে পরম স্নেহে গলা পর্যন্ত চাদর চাপা দিয়ে দিল। তারপর আলো নিভিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। অন্ধকারে আমি অনেকক্ষণ কাঁদলাম। তারপর এক সময় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।

স্বপ্ন দেখলাম সারারাত। স্বপ্ন দেখলাম আমেরিকার।

পরদিন ছেলেটি ব্রেকফাস্ট করতে করতে নিজের গল্প বলল। সে মার্সিলিজের একটা হোটেলে কাজ করে। প্যারিসে বেড়াতে এসেছে। ও বলল, গত কাল ওর জন্মদিন গেছে। কিন্তু যেহেতু প্যারিসে ওর পরিচিত কেউ নেই, তাই কেউ ওকে ফুল পাঠায় নি, শুভেচ্ছা দেয় নি। হেসে বলল,—আমার জন্মদিনের একমাত্র উপহার তোমার সঙ্গে পরিচয়। আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। দেখলাম ভূমধ্য-সাগরের দু'চামচ স্বচ্ছ নীল জলের মতো ওর চোখ দুটো নির্মল। বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। সামলে নিয়ে বললাম,—তুমি দুঃখ করো না। আমি তোমাকে জন্মদিন উপলক্ষে একটি শুভেচ্ছা চুম্বন দিতে রাজী আছি।

ছেলেটা হেসে বলল,—সেটা হবে আমার সবচেয়ে বড় উপহার। মৃদু হেসে আমি ওর কপালে চুমু খেতে গেলাম। কিন্তু এ কি হল? কপালের জায়গায় এগিয়ে এল ওর উষ্ণ ঠোঁট আর চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর কেঁপে উঠল। কোথায় যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। খুব সম্ভব হৃদয়ের কাছাকাছি কোথায় মৃত এক আগ্নেয়গিরি হঠাৎ প্রাণ পেয়ে গেল। আমি হারিয়ে গেলাম। সেই দীর্ঘ চুম্বনের পর আমি অনেকক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ছেলেটার কোন কথা কানে যাচ্ছিল না। মনে হল আজ, হ্যাঁ আজই, এই চুম্বনেই আমার মনের কুমারীত্ব ঘুচে গেল। এর নামই কি ভালোবাসা?

অনেকক্ষণ শুধু নিজের বুকের আওয়াজ শুনলাম। বুকের আওয়াজকে মনে হচ্ছিল চার্চের ঘণ্টার মতো মধুর। ছেলেটি প্রশ্ন করল,—তোমার জন্মদিন কবে? একবার ভাবলাম বলি,—আজ। কেন না আজই আমার ভালোবাসার জন্মদিন। কিন্তু বললাম,—জানি না। কেন এমন হল? কেন? ভাবছিলাম আমি। মনে হল জীবনের অনেক মুহূর্ত আসে, আয়নার মতো। সেইসব মুহূর্তগুলোর আয়নায় নিজেকে নতুন করে চেনা যায়। মনে হল আমরা নিজেকে কোনদিন চিনতে পারি না। কোন এক সত্তাকে যখন নিজের আপন বলে মনে হয় তখন হয়ত নতুন কোন মুহূর্তের আয়নায় দেখি সে সত্তা বিস্মরণে চলে গেছে। নতুন এক সত্তার জন্ম হয়েছে। বুঝলাম, মানুষ কখনই তার সম্পূর্ণ রূপ পায় না। চিরকালই সে শুধু ভগ্নাংশ থাকে। আর ভগ্নাংশকে সে চিরকালই সম্পূর্ণ বলে ভুল করে।

আমি প্রেমে পড়লাম। ছেলেটি আমার নয়নের মণি হয়ে উঠল। আমার জীবনের সব শুনল ও, আমিও শুনলাম ওর জীবনের চলচ্চিত্র। ভালো লাগল। ও ফুল নিয়ে আসত আমার সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক নাটক নভেলের প্রেমিকের মতো। আনন্দে আমি উদ্বেল হয়ে উঠতাম। শেষ জীবনে নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী হঠাৎ সন্তান পেলে যেমন পাগল হয়ে ওঠে আমিও তেমনি এ প্রেমে উন্মাদ হয়ে গেলাম। শরীরের জগৎ থেকে হৃদয়ের জগতে উত্তরণ হল আমার। আমার সত্যিকারের ভালোবাসা দেখে অন্যান্য ছেলেপরা মেয়েরা ঈর্ষায় জ্বলত। আমি গর্বে বুক ফুলিয়ে ওর সঙ্গে বেরোতাম পথে। সিন নদীর ধারে হাতে হাত দিয়ে ঘুরতাম রোমান্স অধীর কিশোর-কিশোরীর মতো।

আমেরিকার স্বপ্ন তখন আর চোখে নেই। তখন স্বপ্ন শুধু বিয়ের সন্তানের, নতুন সুস্থ জীবনযাত্রার।

আমাদের বিয়ে হল। বিয়ে করে অনেক মেয়ের জ্বলন্ত ঈর্ষার বেড়া ডিঙিয়ে, অনেক

হৃদয়হীন শুভেচ্ছার কাগজের ফুল মাড়িয়ে আমি মমার্ত ছেড়ে গেলাম মার্সিলিজ। স্বামীর ঘর করতে।

প্রজাপতির মতো দিন কাটতে লাগল। এক মাস কাটল হনিমুনে। এই এক মাসই আমার স্বর্গবাস। একদিন স্বামী এসে বলল, বিপদে পড়েছে সে। জানতে চাইলাম,—কি বিপদ? বলল,—এক বন্ধুর কিছু টাকা রাখা ছিল তার কাছে। সে টাকা চুরি গেছে। সে বন্ধু তাকে সাত দিন সময় দিয়েছে। এর মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে সে আমাকে খুন করে ফেলবে।—বললাম,—এই? আমি কি করতে আছি? আমার জমানো টাকাটার কি দরকার? সেটা তোমার কাজে আসবে এর চেয়ে বড় খুশি আমার আর কি হতে পারে। পুরো পাঁচ হাজার ফ্রাংক ওকে দিলাম। বললাম,—এ সব তোমার। বললাম,—আমি স্ত্রী, তোমার বিপদেই তো আমার পরীক্ষা। ও এতক্ষণে হাসল। বলল,—তুমি স্ত্রীর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছো। তোমার এ উপকার কোনদিন ভুলব না। চুমু খেয়ে ও চলে গেল। আমি তৃপ্ত হাসি হাসলাম।

এই হল শুরু। তারপর কয়েকদিন পর এসে ও বলল,—আমার চাকরি গেছে। বলল,—ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। ও আমাকে স্মাগল জিনিস জাহাজে নিয়ে যেতে বলেছিল। আমি রাজী হই নি।

বললাম,—বেশ করেছ। কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক। ভয় পেও না। আরেকটা চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু আমার আশ্বাসে কোন কাজ হল না। ও বেকার রইল। ঈশ্বরকে অনেক ডাকলাম কিন্তু ঈশ্বরও সাড়া দিলেন না। অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত অচল অবস্থা দেখা দিল।

সে সময় একদিন বিকেলে ও আমাকে সে কথাটা বলল। ভাবলে এখনও রাগে ঘৃণায় আমার শরীর রি রি করে ওঠে। বলল,—অ্যানা, তুমিই এখন আমাদের বাঁচাতে পারো।

আমি?—ধক্ করে উঠল আমার বুক।—কি করে?

ও বলল,—এখনও তোমার শরীর যা আছে, যে কোন লোক তোমার সঙ্গে একবার শুতে কম করে একশো ফ্রাংক দেবে।

কি বললে?—আমি দু'হাতে ওর গলা চেপে ধরে নৃশংসের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম,—কি বললে তুমি? আমি তোমার স্ত্রী। আমাকে এ কথা বলতে পারলে? এক ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিয়ে ও বলল,—এমন করছ যেন তুমি নতুন কিছু শুনলে। যেন কত বড় সতীলক্ষ্মী তুমি! যেন মমার্তের নামকরা বেশ্যা ছিলে সেটা বেমালুম ভুলে গেছ। হুঃ! চরিত্রবতীর ভান করো না। এটা বন্দর শহর। এখানে অনেক জাঁদরেল খদ্দের পাওয়া যাবে। কমপক্ষে তুমি মাসে হাজার দু'তিন রোজগার করতে পার। রাজার হালে থকতে পারি আমরা।

কানে যেন বিষ ঢেলে দিল কেউ। আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। দেখলাম ওর চোখ স্বচ্ছ ভূমধ্যসাগরের জলের মতো নীল নয়। স্টোভের গর্জিত শিখার মতো হিংস্র নীল। ওর চোখ কসাইয়ের চোখ। বুঝলাম ভালোবাসা আমি পাই নি। ও কোনদিন আমাকে শ্রদ্ধা করে নি। যে ভালোবাসার শ্রদ্ধা নেই, সে ভালোবাসা তো ভালোবাসা নয়। বুঝলাম আমার হৃদয়ই আমাকে ঠকিয়েছে। মনে হল, যে প্রথম এই হৃদয় বস্তুটিকে আবিষ্কার করেছে তাকে কাছে পেলে আমি ফাঁসি দিতাম।

অবশ হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। খানিক বাদে দেখলাম ও চলে গেছে। ঘৃণায় আমার বমি আসছিল। আমার ভালোবাসার ভগ্নস্তূপের চেহারা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

সন্ধ্যাবেলা ও এল। সঙ্গে দু'জন লোক। শোবার ঘরে এসে বলল,—অ্যানা,

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। দু'জন আরবী মার্চেন্ট খদ্দের এনেছি তোমার জন্য। তিনশো দেবে বলেছে। মালদার পাকড়ানো গেছে। আমি উঠে আবার দেখলাম আমার স্বামীকে। দেখলাম বেশ্যার লোভাতুর এক দালাল আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম আমার স্বামী ঘৃণ্য এক মাংসবিক্রেতা শুধু। এক মুখ থুতু ছিটিয়ে দিলাম ওর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ও। কিল ঘুষি মেরে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করল। অকথ্য সব গালাগালের বন্যা বয়ে গেল। আত্মরক্ষার জন্য চিৎকার করে উঠলাম। আরবী দু'জন এসে আমাদের ছাড়ালো। প্রতিবেশীরাও ভিড় করে এল। আমার মাথা কেটে রক্ত ঝরছে তখন, জামাকাপড় ছেঁড়া। পুলিশ ডাকল কেউ। স্বামীকে ধরে ওরা থানায় নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সব খবর পেলাম আমি। আমার স্বামী কোনদিন হোটেলে কাজ করত না। ও মালপত্রের চোরা কারবার করত আর ছিল সাংঘাতিক জুয়াড়ি। আমার জমানো সব টাকা জুয়াতেই হেরেছে। তারপর আরও জুয়া খেলবার জন্য টাকার প্রয়োজনে মুখোশ খুলে আমার কাছে এসেছিল দালালের রূপ নিয়ে। আমার শরীর খাটিয়ে রোজগার করে সেটা দিয়ে ও ওর মদ-জুয়া বদমাইসির জীবনযাপন করতে চেয়েছিল। জানলাম, ও তার আগে একটি খুনের কেসে জেলও খেটেছিল। সম্প্রতি অন্য একটা মেয়েকেও রক্ষিতা রেখেছিল নাকি। তিল তিল করে গড়ে যাকে আমি দেবতার মতো মনের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম, জানলাম সে দেবতা নয়, শয়তান।

দেখলাম আমার আর পথ নেই। স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। কপর্দক হীনা আমি। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট সুটকেসটা গুছিয়ে আবার ফিরে এলাম আমি। মমার্তের মেয়ে ফিরে এলাম মমার্তে। পুরোনো নরকে।

আমাকে ফিরতে দেখে অন্য মেয়েরা অবাক।

ফিরে এলি যে?—সবার এক প্রশ্ন।

না, সত্য বললাম না। এত বড় নিষ্ঠুর সত্য বলা যায় না।

বললাম,—স্বামী হঠাৎ মারা গেল।

সবাই দুঃখিত হল। অনেক মেয়ে পরে আমার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে গল্প শুনতে চাইত। তাদের আমি বানিয়ে বলতাম। উপন্যাসের মতো অপূর্ব মধুর দাম্পত্য জীবনের গল্প বলতাম। আমার স্বামীর প্রেমের গল্প শুনে ওরা ঈর্ষায় জ্বলত। ভাবত ক্ষণস্থায়ী হলেও আমি বুঝি স্বর্গের স্বাদ পেয়েছিলাম। বানিয়ে বানিয়ে বলতে গিয়ে আমিও কিছুক্ষণ আমার সেই কল্পনার স্বর্গে ডুবে যেতাম। আমার সব ইচ্ছাগুলির স্বাদ আমি সেই গল্পেই পেতাম। কিন্তু ক্রমে তার আয়ুও ফুরোল! আমার সুখী অতীত সম্পর্কে অন্যদের উৎসাহ কমে গেল। ধীরে ধীরে আমার কল্পনার সুখবাসরেরও মৃত্যু হল।

তারপর? তারপর আবার পুরোনো জীবন। সাঁজালিজেঁতে হেঁটে বেড়াই। ছেলে ধরে হোটেলে গিয়ে রাত কাটাই। হৃদয়ের জগৎ থেকে আবার শরীরের জগতে ফিরে এসেছি।

সুকুমার নড়ে বসল। বলল,—এইমাত্র মেডেলিনে যার সঙ্গে দেখা হল সে নিশ্চয়ই তোমার স্বামী।

হ্যাঁ,— বলল মণিক,—এই হল জর্জ। শয়তানটার কি দুঃসাহস। এখনও বলে কিনা ফিরে যেতে! বাস্টার্ড।

সুকুমার বলল,—তুমি আর আমেরিকা যাওয়ার জন্য টাকা জমাচ্ছো না!

না,—বলল মণিক,—স্বপ্ন আর দেখি না। স্বর্গে আর লোভ নেই। আমি জানি আমি বেশ্যা, আমি একটা হৃদয়হীন যন্ত্র। আমাদের পৃথিবী আলাদা। সেখানে হৃদয় নিয়ে বিলাসিতা করা সাজে না। মৃত হৃদয় নিয়েই আমাদের জন্ম হয়। আমরা শুধু

জ্যান্ত একটা শরীর নিয়ে জন্মাই। এখন শুধু অপেক্ষায় আছি কবে এই শরীরের মৃত্যু হবে।

হতাশ হচ্ছো কেন, এখনও তো কোন ভালোবাসার লোক পেতে পারো তুমি? সবাই কি আর জর্জ?

হেসে উঠল মণিক। বলল,—হ্যাঁ সবাই জর্জ। সব পুরুষ মানুষই তাই। তুমিও। আমার কাহিনী শুনে বড়জোর তোমার করুণা হবে ভালোবাসতে ইচ্ছে হবে না। সমাজের কতগুলি পাওনা থাকে। সে পাওনা না দিলে সমাজের কাছে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না। আর শ্রদ্ধা না থাকলে প্রেমও থাকে না।

করুণা যদি পাও তাই বা মন্দ কি,—বলল সুকুমার,—সেটাও তো কিছু পাওনা।

না,—বলল মণিক,—করুণা যে পায় সে শুধু পায় যন্ত্রণা। করুণা যে করে সে অনেক কিছু পায়। পায় আত্মতৃপ্তি। কাউকে আমি আর কিছু দিতে চাই না। আত্মতৃপ্তির বিলাসিতা দেবার মতোও ঔদার্য নেই আমার।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সুকুমার। তারপর বলল,—আমি তোমার এই কাহিনী লিখব।

তুমি লেখক?—মণিক জানতে চাইল।

কখনো কখনো,—বলল সুকুমার।

হঠাৎ তীব্রকণ্ঠে বলল মণিক,—তুমি নিশ্চয়ই অন্য হাজারটা লেখকের মতো সাদা সাদা একগাদা মিথ্যে লিখবে? লিখবে আমি শেষ পর্যন্ত একজন মনের মানুষ পেয়ে গেলাম। তারপর পরম সুখে সন্তানসন্ততি নিয়ে ঘরসংসার করলাম। লিখবে তো এই সব?

না,—বলল সুকুমার,—সত্যটাই লিখব।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে ওরা। কারুর মুখে কোন শব্দ নেই।

তারপর হঠাৎ শান্তকণ্ঠে মণিক বলল,—জানো, ঈশ্বর আমাদের দুঃখীর সংখ্যাই বেশি রেখেছেন পৃথিবীতে। প্রমাণ চাও?

সুকুমার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মণিক বলল, পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। স্থল হল সুখীদের প্রতীক। আর জল হল আমাদের। দুঃখীদের চোখের জলেই এই সাগর, সাগরে যোজন-যোজন শুধু জল।—বলতে বলতে আবার জল টলমল করে উঠল ওর চোখে।

সুকুমার ভাবল মণিকের নিজের পৃথিবীর তিনভাগ নয়, চারভাগই জল। ওর পৃথিবী কান্নারই পৃথিবী।

চলো এবার ওঠা যাক,—মণিক চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল এক সময়। সুকুমার হাতে হাত দিয়ে অশ্রুকণ্ঠে বলল—চলো।

চিং ইয়া পট

দিল্‌ আর আরজুকে আলাদা করতে পারো তুমি? পারো না। তা পারলে তো তন্‌ আর জানকেও আলাদা করতে পারতে, ফুল আর খুসবুকেও আলাদা করতে পারতে। তেমনি আলাদা করতে পারো না হামাদ আর ইয়াকুবকে। হামাদ জাফরী ও মহম্মদ ইয়াকুব কুরেশী। দোস্ত ওরা। ইয়াকুব কোহিনূর মিলের ফোরম্যান আর হামাদ ব্লিচিং ডিপার্টমেণ্টের মজদুর। পদে ইয়াকুব উঁচু বটে তবে সে শুধু কারখানার চৌহদ্দিতে। কর্মজীবনের এই উঁচুনিচু ওদের বন্ধুত্বের মালভূমিতে এতটুকু চড়াই উৎরাই সৃষ্টি করতে পারে নি। দু'জনে থাকে মালাডের ঘাসওয়ালা চওলে। একই ট্রেন ধরে আসে কটন্‌ গ্রীনে কোহিনূর মিলে, একই দোকান থেকে বিড়ি কেনে, একই কাঠি দিয়ে ধরায়, আর ট্রেন লেট হলে প্যাটফর্ম থেকে মুখ বাড়িয়ে একই শ্লিপারের ওপর থুতু ফেলে একই গালি দেয় দু'জন। দু'জনের বন্ধুত্ব গভীর অথচ চরিত্রগতভাবে দুজনে দুই মেরুর বাসিন্দা। ইয়াকুব জুয়াড়ী, ইয়াকুব মহল্লার গুণ্ডামিতে সর্দার, আর হামাদ জুয়াড়ীয়ার বিরোধী, নম্রতায় ওকে মজদুর মনে হয় না, কবি মনে হয়।

সেদিন দু'জনে কারখানা থেকে ফিরছে। স্টেশন থেকে নেমে বিড়ি ধরিয়ে সস্তা একটা গান গাইতে গাইতে আসছিল ওরা। বস্তির মুখেই দেখতে পেল কলতলায় জল ভরছে একটি মেয়ে। ষোল সতেরো বছর বয়সের বেশি হবে না। ঘাগ্‌রা আর আঁটো চোলী পরা। রাস্তার বিদ্যুতালোকে মনে হচ্ছে যেন বেহেস্তের হুর বসে আছে কলতলায়।

হামাদ বলল,—বিসমিল্লা।

ইয়াকুব বলল,—এ পটাকা কাঁহাসে আগয়ী।

সল্‌মা শুনল বিশেষণটা। পটাকা শব্দটা ও নতুন শুনছে তা নয়। ওর অসামান্য রূপকে বর্ণনা করতে এ বিশেষণটি অনেক পুরুষমানুষই ব্যবহার করেছে। পটাকাই বটে ও। রাগ না করে সলজ্জ হাসি হাসল ও। আর তাকালো দুটি অন্ধকার হতভম্ব মূর্তির দিকে। আর হাসি দেখেই দুজনের হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে গেল। কলসীটা মাথায় নিয়ে নরম নিটোল নিতম্বে ঢেউ খেলিয়ে চলে গেল সল্‌মা। খালি কলতলায় আলোকচক্র এখন কেমন বিধবা হয়ে গেল, একবার গরগর করে ঢেকুর তুলে কলটাও নিঃশব্দ হয়ে গেল। শুধু শুকনো মাটিতে ফুটে রইল সল্‌মার ভেজা পদচিহ্ন। যেন ওদের বুকের রক্তে পা ভিজিয়ে চলে গেছে সল্‌মা, মাটির বুকে জমাট রক্তের ছাপ শুধু জেগে।

হামাদের ঘরে বসে ইয়াকুব বলল,—শালা হামাদ, লেড়কী থি কৌন? ইলেটিরিক্‌কা কারেণ্ট লাগতি থি।

মালুম নেই—বলল হামাদ,—কে যে মেয়েটি জানি না তবে কি যে ওকে বানাতে চাই তা জানি।

শালা দিলীপকুমারকা বাচ্চা,—হেঁকে উঠল ইয়াকুব,—কথা বলছে যেন ফিলিমের প্লেয়ার। কি বানাতে চাস শুনি?

নিশ্বাসের মতো আপন,—বলল হামাদ। বলেই নিশ্বাস টানল বুকে।

ধুত্তুরি। একটা সোমত্ত মেয়ে নিয়ে রসালো আলোচনা করা হবে তা না বেটা সচ্চা প্রেমিকের মতো কাৎরাতে শুরু করেছে। পকেট থেকে একটি সিকি বার করে বলল ইয়াকুব,—আ যা দেখে ইস্ লেড়কীকো কৌন মাশুকা বানায় তু ইয়া ম্যায়,—বলে সিকিটা আকাশে ছুঁড়ে বাঁ হাতের তালুতে লুফে নিয়ে ডান হাতের তালু দিয়ে ঢেকে বলল,—চিৎ ইয়া পট্? বোল চিৎ হয় তো মেয়েটা আমার মাশুকা হবে আর পট হয় তো তোর।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল হামাদের। জুয়াড়ী ইয়াকুবের এ হচ্ছে বাতিক। সব ব্যাপারেই ও জুয়া দিয়ে বিচার করবে। তাসের জুয়া না হলে নিদেনপক্ষে পয়সার হেড্ টেল করবেই করবে। চিৎ মানে হেড আর পট্ মানে টেল। যে কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে এটাই ওর চিরন্তন প্রক্রিয়া। কিন্তু হামাদের এ ভালো লাগল না।

রীতিমতো খারাপ লাগল। তাই বলল,—তোমার পয়সার চিৎ পট দিয়ে আর যাই হোক মোহব্বতের বিচার করতে যেও না। হো হো হো করে ফেটে পড়ল ইয়াকুব,—মোহব্বৎ? আঁখে চার হতে না হতেই বুঝি দিল্ বেকাবার। উল্লুকা পাঠ্ঠা, খুবসুরৎ লেড়কী দেখা ঔর সাথ সাথ মজনু। রূপসী মেয়ে দেখেই একেবারে মজনু বনে গেছিস।

উঠে পড়ল ইয়াকুব,—শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখ্ মোহব্বতের। এক রাতের জন্য হামাদ জাফরী না থেকে শাহেনশাহ সাজাহাঁ হয়ে যা।

চলে গেল ইয়াকুব। হামাদ ভাবল। ঐ মুখ। ঘুমের আগে চোখে ভেসে রইল কলতলার সেই মুখ, ঘুমের পরে আরও জীবন্ত হয়ে উঠল মুখটি। স্বপ্ন দেখল হামাদ। দেখল তার বুকের রক্তে পা ভিজিয়ে ঘাগরায় বন্দী এক স্তবক কোমলতার ঢেউ ক্রমে দূরে থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, দিগন্তের কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটি পেছন ফিরে একবার তাকালো, পাতলা ঠোঁটদুটিতে হাসি ফুটে উঠল ধীরে ধীরে। সেই হাসি, সে হাসি পূর্ণিমার রাতে লেগে থাকে চাঁদের ঠোঁটে আর কালবৈশাখী অমাবস্যা রাতে লেগে থাকে বিদ্যুতের ঠোঁটে। সেই হাসি, যে হাসি ইচ্ছে করলে জীবন দিতে পারে আবার ইচ্ছে করলে জীবন নিতেও পারে।

স্বপ্নের পরই ঘুম ভেঙে গেল হামাদের। ভোর হয় নি এখনো! তবু আলস্যের সুতোয় আর বেশি সুখমুহূর্তের ফুল না গেঁথে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল ও। ভাবল লাইনের দার ধরে খানিকটা পায়চারি করে আসে। দরজা খুলে ও এল ইয়াকুবের ঘরে। এ বেটাকেও একদিন সকালের সূর্যের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়ে দেওয়া যাক। কিন্তু ইয়াকুবের বিছানা খালি। যা ভেবেছে তাই। কোণের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। আর গলার আওয়াজগুলি থেকে বোঝা অসাধ্য নয় ওখানে জুয়ার আসর বসেছে।

যেখানে দীয়া সেখানেই যেমন পাওয়া যাবে পরওয়ানাকে তেমনি যেখানে জুয়া সেখানেই ইয়াকুব। আস্তে করে ঘরটার দরজায় টোকা মারল হামাদ। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল আলো আর সবগুলো কণ্ঠস্বর—কৌন?

হামাদ বুঝল ওরা ওকে পুলিসের লোক ভেবে ভয় পেয়েছে। ও বলল, —আমি হামাদ।

লাইট জ্বলল। শোনা গেল ইয়াকুবের গলা, আমার দোস্ত।

দরজা খুলে গেল। আর সামনে তাকিয়ে চমকে উঠল হামাদ। তার সামনে দাঁড়িয়ে তার স্বপ্ন। রাতজাগা ক্লান্ত চোখ, কাঁচুলী আর ঘাগরার মাঝখানে একফালি শ্বেতপাথরের মতো ধবধবে পেট আর চুলের জটায় অবহেলিত দু'পয়েন্ট প্লাগের মতো একটি বিমর্ষ

কাটা। সরে দাঁড়াল মেয়েটি। হামাদ ভেতরে এসে বসল ইয়াকুবের পাশে। বিড়ি সিগ্রেটের ধোঁয়ার আড়ালে লালচে বাল্‌বের নিচে দত্তুবা, ইয়াকুব, বাবাসাহেব সাঙ্গাপ্পা আর একজন দীর্ঘশ্মশ্রু ভদ্রলোক। অনুমান করল হামাদ এ হচ্ছে এ বাড়ির নতুন আগন্তুক মেয়েটির বাবা। সবাই হৈ হৈ করে উঠতেই চমকে দেখল হামাদ যথারীতি *ইয়াকুব সিকোয়েন্স মিলিয়ে তাস আগে ফেলেছে ও সবাই তাসের নম্বর গুণছে আর নিজেদের নসীবকে গালি দিচ্ছে।* ইয়াকুব বলল,—হাফিজভাই তোমার কত পয়েণ্ট।

আগন্তুক হাফিজ বিমর্ষ গলায় বলল—সত্তর।

বহোৎ আচ্ছা,—হাসিমুখে বলল ইয়াকুব,—লাও এক রূপাইয়া দো আনা।

হাফিজ পকেট খুঁজে একটা দশটাকার নোট বার করল—ভাঙানি আছে?

না। কারুর কাছ থেকেই ভাঙানি পেল না হাফিজ। তখন বুড়ো ডাকল—সল্‌মা বেটি, চট করে দশ টাকার ভাঙানি নিয়ে আয় তো বেনিয়ার কাছ থেকে।

আব্বাজান—অর্ধস্ফুট গলা শোনা গেল সল্‌মার,—ইসুবক্ত সায়েদ দু'কান খুলা নেহি—

চেঁচিয়ে উঠলো বুড়ো,—এখানে বসে বসে কি করে জানলি দোকান খোলে নি এখনো, কুঁড়ে কোথাকার যা, শিগ্‌গির।

ভীতবিহ্বল হরিণীর মতো ত্রস্তে সল্‌মা টাকা নিয়ে চলে গেল বাইরে। খেলা শুরু হল। শেষও হল। সল্‌মার দেখা নেই।

সল্‌মার বাবা চেঁচিয়ে উঠবার আগেই উঠে দাঁড়াল হামাদ। বলল,—আমি দেখছি।

বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকালো হামাদ। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল তারাদের সব স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। মাস্টারণী শুকতারা খাতাপত্তর গুছিয়ে বাড়ি যাবার জন্য যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। আর গলির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল বস্তির শেষ লাইট পোস্টের নিচে মাটি-ছুঁই ঘাগরা আর ঘাগরা-ছুঁই চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সল্‌মা। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় ভয় গলায় বলল সল্‌মা,—বাবা খুব রাগ করেছেন, না? কিন্তু কি করব, দোকান বন্ধ, কোত্থেকে ভাঙাই।

হামাদ বলল,—ফিরে গিয়ে একথাটা বললেই পারেন বাবাকে।

বাবাকে গিয়ে বলব টাকার ভাঙানি পেলাম না? বাবা তাহলে আস্ত রাখবেন আমাকে, বলবেন স্টেশন থেকে নিয়ে আয়। আমার বাবাকে তো আপনি চেনেন না।

হামাদ হাসল,—আপনার বাবাকে কেন, আপনাকেও তো আমি চিনি না। লজ্জা পেল সল্‌মা, বলল,— আমি সল্‌মা, বলল,—শেখ হাফিজুদ্দিনের মেয়ে।

চিনলাম। শেখ সাহেবের তো আপনি মেয়ে, আর কারুর কিছু নন তো?

সল্‌মা বলল,—মতলব?

হামাদ—যদি বুঝে থাকেন তবে অনেক কিছু, আর না বুঝে থাকলে কিছুই না।

সল্‌মা নিচের ঠোঁট কামড়াল,—আমি উল্টোপাল্টা কথা বুঝি না।

হামাদ বলল,—আমি উল্টোপাল্টা কথা বলি না।

এবার শেখ সাহেবের চিৎকার শোনা গেল,—সল্‌মা বেটি, কোথায় মরেছিস?

মুহূর্তে ভয়ার্ত হল সল্‌মার মুখ। দ্রুত পা চালাতেই খপ করে হাতটা ধরে ফেলল হামাদ—কোথায় যাচ্ছেন?

স্টেশনের দোকান থেকে ভাঙানি নিয়ে আসি, নইলে বাবা–

বাধা দিল হামাদ,—যেতে হবে না স্টেশনে, আমার কাছে আছে ভাঙানি। খুচরো টাকাগুলো হাতে নিয়ে নরম চোখে তাকালো সল্‌মা, বলল—ধন্যবাদ। তারপর হাসল। সুডৌল হাতটি এগিয়ে দিয়ে বলল,—দেখুন, কতজোর হাত চেপে ধরেছিলেন হাতে দাগ পড়ে গেছে।

হামাদ হাতের দিকে তাকালো না, চোখের দিকে তাকালো। বলল,—শুধু হাতেই?

সল্‌মা কালো চোখের মণিতে একটা সবুজ লজ্জা শিউরে উঠল। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে ও দৌড়ে চলে গেল সেখান থেকে। বুকভরে নিশ্বাস নিল হামাদ। যেন নিশ্বাসের সঙ্গে সল্‌মাকে ও বুকভরে টেনে নিল। তারপর তাকালো আকাশের দিকে। দেখল শুধু সল্‌মাই লজ্জা পেয়ে পালায় নি, শুকতারাটিও পালিয়েছে লজ্জা পেয়ে। আকাশের স্থল খালি। হামাদের বুকটা এবার টনটন করে উঠল। নতুন এক ব্যথার জন্ম হল সেখানে! যার নাম পেয়ার, প্রেম, যার নাম জিন্দগী, জীবন।

মেয়েদের মন অনেকটা সে জাতের ভীরু হওয়া যে একটা খোলা বইয়ের পাতা ওল্টানোর আপ্রাণ প্রয়াস করেও পারে না। পাতাটা অর্ধেকের বেশী উল্টে গিয়েও ফিরে আসে। তারপর যখন নতুন সাহস আর শক্তি সঞ্চয় করে আসে তখন এক দমকে অনেকগুলো পাতা উল্টে দেয়। সল্‌মারও তাই হল। ভালোবাসার ভীরু ইচ্ছে দুর্বল ছিল বলেই সে প্রথম প্রথম হামাদকে মনের পাতা উল্টে দেখাতে পারে নি, যখন প্রবল ইচ্ছের জোয়ার এল তখন ফর ফর করে মনের সবকটি পাতাই উল্টে দিল ওর সামনে। আর হামাদ অবাক হয়ে দেখল সব পাতাতেই শুধু একটা মুখ, হামাদের।

নাটকের এই অঙ্কে বিরোধ দেখা দিল। নাম ইয়াকুব। দাঁত পিষে একথাটাই শুধু ভাবল হামাদ এই দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, সবাই বেইমান। দোস্ত মুহূর্তে দুশমন হয়ে যেতে পারে। খবরটা সল্‌মাই জানাল। হাত মেহেদী করবার স্বপ্নে বিভোর সল্‌মার মুখের রঙ আজকাল মেহেদীই হয়ে থাকত। সেদিন চকসাদা মুখ নিয়ে সল্‌মা রেলওয়ে ওভারব্রিজের কালভার্টের ওপর বসে বলল,—মুঝে ডর লাগ রাহি হ্যায়, ভয় করছে আমার। হামাদ ওর মাথাটা টেনে নিল বুকে। বলল,—কেন?

সল্‌মার ঠোঁট কাঁপল। কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু বলল না। হামাদ আদর করে ওর কানের লতিতে একবার ঠোঁট ছোঁয়াল, তারপর মুখটা আরেকটু উঁচুতে তুলে বলল,—সল্‌মা আমি তোমাকে আমার সমস্ত মনটাই তুলে দিয়েছি, তুমি কিন্তু দাও নি।

মাথা তুলল সল্‌মা—দিই নি? আমার সমস্ত মন, মনের সমস্ত খুশীই তো তোমাকে দিয়েছি।

—খুশীই দিয়েছ, দুঃখটা দাও নি। সমস্ত মন দিতে হলে দুঃখটাকেও দিতে হয় সল্‌মা। লুকিয়ো না, বলো কেন আজ তোমার মুখ এমন সফেদ। কেন আজ তোমার কপালে অশান্তির ঘাম?

সল্‌মা বলল,—হামাদ, আমি জানি ইয়াকুব তোমার জিগরী দোস্ত্। হতভম্ব হামাদ বলল,—হ্যাঁ, তাতে কি?

সল্‌মা,—ওকে হারাতে রাজী আছ?

হামাদ—হেঁয়ালি করো না, বলো কি বলতে চাও।

সল্‌মা—আমাকে, নয় ইয়াকুবকে, একজনকে তোমাকে হারাতে হবে। কাকে ছাড়তে চাও বলো।

হামাদ কথা বলল না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সল্‌মা কাশল একবার,—বাবা ইয়াকুবের সঙ্গে আমাকে সাদীর কথা ভাবছেন। আর তোমার বন্ধুও রাজী হয়েছে।

না! চেঁচিয়ে উঠল হামাদ,—না এয়সা নেই হো সক্তা!

বলেই দু'হাত চেপে ধরল সল্‌মাকে। সল্‌মা হাত ছাড়িয়ে বলল,—শোন রাস্তা দুটো আছে। তুমি ইয়াকুবের সঙ্গে কথা বল, আর আমি কথা বলব বাবার সঙ্গে।

হামাদ ঘাড় নড়ল—ইয়াকুব বোধহয় ঠাট্টা করেছে। ও আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে পারে না—ইয়াকুব বেইমান হবে না এতটা।

সল্‌মা—মেয়েদের জন্য ছেলেরা সব কিছু করতে পারে। আমার খুব ভয় করছে তাই।

হামাদ—তোমার বাবার সঙ্গে আমি কথা বলি না কেন সল্‌মা।

সল্‌মা—না, বাবা তোমাকে অপমান করে দেবে হয়তো। বাবা ফোরম্যানের নিচে কারুর হাতে মেয়ে দেবেন না, দ্বিতীয়ত বাবা জুয়াড়ী ছাড়া কারুকে পছন্দ করবেন না। এ দু'কারণেই ইয়াকুবকে পছন্দ করেছেন। বাবার সঙ্গে আমি কথা বলব আর ইয়াকুবের সঙ্গে তুমি কথা বল।

হামাদ কলের পুতুলের মতো বলল—বেশ। সল্‌মা হঠাৎ উঠল,—এবার তবে যাই।

হামাদ বলল,—সল্‌মা তাহলে—

সল্‌মা বলল,—কাল এ সময়ে আসব।

হেঁটে চলে গেল ও। কোথাও বসে ওঠবার সময়কার মেয়েলী অভ্যাস পর্যন্ত ভুলে গেল আজ। ভুলে গেল ঘাগরাটা পেছনে পায়ের ফাঁকে আটকে থাকে বলে হাত দিয়ে টেনে শালীন হয়ে নিতে হয়। এর জন্যে অবিশ্যি দোষ দেওয়া যায় না সল্‌মাকে। শরীর সামলাবার কথা এখন মনে পড়ছে না ওর, মন সামলাতেই বেচারী বিব্রত।

ইয়াকুব বলল, হ্যাঁ। শুনে সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেল হামাদের। দোস্ত্‌ হয়ে এমন দুশমনী।

তুই তো জানিস আমি ওকে ভালোবাসি।

ইয়াকুব বলল,—জানি।

আর সল্‌মাও আমাকে ভালোবাসে।

তাও জানি।

দাঁত পিষল হামাদ—তুই ওকে ভালোবাসিস?

না।

তবু ওকে তুই চাস?

হ্যাঁ, আমি তো বিয়ে করতে চাই, ভালোবাসতে তো চাইনে।

হামাদ এবার পাথর। একটা আক্রোশ শিরায় শিরায় পাক দিতে লাগল।

কেন?—চিৎকার করে উঠল-কেন?

ইয়াকুব জবাব দিলে না, বিড়ি ধরাল। হামাদ দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে,—ইয়াকুব, আমি সত্যি ওকে ভালোবাসি। তুই আমার বন্ধু হয়ে এমন করিস না, তুই আমার মাঝখানে দাঁড়াস না।

ইয়াকুব বিড়িতে সুখটান দিল। ওর নির্লিপ্ত মুখ দেখে হামাদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—ইয়াকুব তোকে দরকার হলে খুন করতে পারি আমি।

ইয়াকুব বলল,—দরকার কি খুনখারাপী করে? তার চেয়ে—একটা টাকা পকেট থেকে বার করে আকাশে ছুঁড়ে লুফে নিয়ে বলল,—বল চিৎ ইয়া পট্‌? চিৎ হয় তো তোর পট্‌ হয় তো আমার।

আর সহ্য হল না হামাদের। সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারল ও ইয়াকুবের চোয়ালে। ছিটকে কোণে গিয়ে পড়ল ইয়াকুব। উঠে দাঁড়াল, হাত বুলোল চোয়ালে তারপর ঘরের কোণে গড়িয়ে যাওয়া রূপোর টাকাটা তুলে পকেটে রেখে বলল,—হামাদ, অন্য কেউ হলে আমি কোন কথায় কর্ণপাত করতাম না। কিন্তু তুই বন্ধু তাই সুযোগ দিচ্ছি। জুয়াতে যদি হারাতে পারিস আমাকে তাহলে একমাত্র সল্‌মাকে পেতে পারিস, আমার জবানের নড়চড় হবে না।—দরজার কাছে গিয়ে আবার চোয়ালে হাত বোলাল ইয়াকুব—ভবিষ্যতে ঘুষিটুষি মেরে আর চেষ্টা করিস না। কেননা হয়তো তোর ঘুষির ব্যথা

সারাতে সল্‌মাকেই শেক দিতে হবে।

নিকাল যাও,—চিৎকার করে উঠল হামাদ। চিৎকারটি শোনাল আর্তনাদের মতো।

হামাদ বুঝল এই দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। সবাই বেইমান। ইয়াকুব যে এমন করতে পারে এ স্বপ্নেরও অতীত। হামাদ এও বুঝল, ইয়াকুব কাটা কাটা কথা বলেছে বটে, কিন্তু সেইসব কাটা কথার মুখোশের নিচে একটা কাটা বুকও রয়েছে ওর, আর সে কাটার নামও সল্‌মা।

কি উপায় হবে বল তো? ভীত পাখির মতো করুণ দেখাচ্ছে সল্‌মাকে।

তোমার বাবাও না বললেন?

সরাসরি।

কোন কথাই বুঝতে চাইলেন না?

না। আমি বললাম—'বাবা আমার সুখটাই যদি বড়ো হয় তোমার কাছে তবে আমাকে এভাবে বিয়ে দিও না ইয়াকুবের সঙ্গে। আমার ভালো আমি বুঝি, হামাদের সঙ্গে বিয়ে হলেই আমি সুখী হব।'

হামাদ শুধোল,—বাবা কি বললেন?

প্রথমে তো আমার মুখের দিকে বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি কোনদিন নিজের বিয়ের আলোচনা বাবার সঙ্গে করতে পারব এ উনি ভাবতেও পারেন নি। পরে বললেন–না। কেঁদে বললাম,—বাবা, আমার বিয়েতে আমার মতামতের কোন দাম নেই? বললেন—কোন দাম নেই। বললেন,—রোগীর ভালোমন্দের জন্য রোগীর মতামতের কোন দাম থাকে না। ডাক্তারের মতামতই আসল। বললেন—আমি জানি কিসে তোর ভালো হবে আর তাই করছি আমি। ইয়াকুবের সঙ্গে বিয়ে হবে তোর।

হামাদ প্রায় কেঁদে ফেলল,—সল্‌মা। খোদা আমাদের সঙ্গে এমন শত্রুতা করছেন কেন?

সল্‌মা বলল,—তোমার এতদিনকার বন্ধু ইয়াকুব এমন শত্রুতা করতে পারে, খোদা পারবেন না। খোদাকে আগে তো কোনদিন ডাকি নি, এখন ডাকলে কি সাড়া দেবেন ভেবেছ?

হামাদ এবার পুরুষ হয়ে উঠল। দু'হাতে জাপটে ধরল ওকে বলল,—চল আমরা পালাই। পারবে পালাতে?

সল্‌মা আরো ঘন হয়ে এলো, বাবাকে ছেড়ে পালাব আমি?

এ ছাড়া যে অন্য কোন রাস্তা নেই,—হামাদের চোখে মুক্তির হাতছানি, অবিশ্যি আমাদের প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। এখনই ভেবে নাও ভালো করে যদি তুমি মনে করো ইয়াকুবকে বিয়ে করে তুমি খুশী হবে, ভালো থাকবে বাবার অবাধ্য হওয়া ঠিক নয় তাহলে—

মুখ চেপে ধরল সল্‌মা,—এভাবে আমাকে জ্বালিও না। তুমি তো সব জানো, কেন এভাবে কষ্ট দিচ্ছ। চল পালাই এ ছাড়া উপায় নেই।

হামাদ—তাহলে আজ রাতে ১১ টার সময়।

সল্‌মা—না। এক্ষুনি। অনেক কষ্টে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি এখন। বাবা বেরুতে দিতে চান না। ভয় হয় বাড়িতে ঢুকলে যদি বেরুতে না পারি।

হামাদ—এক্ষুনি যেতে চাইছ তুমি?

সল্‌মা উঠল—এক্ষুনি, এ মুহূর্তে।

পেছনে হাসির শব্দে দু'জনেই আতঙ্কিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ইয়াকুব দাঁড়িয়ে। বলল,—কি হামাদ ঠিক করতে পারছিস না এখন পালাবি না রাত্তিরে? পকেট থেকে

একটি দোয়ানি আকাশে ছুঁড়ে লুফে নিয়ে বলল,— বল চিৎ না পট্? চিৎ হয় তো এখন পালাবি, পট্ হয় তো রাত্তিরে।

আবার ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে যেতেই হাঁ হাঁ করে উঠল ইয়াকুব—না না, আবার ওসব ঝামেলা করিস না। বিশেষ করে ভাবী স্ত্রীর সামনে। হামাদ থামল। ইয়াকুব বলল,—সল্‌মা ঘরে যাও। বাবা খবর পেয়েছেন তুমি এখানে। বাবার তরফ থেকেই এসেছিলাম আমি। যাও, নয়তো লোক ডাকব। সল্‌মা হামাদের মুখের দিকে তাকালো একবার, তারপর নিঃশব্দে ফিরে গেল।

হামাদ—তুই সত্যি বিয়ে করছিস ওকে?

ইয়াকুব,—হ্যাঁ, কাল আমাদের মাগ্‌নির দিন। মহল্লাকে খাওয়ান হচ্ছে। সারারাত জুয়া হবে। পরশু কাজী আসবে বিয়ে দিতে। বিয়েতে থাকবি তো? সবচেয়ে প্রিয় দোস্ত্ তুই না থাকলে মন খারাপ লাগবে। হামাদ এবার বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর। ইয়াকুবও চুপ করে রইল না। পাড়ার গুণ্ডার সর্দার এবার বন্ধুর কাছেও গুণ্ডা হয়ে উঠল। মেরে মেরে হামাদকে লাইনের ধারে ফেলে চলে গেল হাঁপাতে হাঁপাতে। যাবার আগে এক মুখ থুতু ফেলে বলল,—সল্‌মাকে আমি হারাতে পারব না। মন তোকে দিয়েছে দিক, শরীর ও কাউকে দেয় নি। আমাকে ছাড়া কাউকে দেবে না, বেঁচে থাকতে দিতে দেব না। তাই বলছি ভালো চাস তো কেটে পড়, মহল্লায় ঢুকিস না। চলে গেল ইয়াকুব। জন্তুর ভাষায় কথা বলে জন্তুর মতোই চলে গেল দুলতে দুলতে। এতক্ষণে নগ্ন হল ইয়াকুবের হৃদয়। হামাদ বুঝল সে বন্ধু বা প্রেয়সী একজনকে হারাচ্ছে না, দু'জনকেই হারালো। আহত রক্তাক্ত শরীরটাকে টানতে টানতে খানিকটা এগোল হামাদ, তারপর জ্ঞান হারালো।

ভোর সাড়ে ছ'টায় ট্রেন চলে গেল ব্রিজ কাঁপিয়ে। চেতনা ফিরল হামাদের। জ্বর জ্বর লাগছে। সারা শরীরে ব্যথা। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ও। পাশের নয়ানজুলি থেকে জল নিয়ে মুখটুখ ধুলো। তারপর স্টেশনের দোকান থেকে চা খেয়ে ধীরে ধীরে ফিরে এলো কালভার্টের ওপরই। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। নির্দিষ্ট সময় কেটে গেল কিন্তু আজ সল্‌মা এলো না। তবে কি বাপ কড়া পাহারায় আটকে রেখেছে? তবে কি সত্যি সত্যি সল্‌মার বিয়ে হয়ে যাবে ইয়াকুবের সঙ্গে?

একটা দুটো করে অনেকগুলো ট্রেন চলে গেল ব্রিজ কাঁপিয়ে। তারপর একটা দুটো করে অনেকগুলো তারা উঠে এলো আকাশে। রাত এলো। অবসন্ন হামাদ অথর্ব সাপের মতো বসে রইল এই জায়গায়। দূরে সিগন্যালের রক্তচক্ষু অনেকবার সবুজ হল কিন্তু হামাদের অদৃষ্টের রক্তচক্ষু সিঁদুরেই রয়ে গেল। আজ বসবে সল্‌মার মাগ্‌নীর আসর। মহল্লা খাবে। জানবে সলমা বিবি হতে যাচ্ছে মহম্মদ ইয়াকুব কুরেশীর। তারপর জুয়া। লালচে বালবের নিচে তাস, পয়সা, চিৎকার। উল্লাসের উন্মত্ততা বা উন্মত্তদের উল্লাস।

আজ সল্‌মার বেহাত হবার ঘোষণা জারি হবে। আজ হামাদের প্রেমের মৃত্যু ঘোষণা করা হবে। না, কিছুতেই না। দু' চোখ দিয়ে হামাদ দেখতে পারবে না সল্‌মার বিয়ে। তার চেয়ে অনেক ভালো কালকেউটের মতো কালো ঠাণ্ডা এই রেললাইন। অনেক ভালো দৈত্যাকৃতি ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের চাকার করাত। লাইনে মাথা পাততে এগিয়ে যায় হামাদ। অদূরে সিগন্যালের রক্তগোলাপ আলো টিয়েরঙ হল। দূরে ট্রেনের হুইস্‌ল্ বাজল আমন্ত্রণের মতো।

হঠাৎ মাথার ভেতর একটি শিরা দপ্ করে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল একটি মেধাবী রক্তকণিকা,—মরতে যাচ্ছ কেন তুমি? শেষ চেষ্টাটা করে দেখ। মনে নেই ইয়াকুব বলেছিল—জুয়াতে হারাতে পারলে সল্‌মাকে পেতে পারিস। আমার জবানের নড়চড় হয় না। এক ঝটকায় লাইন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল হামাদ। তারপর হাঁটতে শুরু করল বস্তিমুখো।

ম্যায় অন্দর আ সক্তা হুঁ, ভেতরে আসতে পারি আমি? হল্লার আসর এক মুহূর্তে চুপ। উগ্রকণ্ঠে বলল শেখ হাফিজ—খবরদার যদি ভেতরে পা রাখিস খুন করে ফেলে আসব লাইনের ধারে। হামাদ চুপ। ইয়াকুব নড়ে বসল।

কি চাস তুই?

জুয়া খেলতে চাই,—বলল হামাদ।

জুয়া?

হ্যাঁ, মনে নেই জবানের কথা?

ও—অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ইয়াকুব,—সল্‌মার কিসমৎ বিচার করতে চাস জুয়া খেলে আমার সঙ্গে? এতদিনে রাস্তায় এসেছিস। বেশ খেলব জুয়া কিন্তু সব পয়সা নগদ, টাকাফাকা এনেছিস তো?

হামাদ পকেটে থেকে ওর জমানো দু'শ টাকা নামিয়ে রাখল।

অন্য পকেট থেকে ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন আর একটা সোনার চেন। চমকে উঠল সবাই। কিন্তু হাসল ইয়াকুব।

ভালো। রেলভাড়াটা সরিয়ে রাখ, নইলে যাবি কি করে এখান থেকে?

ঠাট্টায় কান দিল না, হামাদ, বলল,—যদি জিতি তবে তোমার জবান নড়বে না তো?

কঠিন হল ইয়াকুবের মুখ,—জুয়াতে ইয়াকুব কখনো কথার খেলাপ করে না।

হামাদ জাঁকিয়ে বসল। বলল,—আট আনা পয়েন্ট খেলব।

ইয়াকুব—আচ্ছা, খুব যে গরম, আট আনাই সই। দেখ দোস্ত্‌রা, আমি তোমাদের সামনে কবুল করছি আমি যদি হারি হামাদ তাহলে পাবে সল্‌মাকে আর ও হারলে আমি পাব।

আসরে হৈ চৈ উঠল। এমন মজাদার জুয়া কেউ কোনদিন দেখে নি। এ জুয়াতে বিচার হবে একটি মেয়ের ভাগ্য। কিন্তু হাফিজ চেঁচিয়ে উঠল,— নেই, এয়সা নেই হো সক্তা। ইয়াকুব শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল,—এয়সাই হোগা। ইয়াকুবের কঠিন চোখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো চুপ। ইয়াকুব তাসটা হাতে নিয়ে ফেটতে লাগল তারপর কি ভেবে উঠে পড়ল, ভেতরে ঢুকল। পরমুহূর্তে সল্‌মাকে হাত ধরে টেনে আনল ভিড়ে। সল্‌মা হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে পারল না। হামাদকে দেখে ও নিজেকে মুক্ত করার কথা ভুলে গেল। হামাদ বলে উঠল,—সল্‌মা, খোদা যদি সত্যি আমাদের দুঃখ বুঝে থাকেন তবে এ জুয়ায় আমি জিতব, তোমাকে পাব।

হাফিজ চেঁচিয়ে উঠল,—জবান বন্ধ রাখ।

বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল হামাদ,—শব্দ দিয়ে কথা না বললেও কথা বলা যায়, সে জবান কি করে বন্ধ করবেন?

ইয়াকুব—কাব্যি বন্ধ করে খেল। দেখি তোর মোহব্বতের কতটা জোর।

হাফিজ বলল,—ইয়াকুব, বেটাকে হারিয়ে জামা কাপড় খুলে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিবি। হুঁ, আমার মেয়েকে জুয়াতে জিতে নিতে এসেছে। দুঃসাহস কম নয়।

শুরু হল তাস।

খোদা আমার মোহব্বতকে বাঁচাও, বাঁচাও আমার ইজ্জতকে, জিতিয়ে দাও হামাদকে,—মনে মনে এ প্রার্থনাই শুধু গুনগুন করতে থাকল সল্‌মার মনে। জুয়াতে বিচার হচ্ছে ভাবতেও অপমানে জ্বালা ধরছে ওর বুকে, তা ছাড়া অন্য কোন পথ যখন নেই তখন খোদা ছাড়া আর কে সাহায্য করতে পারে। দুয়া করো আল্লা, খোদাতাল্লা, রহম করো।

কিন্তু না। প্রথম দু'দান জিতল হামাদ। ওরা চোখে চোখে তাকাল। যেন সল্‌মার চোখ থেকে আশা উদ্দীপনার মদ আকণ্ঠ পান করে নিল নিজের চোখ দিয়ে। কিন্তু সে

শুধু দু'দানই। তারপর শুরু হল হার। এক এক দান হারে আর হাফিজ আনন্দে চেঁচাতে থাকে। ইয়াকুব তাকায় সল্‌মার দিকে। সল্‌মা তাকায় হামাদের দিকে, আর হামাদ কোনদিকে না তাকিয়ে একমনে তাস ফেটতে থাকে।

আল্লা, হে খোদা, লাজ বাঁচাও,—থরথর বুক সল্‌মার, থরথর প্রার্থনা। কিন্তু খোদা তাসের জুয়ায় সাহায্য করল না হামাদকে। সাহায্য করবে কি, ইয়াকুবের সঙ্গে জুয়ায় খোদা নিজেও যদি বসত তাহলেও বোধ হয় সর্বস্ব হেরে ফিরে যেত! জুয়াতে ইয়াকুব শুধু কারিগর নয়, জাদুকর।

খেলা শেষ হল। সর্বস্ব হেরেছে হামাদ। শেষ দান হারতেই উঠে দাঁড়াল।

কি হামাদ, খেলে আশ মিটল?

হাফিজ গলাবাজি করল,—খেলে যা আরেক দান। কাপড় চোপড় জুতো বন্ধক রেখে খেল যদি মরদের বাচ্চা হোস। হুঁ সল্‌মাকে জিতে নেবে জুয়াতে। ইয়াকুবকে হারাতে এসেছে, আস্পর্ধা কম নয়।

ইয়াকুব সল্‌মার হাত ধরতে গেল,—আ যা সল্‌মা। এখন আর মন খারাপ করে লাভ নেই। ন্যায় বিচার হয়েছে। হামাদ নয়, আমিই পেয়েছি তোমাকে।

জোচ্চোর,—হামাদ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াকুবের উপর,—তাসের জোচ্চুরী করে জিতেছ তুমি। তোমাকে মেরে ফেলব আমি। ইয়াকুব নিজেকে সমলাবার আগেই বুড়ো হাফিজ দু'হাতে টুঁটি চেপে ধরল হামাদের—এত বড় সাহস? মারপিট করতে আসে। খুন করে ফেলব তোকে। চোখে সর্ষে ফুল দেখে হামাদ। তৎক্ষণাৎ 'আব্বাজান' বলে প্রচণ্ড চিৎকার করে বাবাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে টানতে লাগল সল্‌মা। চিৎকার করে বলে উঠল,—ওকে যদি খুন করো তবে তোমাকেও খুন করে ফেলব আমি। ছাড়ো ওকে, ছাড়ো।

ইয়াকুব উঠে দাঁড়ালো,—ছেড়ে দিন ওকে।

ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে ছেড়ে দিল হাফিজ। সল্‌মা হাঁপাচ্ছে। ওর ঘর্মাক্ত লাল মুখ, কম্পমান বুক আর জ্বলন্ত চোখের দিকে ইয়াকুব তাকালো একবার, তাকালো বিস্রস্তবেশ হামাদের মুখের দিকে। আসর চুপ।

ইয়াকুব বলল—জোচ্চুরী করেছি বলছিস?—এক সেকেণ্ড তাকালো হামাদের ঠোঁটের দিকে। যে ঠোঁটটা কেটে রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। বলল,—বেশ। ইয়াকুব কখনো জুয়াতে জোচ্চুরী করে না। তবু তোর মন যখন মানছে না তোকে শেষ চান্স দিচ্ছি। প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে ও কি খুঁজল, পেল না। হিপ পকেটে পেল। একটা টাকা। বলল,—চিৎ হয়ে তো তোর, আর পট্ আমার, রাজী আছিস?

হাফিজ বলল,—না না, আর চিৎ পট্ হবে না। একবার হক বিচার হয়ে গেছে।

ওদিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে হামাদের দিকে চোখ রেখেই বলল ইয়াকুব,—রাজী আছিস?

—হ্যাঁ।—হামাদ বলে নি, বলল সল্‌মা। আর সল্‌মার দিকে তাকিয়ে বলল হামাদ,—হ্যাঁ।

টাকাটা আকাশে ছুড়ে বাঁ হাতে লুফে নিয়ে ডান হাতে চাপা দিল ইয়াকুব। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়া মাথাগুলোর নিচে খুব আস্তে আস্তে হাতটা সরাতে লাগল। প্রচণ্ড উল্লাসে চিৎকার করে উঠল হামাদ,—চিৎ হয়েছে, চিৎ। আমি জিতেছি। সল্‌মা আমি জিতেছি। দু'হাতে সল্‌মাকে জড়িয়ে ধরল হামাদ। রাজ্য জয় না হোক, রাজকন্যা জয় তো বটে। বিরাট হট্টগোল শুরু হল আসরে। হাফিজের আপত্তি তার মধ্যে সব চেয়ে উঁচু। ইয়াকুব কঠিন কণ্ঠে বলল,—না হাফিজ মিঞা, মেয়েকে তোমার হামাদের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। আমার কথার নড়চড় হয় না। আর কেউ নড়চড় করার চেষ্টা করলে

তারও বিশেষ ভালো হয় না।—বেরিয়ে যাবার সময় বলল হামাদকে,—খোদা তোর মোহব্বতকেই জিতিয়ে দিল।

ছাড়ো ছাড়ো বেসরম, বেহায়া, তুম বহোৎ হো,—কিন্তু সল্‌মা আর কথা বলবে কি, ওর ঠোঁট দুটোর কি আর নড়বার জো আছে! হামাদ নিজের ঠোঁট দিয়ে চেপে রেখেছে না। যখন নিজেকে হামাদের উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করল সল্‌মা তখন ও নিঃশ্বাস নিতেই ব্যস্ত রইল খানিকক্ষণ। পরে বলল,—বাপরে, পেয়ার করা নয়তো যেন কুস্তি লড়ছে।

হামাদ বলল,—সল্‌মা, শেষ পর্যন্ত বুঝলে তো মোহব্বতকে কেউ রুখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত খোদা মুখ তুলে চেয়েছিলেন নইলে তোমাকে কি পেতাম?

সল্‌মা বলল,—সত্যি।—তারপর আরো ঘন হয়ে বলল,—জানো, যে আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছে তাকে আমি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছি।

কে সে? কি বলছ তুমি?

সেই টাকাটা। হৈ হট্টগোলের মধ্যে সেটা আমি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। সেই টাকাটা যেটা 'চিৎ' হয়ে আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে। সেটা লুকিয়ে রেখেছি আমি। ইচ্ছে আছে ওটাকে লকেট করে গলায় পরব আমি। গড়িয়ে দেবে তো?

নিশ্চয়ই, বলল হামাদ,—দেখি কোথায় সেই টাকাটা। একবার হাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কিসমত তো টাকাটাই গড়ল, দেখাবে একবার?

সল্‌মা বিছানা ছেড়ে নেমে কুলুঙ্গীর ওপর একটা হাঁড়ি থেকে নিয়ে এল টাকাটা। হাতে নিল হামাদ। পরম স্নেহে তাকালো টাকাটার দিকে। তারপরই যেত ভূত দেখে চমকে উঠল। সল্‌মাকে বলল,—দাঁড়াও এক্ষুনি আসছি আমি।

না, এখন যাবে না তুমি, কিছুতেই না।

বিড়ি নিয়ে আসছি আমি। এক্ষুনি।—দৌড়ে ও এলো ইয়াকুবের ঘরে। হাতের তেলোয় টাকাটা ঘামে ভিজে উঠেছে। উত্তেজনায় ওর হাত পা মাথা সব কাঁপছে। কড়া নাড়ল ঘরের। ঘর খালি। ইয়াকুব নেই। পাশের ঘর থেকে জানল আজ বিকেলে ইয়াকুব তার মালপত্র নিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

তবে কি সারাজীবন সে ধন্যবাদ জানাতে পারবে না ইয়াকুবকে? ইয়াকুবের এত বড় দোস্তীর বদলে মুখ ফুটে বলতে পারবে না শুক্রিয়াটুকু?

মুঠোটা খুলে আবার দেখল টাকাটা। উল্টে দেখল আরেকবার। টাকাটার দু'পিঠেই চিৎ। দু'পিঠেই রাজার মাথা। জুয়াড়ীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী নকল টাকা। মনে পড়ল ইয়াকুবের শেষ বারের এই প্রশ্ন—চিৎ হলে তোর, পট হলে আমার, রাজী আছিস? রাজী সে হয়েছিল। তখন সে জানত না যে টাকাটার কোনদিকেই পট নেই।

হামাদ বুঝল সল্‌মার ইজ্জত টাকাটা বাঁচায় নি, বাঁচিয়েছে ইয়াকুব। অস্ফুট স্বরে হামাদ বলল,—শুক্রিয়া, বহোৎ বহোৎ শুক্রিয়া ইয়াকুব। বলল,—মুঝে মাফ কর দে না দোস্ত। খালি ঘরটায় ভূতের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। যখন ফিরে গেল তখন কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে গেল। দুঃখে নয়, আনন্দে। টাকাটা সে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা এই নকল টাকাটাই যে আসল ইয়াকুব এ কথা সে কোনদিন ভুলবে না, কোনদিনই না।

।। দময়ন্তী কউর ।।

সুনন্দা, এ-চিঠি পেয়ে তুমি খুবই দুঃখিত হবে। কিন্তু উপায় নেই। আমাকে এ-চিঠি লিখতেই হবে।

আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে চাই। না, তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না। জানি, এ-লাইনটি পড়ে বিশ্বাস করতে পারবে না যে আমি একথা লিখেছি। কিন্তু তুমি বার বার পড়লেও, ম্যাজিকের মতো না-টা নস্যাৎ হয়ে যাবে না। সত্যি সত্যি, আমি সুকুমার ব্যানার্জি, তোমাকে, সুনন্দা চক্রবর্তীকে লিখছি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না। ভুল বুঝো না, তোমাকে আমি সত্যি ভালোবেসেছিলাম। অনেক স্বপ্ন রচনা করেছিলাম তোমাকে ঘিরে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, 'জাহাঁমে রাহাতে ঔর ভি হ্যায় বস্‌ল্ না রাহাৎ কি সিবা।' হ্যাঁ, ফুলশয্যার রাত ছাড়াও পৃথিবীতে আরও অনেক পথ আছে। স্বপ্নরজনীর পথ ছেড়ে আমাকে বাধ্য হয়েই অন্য পথের পথিক হতে হয়েছে। কেন অন্য নারী, অন্য প্রেম। প্রথমটুকু সত্যি, অন্য নারী। কিন্তু অন্য প্রেম! না, প্রেম নয়। অন্য কর্তব্য, অন্য শাস্তি বা বলতে পারো, অন্য প্রায়শ্চিত্ত। তোমাকে কিছু লুকোব না। সব খুলেই বলি।

তুমি আমার বন্ধু যোগেন্দর সিংকে জানো। আমরা যেমন জানি তেমন জানো না। যোগেন্দর ভারতের বড় বড় সব শহরের বারবনিতা-বিশেষজ্ঞ। ও ইচ্ছে করলে বারবধূদের ওপর থিসিস লিখে ডক্টরেট পেতে পারে। সুইডেনের কোন যৌনবিশ্ববিদ্যালয়ই অবশ্য সে-থিসিস শুধু গ্রহণ করতে পারে। যোগেন্দর বিবাহিত। দুটি সন্তানের জনক। অবশ্য তাতে ওর কামচর্চায় কোন বাধার সৃষ্টি করে নি। ওর মতে, বাড়িতে খেয়ে খেয়ে মুখ বদলাবার জন্য মাঝে মাঝে হোটেলে খাই, কিন্তু তাই বলে হোটেলকে কখনই বাড়ি বানাবো না। বলে, হৃদয় ওর সর্বদা ঘরেই থাকে শুধু শরীরের জানোয়ারটাকে মাঝে মাঝে খাঁচা ছাড়া করে বাইরে। ওর ফিলজফি ওর কাছে অকাট্য। ফলে শুধু ওকে ওপরে লম্পট ভাবি আর মনে মনে সবাই ঈর্ষা করি। এ হেন যোগেন্দরের সঙ্গে দিল্লী যাবার আগে হঠাৎ গেলর্ড রেস্তোরাঁয় দেখা হয়ে গেল। ও পিঠ চাপড়ে উচ্চকণ্ঠে বলল, ব্যানার্জি, এখনও সেই ছোকরীর সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছিস?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

যোগেন্দর বলল, ফলানক্র হয়ে গেছে তো?

মানে, আমাদের দৈহিক সম্পর্ক হয়ে গেছে কিনা। যোগেন্দরটা ঐ রকমই, নারী পুরুষের মধ্যে একটাই সম্পর্ক ও বোঝে, বাকি বোঝে না।

বললাম, ছিঃ? She is A nice Girl.

জবাবে ও যা বললো তার মানে, রাণী হোক বা কেরানী, মেয়ে-মানুষ তো। নাইস

মেয়েরাও নাকি বাথরুমে যায়।

বললাম, দেখো, ওভাবে কথা বলো না। আমরা আসছে নভেম্বরে বিয়ে করছি। আমরা হয়তো পিউরিটান কিন্তু আমাদের কাছে সেটাই সুন্দর।

যোগেন্দর বলল, স্যরি ইয়ার, মাপ কর্ না। কিন্তু বিয়ের আগে এক আধটু অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। তুই তো একেবারে ভার্জিন। বিয়ের আগে একটু শিখে নে, পরে না হয় মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট হয়ে যাস।

আমি চুপ থাকায় যোগেন্দরের উৎসাহ বেড়ে গেল।

এরপর বলল, দিল্লী যাচ্ছিস আমি দারুণ একটি মেয়ের ঠিকানা দিচ্ছি। দেখ, ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স বুঝেছি বাঙ্গালী বা মাদ্রাজী মেয়েদের কেমন বৌ-বৌ ভাব। তাদের শেখাতে হয়, পাঞ্জাবীরা এক-আধটু শেখাতে পারে। আর অ্যাংলোগুলো দুটো জিনিসই পারে, প্রচুর মদ খেয়ে বমি করতে আর খিস্তি করতে। তোর জন্য মাঝের ক্যাটাগরিই বেস্ট। এই নে, মেয়েটার নাম দময়ন্তী কউর। যেমন দেখতে ক্লাস, তেমনি তার কর্মকুশলতা। তোকে আদমী বানিয়ে দেবে। এই নে ফোন নাম্বার—ও পকেট থেকে কাগজ বার করে লিখে দিল, 'পিম্প'টার নাম বাবু। আমার নাম করে বলবি, আর বলবি দময়ন্তীকে পাঠাতে।

যোগেন্দর জোর করে নম্বারটা পকেটে গুঁজে দিল।

তারপর কফির কাফ তুলে চিয়ার্স করার ভঙ্গিতে বলল, হ্যাপি ল্যাডিং।

দিল্লীতে বেজায় গরম। আমার কাজ শেষ হয়ে গেল দুটোর মধ্যে। হোটেলে এসে ঠাণ্ডা শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে আমার যোগেন্দরের কথা মনে হল। কৌতুহলটা ক্রমে ক্রমে দানা থেকে দানবের রূপ নিতে শুরু করল। ক্ষতি কি, একটা অভিজ্ঞতা না হয় হয়ে যাবে। সাহস কম বলে দু'বার ফোন করতে গিয়ে করি নি। শেষ পর্যন্ত এক বোতল বিয়ার খেয়ে সাহসটাকে মাতাল করে তুললাম। এবার ফোন করলাম। বাবু বলল স্যার, রাত্তিরে আনতে পারি।

না, জবাব দিলাম আমি, এখুনি নিয়ে এসো। নেশার ওপর দোষটা চাপানো যাবে তাই বিয়ারে আরো বড় চুমুক দিয়ে বললাম, টাকা বেশি দেবো।

বাবু বলল, দু-শ' ওর রেট, আপনি কত দিতে পারেন?

হিন্দী ছবির খলনায়কের মতো বললাম, চার শ'।

বাবু শিকারের গন্ধ পেল। ও জানে আমি আনাড়ি, তাই বলল, পাঁচ শ' হলে চেষ্টা করতে পারি।

বললাম, তাই সই।

ভালো ছবি দেখতে যেমন হাউস ফুল থাকলে লোকে অদ্ভুত রাগে ডবল দামে ব্ল্যাকে টিকিট কাটে আমিও সেই মনোভাবে রাজী হয়ে গেলাম। এ যেন আমার পৌরুষের পরীক্ষা।

বেলা চারটেয় দময়ন্তী এলো। বাবু টাকা গুণে নিয়ে চলে গেল। যোগেন্দর ভুল বলে নি। মেয়েটি রূপসী। ফর্সা রঙ, দীর্ঘ মুখশ্রী বঙ্গদেশ ও বস্তিপ্রদেশে যৌবনের সার্কাস সুউচ্চ তাবু ফেলেছে, মসৃণ পেটে একটা দলছাড়া কালো তিল খালি আকাশে স্থিরনেত্র চিলের মতো স্থবির হয়ে আছে। আমি অভিনব এক অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম, নিষিদ্ধ কোন বই-এর মলাটের দিকে তাকিয়ে রইলাম যেন।

দময়ন্তীকে বললাম, ড্রিংক!

জবাব এল, নেহি। তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। সাড়ে চারটেয় আমাকে যেতেই হবে। নইলে বড় বিপদ হবে আমার।

প্রচণ্ড রাগ হল আমার। এ কিরকম বিষাদ-বিবর্ণ কণ্ঠ, নিষ্ঠুর নিরাসক্ত আচরণ। বললাম, দেখো ডবলের চাইতেও দাম বেশী দিয়েছি। সেটা কি শুধু আধঘণ্টা ফুর্তির

জন্য? মোটেই না, আমার যখন খুশি তোমাকে ছাড়বো। নইলে বাবুকে ফোন করে আমার টাকা ফেরত দাও। আর কেটে পড়।

দময়ন্তী বলল, বাবুজী প্লিজ আজ ছেড়ে দাও, কাল না হয় এসে তোমার টাকা শোধ দিয়ে যাবো।

না, বললাম আমি। নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে গেলাম।

দময়ন্তী বলল, আমার না গেলে বিপদ হবে বাবুজী। পায়ে পড়ি আপনার।

অসহায়ের ওপর নৃশংস হওয়ার গোপন ইচ্ছা সবারই থাকে সেই শিশুকাল থেকে। সেজন্যেই ছোটবেলায় আমরা কুকুরছানাকে জলে ফেলে দিই, বেড়ালের লেজে টিন বেঁধে দিই, টিকটিকির লেজ কেটে তার দাপাদাপি দেখতে ভালোবাসি। মুহূর্তে আমি সেই নিষ্ঠুরতার বিষ মত্ত হলাম। গর্জন করে উঠলাম, বিরক্ত করো না। একটা কথাও শুনতে চাই না। এত নাম তোমার, দেখি কি তোমার ভেল্কী।

দময়ন্তী ভীরু গরুর মতো আমার দিকে তাকালো একবার, তারপর উঠে ধীরে ধীরে জামা কাপড় সব খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এ কি? ঢকঢক করে আরও খানিকটা বিয়ার খেলাম আমি। না, তবুও, তবুও দময়ন্তীকে কেন জানি মনে হচ্ছে একটি নিস্প্রাণ নারীদেহ শুধু। নগ্ন নারী কি এই? এই কি আগুনের দৈহিক রূপ? নগ্ন নারী-শরীর যদি কান্নার রূপ দিতে পারে তবে এ হচ্ছে এক নির্বাক কান্নার যৌবন, না কি যৌবনের নির্বাক কান্না! বিনুনীর কয়েকটা কাঁটা কালো চুলের জঙ্গলে পথভ্রষ্ট, চোখের চাউনিতে লক্ষ রাতের বিষাদ, রসহীন কমলার কোয়ার মতো শ্বেতশুষ্ক ঠোঁট, ঘর্মাক্ত কণ্ঠে উচ্চরিত নীল শিরা, শীতল অজেয় পাহাড়ের নিস্প্রাণতায় মুহ্যমান দুটি স্তন যেন উদ্বেলিত শোকের মাংসল মৌন প্রতিবাদ, এমন কি জঙ্ঘার লজ্জা-কুন্তলগুলি যেন মৃত দূর্বার পুড়ে যাওয়া কৃষ্ণ কংকাল। এই কি অজন্তা ইলোরা কোনারকের নারী, এই কি রেনেসাঁ শিল্পীদের স্বপ্নকন্যা, এই কি আমার অপরিমেয় কৌতূহলের সফলতার ফসল? এ তো মিশরীয় কোন মমি, এ তো শবসাধনার কোন শীতল শবদেহ! গর্জায়মান কোন দূরাগত জেটের মতো হতাশা যেন আমার মনের আকাশকে শ্রুতিকটু ধ্বনির দৌরাত্ম্যে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে তুলল। না, হেরে গেলে চলবে না। কাপুরুষের মতো নিরস্ত্রকে বধ করেই আমাকে জয়ী হতে হবে। আমি এগিয়ে গেলাম।

দময়ন্তীকে যখন যেতে দিলাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে। স্বপ্ন ভঙ্গের নিরানন্দে তেতো মুখে বললাম আমি মোটেই খুশি হই নি। যোগেন্দর এত তারিফ করেছিল তোমার, সব বাজে কথা। তুমি ঠগ, জোচ্চোর। বোকা বানিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়েছ।

দময়ন্তী কাপড়-জামা ঠিকঠাক করে বলল, মাফ চাইছি বাবুজি আমার বড্ড কাজ এই সময়ে। অলরেডি দেরি হয়ে গেছে। সে বিপদের কথা শুনিয়ে তোমাকে লাভ নেই। তবে আমি কথা দিচ্ছি কাল যখন বলো আমি চলে আসবো। সকাল বলো বা রাত্তিরে, বিকেলটুকু বাদ দিয়ে। আর তোমাকে আমি ঠিক খুশি করব বাবুজী আর তার জন্যে এক পয়সাও নেবো না। বাবুকে কিছু বলো না, আমি নিজে থেকেই আসব।

বললাম, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তবু যদি একান্ত আসো, এগারোটায় এসো, কাল বিকেলের প্লেনে আমি ফিরে যাচ্ছি।

নিশ্চয়ই আসবো। নমস্তে,—বলে দময়ন্তী চলে গেল।

পরদিন। ভাবতেই পারি নি আমি, কিন্তু দময়ন্তী এলো। এলো ঠিক এগারোটায়। মুখটা যদিও করুণ কিন্তু পোশাকটা বেশি চটকদার। ব্লাউজটা খুবই লো-কাট, পেটের তিলটা তেমনি দুষ্টু চোখে তাকিয়েছিল।

বলল, ভাবছিলেন, আসবো না, তাই না! দেখুন ঠিক এসেছি। একটু ড্রিংক আছে, দিন।

বললাম, এত সকালে খাবে?

দময়ন্তী বললে, মোহব্বৎ ঔর পিনেকা কোই টাইম হোতা হ্যায়, ক্যায়া বাবুজী!

বলে একটু হেসে চট করে এসে আমার কোলে বসে পড়ল, বলল, আজ আপনাকে খুব খুশি করব আমি। নিন প্রথমে একটা চুমু দিন তো।

একি দময়ন্তীর রূপ! আজ যে সস্তা ভঙ্গীতে নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে ও।

বললাম, সোফায় বসো। এরকম করো না। বেশী নির্লজ্জতা ভালো নয়। বাজারের মেয়ে হলেও মেয়ে তো তুমি।

হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল দময়ন্তী। অবাক হয়ে গেলাম। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি পিঠে হাত রেখে বললাম, কেঁদো না। কাঁদছো কেন?

দময়ন্তী বলল, অনেকদিন কাঁদি নি। কাল, কাল যখন গিয়ে দেখলাম বাবা মোটর চাপা পড়ে হাসপাতালে গেছে তখনও কাঁদি নি। চোখের সামনে বাবা মরে গেল তখনও কাঁদি নি। শবদাহের সময়ও না। এখন, এতক্ষণ পর কান্না পেল। অনেক দিনের কান্না জমেছিল বাবুজী, আজ আমাকে একটু কাঁদতে দাও।

কাল, কাল তোমার বাবা মারা গেছেন এক্সিডেন্টে? প্রশ্ন করলাম। হ্যাঁ, পাঁচটার সময়। সেইজন্যেই বার বার সাড়ে চারটেয় বাড়ি যেতে চাইছিলাম আমি। যা ভয় করছিলাম তাই হয়েছে। আমি না থাকায় বাড়ি থেকে বাবা বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর—বলে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল ও।

ধীরে ধীরে সব কথা শোনাল দময়ন্তী। সে-কাহিনী যেমন মর্মান্তিক, তেমনি অসহনীয়! দময়ন্তীর ভাষাতেই শোনাই সে-কাহিনী।

দময়ন্তী বলল, আমার বাবা রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার। পাঞ্জাবের ছোট্ট শহর ফাগোয়ারাতে আমাদের আদি বাড়ি। আমার এক দাদা আর আমি, আমার দুজন মাত্র সন্তান। মা মারা গেছেন অনেকদিন। তারপরই বাবা আমাদের নিয়ে দিল্লী চলে এসেছেন। খুব কষ্টে সংসার চলত। দাদা, যার নাম কুলবন্ত কউর, মিলিটারী স্কুল দেরাদুনে পড়ত। পাস করেই আর্মিতে জয়েন করল। আমি স্কুল ফাইনাল দিতে পারি নি দু'বার অসুস্থ হয়েছিলাম। এবার দিয়েছি। বাবা দাদাকে খুব ভালোবাসেন। দাদা দেখতে ভালো, পড়াশোনায় ভালো ছিল, আর আর্মিতে লেফটেনেন্ট। আর্মিতে পোস্টেড্ হয়েছিল কখনও পুণা, কখনও হায়দ্রাবাদ, কখনো পাঠানকোট। মাসে মাসে টাকা পাঠাত। আমাদের মধ্যবিত্ত সংসার চলে যেতো। বাবার স্বপ্ন গ্রামে আমার মায়ের নামে একটা প্রাইমারী স্কুল করবেন। সেজন্য দাদার পাঠানো টাকা থেকে প্রায় অর্থেক রেখে দিতাম জমিয়ে।

বাবার ইচ্ছে হল দাদার এবার বিয়ে দেন। মেয়ে দেখতে শুরু করলেন। দাদাকে ছুটি নিয়ে আসতে বললেন মাসখানেকের জন্য। মেয়ে পছন্দও করে ফেললেন। ছবি পাঠালেন দাদাকে। দাদার পছন্দ হল। সগন দেওয়া হল মেয়েকে। হঠাৎ একদিন বাবা সুন্দর একটা স্কুটার কিনে আনলেন! বললেন, কুলবন্তকে লিখবি না। ও এলে সারপ্রাইজ দেবো। ইনস্টলমেন্টে কিনেছি। চুপি চুপি আগেই বুক করেছিলাম। মনে আছে, ওর স্কুটারের কি সখ? দেরাদুন থাকতেই বলতো। নিজের মাইনের বেশীই আমাদের পাঠায়, সুতরাং কিনতে পারছিল না। জমানো টাকা থেকে কিনলাম। সুন্দর হয়েছে, না?

বললাম, খুব সুন্দর।

বাবা শিশুর মতো হেসে উঠে বললেন, ওর ঘরে বিছানায় চাদর ঢাকা দিয়ে রাখবো। আগে বলব না। শুতে এলে দেখে কি খুশিই হবে, তাই না দুমু! বাবা আমাকে দুমু বলেই ডাকতেন।

বললাম, হ্যাঁ, বাবা।

দুজনে ধরাধরি করে দাদার বিছানায় শুইয়ে দিলাম স্কুটারটাকে তারপর ছোট বাচ্চাদের মতো চাদর ঢাকা দিলাম।

বাবা বললেন, বিয়েতে বন্তুকে এটাই আমার প্রেজেন্ট। বন্তু হলো দাদার নামের অপভ্রংশ, যা বলে বাবা ওকে ডাকতেন।

এরপর আমাদের দিন গোনা শুরু। হঠাৎ খবর এলো যুদ্ধ লেগে গেছে। দাদার ছুটি নাচক হয়ে গেল। বাবাকে ও আমাকে লিখল, ফ্রন্টে যাচ্ছে লড়তে। শুভকামনা চাই। শত্রু নিধনে যেন সে সফল হয়।

বাবা দিনরাত প্রার্থনা করতেন দাদার মঙ্গলের জন্য। বিয়ের প্রস্তুতিও শুরু করলেন। শুধু তারিখটা মাস-তিন পিছিয়ে দিলেন। যুদ্ধে আমাদের নানা জয়লাভের খবর আসতে লাগল।

তারপর একদিন সিজ-ফায়ার। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

সাত দিন বাদে একটা চিঠি এলো। পড়ে হাত কাঁপতে লাগল আমার। যশোরের কাছে যুদ্ধে আমার দাদা কুলবন্ত কাউর মারা গেছে। বাবা তখন বাইরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ বাবার আসার আওয়াজ শুনলাম। চেঁচাতে চেঁচাতে আসছেন, আরে দুমু রাস্তায় শেঠ রামপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওর ছেলে পতঞ্জল তো দুন স্কুলে একসঙ্গে পড়ত বন্তর সঙ্গে। ও তো এখন ক্যাপটেন। চিঠি এসেছে পতঞ্জলের, ও আসছে, আসছে বুধবার। তা বন্তর কোন চিঠি আসে নি?

আমি চিঠিটা লুকিয়েছিলাম, কিন্তু লেফাফাটা ভুলে গেছি। বাবার চোখে পড়ল।

ঐ তো, চিঠি এসেছে। বাবাকে সারপ্রাইজ দিতে চাস। কি লিখেছে বন্ত? আমার চোখটা ক্রমে খারাপ হয়েছে রে। চশমা বদলাতে হবে। তুই পড়।

না, বাবাকে এ-খবর দেয়া যাবে না। চোখে আজকাল বডড কম দেখেন, সুতরাং মিথ্যে বললে ধরা পড়ব না। তাই করলাম। খয়েরী রঙের চিঠিটা নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে পড়ে গেলাম, বাবুজী, আমি ভালো আছি, যুদ্ধে আমি খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছি। আমরা জিতেছি। লড়াই-এর অনেক গল্প করব তোমার কাছে। আগামী বুধবার দিল্লী পৌঁছুবো। ট্রেনে আসছি ক্যালকাটা থেকে। দেখা হলে কথা হবে। তোমাকে ও দুমুকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। প্রণাম নিও। দুমুকে ব্লেসিং পাঠাচ্ছি। ইতি,

তোমার ছেলে বন্ত

বাবা আনন্দে পাগল হয়ে গেলেন। আমি চোখের জল দমন করতে পারছিলাম না। বাবা বন্তর ঘর সাজানো নিয়ে ব্যস্ত। সেদিন যা-যা রান্না হবে আমাকে বলে দিলেন। দাদা কপির পরোটা, শাকমাংস, কাবুলীচানা খুব পছন্দ করে। বাবা আমাকে সে-সব রান্না করে রাখতে বললেন। সে কি অসীম উৎসাহ। চোখ ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। বললাম, বাবা, ডাক্তারকে চোখটা দেখিয়ে নাও। না হলে অন্ধ হয়ে যাবে।

বাবা বললেন, যা যা—চোখ দেখাবো! আমার চোখ তো আমার ছেলে। সে যখন আসছে তখন আবার আমার চোখের কি দরকার রে! ঐ রকম ছেলে যার সে কি কোনদিন অন্ধ হতে পারে বেটী?

অনেক কষ্টে চোখের জল লুকোলাম। তারপর সেই বুধবার এসে গেল। বাবা জোর করে আমাকে দাদার সব প্রিয় ডিশ রান্না করালেন। চেখে দেখলেনও নুন-টুন ঠিক আছে কিনা। তারপর ক্যালকাটার ট্রেন আসার এক ঘণ্টা আগে থেকে আমার পেছনে লাগলেন স্টেশনে যাবার জন্য। স্টেশনে গেলাম। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। বুক ধুকপুক করছে। এবার কি করব আমি? এ মিথ্যেকে কতক্ষণ আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে!

সগর্জনে ক্যালকাটা মেল ইন করল।

বাবা পাগলের মতো এক কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পতঞ্জলের সঙ্গে।

আমি ইশারা করে কিছু বোঝাতে পারলাম না।

পতঞ্জল বলে উঠল, পায়ে পন্নি বাবুজী, আপনি এখানে?

বাবা বললেন, বন্ত আসছে যে। তোমার সঙ্গে আসে নি?

পতঞ্জল বলল, বন্ত! সে কি, খবর পান নি আপনি?

কি খবর? বাবা প্রশ্ন করলেন।

বন্ত, বন্ত যশোর সেকটারে হেভি ফায়ারিং-এর মধ্যে এগিয়ে পাক আর্মির একটা বাংকার দখল করেছিল। কিন্তু একটা মেশিনগান পাক অফিসারের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার সময় ফেটালি উণ্ডেড হয়। বন্ত হাসপাতালে আসার আগেই—

না, চিৎকার করে উঠলেন বাবা, কখনো না। পতঞ্জল তুম ঝুট বলতে হো। ঝুট্। এই তো চিঠি এসেছে বন্তর। চার দিন আগেই পেয়েছি। দমু, দেখিয়ে দে চিঠিটা, দেখা!

পতঞ্জল সেই উদ্‌ভ্রান্ত লোকটাকে জড়িয়ে ধরল, বাবুজী।

কিন্তু বাবা ততক্ষণ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

বাড়ি নিয়ে এলাম। রাত্তিরে বাবার জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু সে কি জ্ঞান?

বাবা সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল তাঁর মস্তিষ্কবিকার। ডাক্তার দেখিয়েছি অনেক। ফল পাই নি।

সারাদিন চুপচাপ থাকেন। বিকেল হলে চেঁচামেচি শুরু। দমু, চল স্টেশনে যেতে হবে। চল চল। বন্ত আসার সময় হয়ে গেল। রান্না করেছিস গবিকা পরোটা, সাগমিট, চানা কি ডাল?

মিথ্যে বলার উপায় নেই। কখনো চাখতে চান। তাই রোজ ঐ রান্না করতে হয় আমাকে। বাবাকে জুতো মোজা পোশাক পরিয়ে দিতে হয়। তারপর ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয় দিল্লী স্টেশন। ট্রেন চলে যায়। বলেন, ভালো করে প্রত্যেক কম্পার্টমেন্ট দেখ বন্ত এসেছে কি না। একটু দূরে আমি চুপচাপ কান্না চেপে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর বলি, না, দাদা আসে নি।

বাবা হতাশ হন না, বলেন ঠিক আছে। কাল ঠিক আসবে। মিলিটারী নোকরী, এক আধ দিন এদিক-ওদিক হয়ই।

হাত ধরে ধরে বাড়ি নিয়ে আসি। জুতো মোজা খুলে দিই। নিজের হাতে খাইয়ে দিই। তারপর শিশুর মতো বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

এই তাঁর রোজকার রুটীন। দাদা মারা গেছেন একথা বাবা বিশ্বাস করেন না। তাই রোজ আমাকে দাদার জন্যে রান্না করতে হচ্ছে। আর রোজ পাঁচটায় দিল্লী স্টেশনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে সেই একই কথা। বন্ত কাল ঠিক আসবে।

এদিকে দিন চলে না আর। বাবা মাঝে মাঝে দাদার বিছানায় গিয়ে স্কুটারটায় হাত বোলান। সেজন্যে ওটাকেও ফেরত দেয়া সম্ভব ছিল না। স্কুটারের ইনস্টলমেন্টের টাকা, সংসার খরচ কি করে চালাবো? শেষ পর্যন্ত মেয়েদের কাছে যেটা সবচেয়ে সহজ পথ সেটাকেই আমি বেছে নিয়েছি।—বেশ্যাবৃত্তি।

কলেজে যাওয়ার নাম করে বেরোই, ব্যবসা করি। শরীর বেচি, শরীরের নানা কসরৎ বেচি গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার জন্য। সে টাকায় সংসার চালাই। আর রোজ কপির পরোটা, সাগমাংস আর চানা রান্না করি। রোজ পাঁচটায় অন্ধ বাবাকে নিয়ে দিল্লী স্টেশনে যাই।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দময়ন্তী, আমিও একটা কথা বলতে পারছিলাম না। দময়ন্তীই মুখ খুলল আবার, বাবুজী, সেজন্য কাল আপনাকে খুশি করতে পারি নি। বাবুকে বলেছি বিকেলের দিকে যেন কোন লোক না ধরে। কিন্তু আপনি অনেক টাকা

দিয়ে নাকি আমাকেই চাইছিলেন। তা এসেছিলাম। একেবারে বেশী টাকা পেলে শরীরটা এক-আধটু রেহাই পায়, তাই এসেছিলাম। কিন্তু বার বার বাবার কথা মনে হচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল। পাঁচটার সময় যথারীতি ব্যস্ত হয়ে উনি কিছু না করে বসেন। এখান থেকে কাল তাই ট্যাক্সি নিয়ে গিয়েছিলাম। তবু বাবুজী, দেরি হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ আমাকে ডেকে ডেকে না পেয়ে নাকি একাই স্টেশনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অন্ধ মানুষ। মোটর চাপা পড়লেন। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই শেষ হয়ে গেলেন। বাবুজী, এখন আমি মুক্ত। আর আপনাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য তাড়া দেবো না। ভাই আগেই গেছেন, বাবাও গেলেন। এখন তো আমার অফুরন্ত সময়। বাবুজী, আমি ঠগ নই। দময়ন্তীর এত নাম শুনে এসেছিলেন, দময়ন্তী আপনাকে হতাশ করবে না। ভাবতে পারেন, এমন মেয়ের আত্মহত্যা করা উচিত। কিন্তু বাবুজী, এখনও কি আমি বেঁচে আছি!

আমার তখন সারা শরীরে জ্বালা। নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধী মনে হতে লাগল। এ আমি কি করেছি? ওর ভাই দেশের শত্রুর হাতে মারা গেছেন, আর ওর বাবা? কে মেরেছে ওর বাবাকে? আমি? সুকুমার ব্যানার্জি। দেশের শত্রুর চাইতেও বড় শত্রু আমি। আমি মানবতার শত্রু, সভ্যতার শত্রু সুস্থতার শত্রু। আমি মূর্তিমান শয়তান। নিজেকে পৃথিবীর ঘৃণ্যতম জীব মনে হতে লাগল। সুনন্দা, এতবড় পাপের বোঝা নিয়ে কোনদিন আমি তোমাকে সুখী করতে পারতাম না। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া পথ নেই, শাস্তি আমাকে পেতেই হবে।

দময়ন্তীকে বললাম, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমাকে বিয়ে করব দময়ন্তী। আমাকে গ্রহণ করে আমাকে পাপমুক্ত করো তুমি। ভালোবাসা? তা হয়তো বাসি না, তবে একদিন নিশ্চয়ই বাসবো। চেষ্টা করব, একদিন হয়তো যে-হৃদয় জন্তুর নখরে রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে সেখানে প্রেমের গোলাপ রক্ত হয়ে ফুটবে। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও তুমি।

দময়ন্তী কেঁদে বলল, বাঙ্গালীরা বডড যয্বাতী (মানে সেন্টিমেন্টাল) হয়। তুমি আমার কাহিনী শুনে এতবড় ভুল করো না। জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না।

বললাম, দময়ন্তী আমাকে মুক্ত করো, আমাকে গ্রহণ করো। আমাকে রক্ষা করো।

দু'চোখ জল নিয়ে অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে ও তাকিয়েছিল।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ধীরে ধীরে ও হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বিশ্বাস করো সুনন্দা, বেশ্যা দময়ন্তীর সেই এক আলিঙ্গনেই আমি পবিত্র হয়ে গেলাম।

দময়ন্তী কাউরের সে-আলিঙ্গনের নামই আমার কাছে হয়ে উঠল গঙ্গা। ওর চোখের জলে আমার কাঁধ ভিজে গেল। ওর অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটায় আমি দেখলাম ক্ষমাসুন্দর এক নারীর আত্মসমর্পণের মুক্তাঞ্জলি।

সুনন্দা, কাল আমি ও দময়ন্তী বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হচ্ছি! তুমি আমাকে ভুলে যেও। নতুন জীবন শুরু করো। ক্ষমা করতে না পারলে করো না! দময়ন্তী ক্ষমা না করলে সে অন্যায়ের বোঝা বইতে পারতাম না। আর তুমি ক্ষমা না করলে সে বোঝা বইতে পারবো। দময়ন্তীর বাবাকে হত্যার রক্ত লেগে আছে আমার হাতে, সে-দাগ মুছে ফেলতে অনেক, অনেক সিদুঁর ঢালতে হবে দময়ন্তীর সিঁথিতে। তোমার কাছে না হয় হৃদয়ভাঙার অপরাধ নিয়ে চিরকাল দোষী থেকে যাব। ইতি

সুকুমার ব্যানার্জি।

।। জনৈক বিশ্বাসঘাতকের পত্র ।।

পূরবী,

আমাদের আবার দেখা হবে এ আমার কল্পনার অতীত ছিল। ভাবতে পারি নি আমার ছেলে দত্তক দেবার জন্য সহৃদয় পরিবার চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জবাবে তুমি আর তোমার স্বামী আসবে। কি আশ্চর্য যোগাযোগ! আমি তোমাকে চিনেছি, তুমিও চিনেছ। চিনেছ বলেই তোমার কোমল মুখের সেই পুরনো রেখাগুলো কঠিন হয়ে গেল, তোমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। আর নাকটা সংকুচিত হয়ে উঠল। তুমি অনেক বদলেছ কিন্তু তোমার রাগ বদলায় নি পূরবী। তোমার রক্তে কখন পাগলা ঘণ্টা বাজে তা আমার জানা ছিল। তাই এক পলকেই বুঝলাম তুমি অসহ্য রাগে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছো। আমাকে চিনতে পেরেছো এমন কোন ভাব দেখালে না, স্বামীর হাতটা টেনে বললে,—চলো। তোমার স্বামী বলল—হোয়াই ডারলিং দিস চাইল্ড সিম্‌স টু বি এ নাইস্ বয়। তুমি বললে,—না। লেট্‌স গো। তোমার স্বামীকে একটু বিব্রত মনে হয়েছিল, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে তোমার অনুসরণ করল। তুমি আমার দিকে আর তাকালেও না। জানলা দিয়ে দেখলাম গাড়িতে চালকের আসনে বসলে তুমি। স্টার্ট দিলে। তোমার অন্তরাত্মার মতো গর্জন করে উঠল যন্ত্রটা, সোচ্চার ঘৃণার কয়েকটা হর্ন বাজিয়ে তুমি চলে গেলে, পেছনে রেখে গেলে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ধিক্কারের ছি ছি'র মতো কালো।

বুঝলাম। আমার ছেলেকে তুমি নেবে না। কেন নেবে? তোমার কাছে আমি তো একজন বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকের রক্ত যার শরীরে তাকে কেন নেবে তুমি?

কিন্তু পূরবী, আমি চাই আমার ছেলেকে তুমি নাও। তাকে তুমি মানুষ করে তোল। ঈশ্বর তোমাকে সন্তান দেন নি, আমায় দিয়েছেন। ঈশ্বরের রসিকতা সব সময়ই চরম হয়। নইলে বলো তোমার মতো সুখ ঐশ্বর্যের সংসারে সন্তান না দিয়ে আমার মতো, দুঃখ-দুর্দশার ঘরে সন্তান দিলেন কেন? একে মানুষ করার ক্ষমতা আমার নেই। হয়তো কোন অনাথ আশ্রমে দিতাম কিন্তু তাতে তার ভবিষ্যৎ কি হবে তা তো জানবো না। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যদি কোন সহৃদয় সন্তানহীন ধনী পরিবার ওকে গ্রহণ করে। জবাব অল্পসংখ্যক পেয়েছিলাম। তাতে তোমার স্বামীর চিঠিটা কেন জানি ভালো লাগল। তারপর দেখা হয়ে গেল। দেখে তুমি সুখী হও নি। আমি কিন্তু হয়েছিলাম। তুমি সন্তানহীনা এ দুঃখটা ছাপিয়ে আমার মনে একটু স্বার্থগন্ধী সুখ জেগে উঠেছিল। তুমি যদি খোকাকে নাও এর চেয়ে আনন্দের কি হতে পারে! তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে মরতে পারি আমি। ভেবেছিলাম এ ঈশ্বরেরই যোগসাজন। আমার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যই তোমাকে পাঠিয়েছিলাম।

কিন্তু তোমার আচরণ দেখে বুঝলাম এ আমার আকাশকুসুম স্বপ্ন। তুমি আমাকে ক্ষমা করো নি। বিশ্বাসঘাতককে তুমি দয়া করতে চাও না, বিশ্বাসঘাতকের ছেলেকেও না।

সেইজন্যেই এ চিঠি। পরে যদি ইচ্ছে হয় খোকাকে নিয়ে যেও।

না পূরবী, কিছুই ভুলি নি। মিথ্যে বলব না, ভুলতে চাইও নি। তোমাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবাসতাম। তুমি আমার জীবনের প্রথম প্রেম! অস্বীকার করে লাভ নেই প্রথম ও শেষ প্রেম দুইই তুমি। ইংরেজীতে কাপ লাভ বা পাপি লাভ বলে কথাটা চলে অল্পবয়সের অপরিণত প্রেমকে বোঝবার জন্য, ঠাট্টা করে। কিন্তু অপরিণত বয়সের প্রেমের যে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দামতা সেটাই তো আসল প্রেম। প্রেমে পড়ে যদি কাজ না ভুলে যাই, যদি রাত্তিরে ঘুমোতে না পারি, যদি অকারণে খুশী আর অকারণে দুঃখিত না হই তবে কিসের প্রেম! হিসেব মতো সময় ভাগ করে প্রেম করা আর পড়া করার তফাত কি? যে ভালো ড্রাইভার, ট্র্যাফিক আইন মেনে বিশ মাইল স্পিডে সে গাড়ি চালায়। গন্তব্যস্থানে পৌঁছুনটাই বড় কথা তার কাছে। তাতে কি আনন্দ? কিন্তু যে নতুন ড্রাইভার সে বেপরোয়া গাড়ি চালায়, কেননা গন্তব্যস্থানে পৌঁছুনটাই তার কাছে বড় কথা নয়, গাড়ি চালানোটাই তার কাছে বড় কথা। ভাটার সময় দেখে সমুদ্রে যে নামে সে শুধু বাঁচতে চায়, আর যে জোয়ারের ঝড়ের সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ে সে সত্যিকারের বাঁচতে জানে। ভালবাসা এক অঞ্জলি জল নয়, ভালবাসা হল অসীম আকাশের মতো বিস্তৃত, অধীর কালবৈশাখীর মতো উচ্ছৃঙ্খল, অতল সাগরের মতো গভীর।

আমাদের ভালবাসা ছিল এই অকল্পনীয় প্রেম। মনে পড়ে মানিকগঞ্জের সেই দুরন্ত দিনগুলি!

একদিনের কথা মনে আছে। অলস দুপুর। বই খুলে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। সামনে পুকুর ঘাটে মেয়েদের জটলা। হঠাৎ তুমি এলে। বললে,—নসুদা, এই হারটা রাখো তো, স্নান করে যাবার সময় নিয়ে যাব। হারটা নিলাম তুমি নাইতে গেলে। গলা ডুবিয়ে চুল ঝাড়লে, শরীর ঘষলে। দু'চোখ ভরে শুধু তোমাকে দেখছিলাম।

চোখ ভরে দেখার মতোই কূলভরা যৌবনে সেদিন তুমি মহিমাময়ী। তুমি জানতে আমি দেখছি। দেখাবার জন্যই হার রেখে যাওয়া। তোমার হারের চালে আমাকে হারতেই হয়েছিল। স্নান সেরে তুমি গামছাটা বুকে চাপিয়ে উঠে এলে। সারা শরীরে ভেজা শাড়ির হৃদ্যতা। আমার বয়সের রক্ত তখন আমাকে অশালীন উষ্ণতায় উত্যক্ত করে তুলেছে। তুমি এলে। জানালার শিকের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে,—নসুদা হারটা দাও। আমি তাকালাম। দেখলাম। নাকের ডগায় এক ফোঁটা জল, চোখের পাপড়ি ভেজা, কানের লতিতে জলবিন্দু মুক্তোর মত জ্বলছে। আর লাল চেক কাটা গামছায় বুকটাকে মনে হচ্ছে চিতাবাঘের শরীর। জীবন্ত চিতাবাঘ। তুমি বললে,—নসুদা, দাও হারটা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম,—ভেতরে এসো। না, বললাম না, বলব ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম হাতটা ধরে টেনে আনব। ভেবেছিলাম অন্তত কানের লতির মুক্তোর মতো জলটুকুকে আঙুলের টোকায় ঝরিয়ে দেব। কিন্তু বলে বসলাম,—হারটা আমি পরিয়ে দিই?

তুমি হাসলে, বললে, ইস্ কি সখ, হার পরাবে? অসভ্যতা করো না। দাও হার।

দিয়ে দিলাম। সম্রাজ্ঞীর মতো চলে গেলে তুমি। আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম বারান্দায় তোমার ভেজা পদচিহ্নের দিকে। মনে হচ্ছিল যেন লক্ষ্মীর আলপনা এঁকে গেল কেউ। সেই লক্ষ্মীর আলপনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্মীছাড়া বয়ঃসন্ধির প্রেরণায় নিজেকে মনে হচ্ছিল দুরন্ত এক প্রেমিক। আমার সেই দুরন্ত প্রেম এখনো স্পষ্ট মনে আছে।

আরেকদিনের ঘটনা। কোলকাতা থেকে রাঙাবৌদি এসেছিলেন—সঙ্গে তার বেথুন-পড়ুয়া বোন। জিজ্ঞেস করেছিলাম,—রাঙাবৌদি তোমার বোনের নাম কি ?

রাঙাবৌদি রাঙা রসিকতা করে বললেন,—তুমি চাও তো কামরাঙা ডাকতে পারো। আমি লজ্জায় লাল হলাম। মেয়েটি আমার মফঃস্বলি লজ্জাকে উপভোগ করল কটা চোখের কটাক্ষে। এই পর্যন্ত ঘটনা। তুমি চাটা দিলে ওদের। ওকে দেখলে, আমাকে দেখলে। আমি তোমার চোখ দেখলাম কিন্তু তোমার চোখের প্রশ্নবোধক চাউনি দেখলাম না। তাই বুঝতে পারি নি তোমার বুক কাঁপছে। থইথই ভালোবাসার বুকে থরথর কাঁপুনি আমার চোখে পড়ল না। তোমার চায়ের কাপের ঢেউগুলো দেখেও বুঝতে পারলাম না তোমার সংযমের ক্যানিউট হৃদয়সমুদ্রের ঢেউগুলোকে শাসন করবার কি আপ্রাণ চেষ্টাটাই না করছে। বুঝতে পারি নি বলেই বিকেলের শো'তে সিনেমায় যেতে রাজী হলাম রাঙাবৌদি ও তাঁর রাঙাবোনকে। শো'তে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম তুমি এলে। আধবোজা গলায় বললে,—কোথায় যাচ্ছো ? বললাম—বৌদিদের নিয়ে 'শাপমুক্তি' ছবিটা দেখে আসি। তুমি তো দু'দিন আগে মা দিদিদের সঙ্গে দেখে এলে।

তুমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলে। রানওয়ের শেষে আকাশে ওড়বার আগে যেমন উড়োজাহাজগুলো অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তেমনি তুমি চুপচাপ শক্তি সঞ্চয় করে নিলে। তারপর ঝট করে বলে বসলে,—তুমি সিনেমায় যাবে না।

আমি থ। কেন যাবে না।

তুমি বললে অধিকারের প্রমত্ত গৌরব,—আমি বলছি তাই। বলেই বেরিয়ে গেলে।

তোমার কথা রাখি নি। ছেলেমানুষী আবদারের কোন অর্থই খুঁজে পাই নি তখন। সিনেমা থেকে ফিরে তোমার দেখা পাই নি। পরদিন সকালেও তুমি এলে না। ঘাটে যাবার সময় তুমি সেদিন আমার জানালায় এলে না। হার রাখতে বললে না। মন খারাপ হয়ে গেল। ঘাট থেকে স্নান সেরে ফেরার পথে তোমাকে ধরলাম,—কি দেবীর যে দর্শনই নেই।

তুমি চুপ।

বললাম,—কি ব্যাপার, ভৃত্য কি কোন অপরাধ করেছে ? ফোঁস করে উঠলে তুমি কালকেউটের মতো,—কেন, আমার কাছে কেন, যাও না ঐ রাক্ষসীর কাছে।

ঈর্ষার বিষে তোমার মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল। আর সেটা দেখতে পেয়ে আনন্দে বুক ভরে গিয়েছিল আমার। রাগ করলে মেয়েদের মুখ সুন্দর দেখায় কথাটা সস্তা তোষামোদ মাত্র। রাগ করলে কারুর মুখই সুন্দর দেখায় না। তোমার মুখ তাই সে সময় খুব সুন্দর লাগছিল না।, রাগজ্বলা রাগফোলা ঠোঁট কাঁপা মুখটা সুন্দর বলব না, বরং কুৎসিত বলা চলে। মুখ সুন্দর না লাগুক, সুন্দর লাগছিল রাগটাকে। ঈর্ষার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। ভালবাসা আত্মরক্ষা করার জন্য যে বাঘনখ বার করে আনে তাকেই তো বলে ঈর্ষা। ঈর্ষার সে বিষকন্যার অসামান্য রূপমায়ায় পাগল হয়ে গেলাম আমি। তাই পাগলের মতোই অজস্র আবোল-তাবোল বকে গেলাম। তোমার পায়ে ধরতে বাকি ছিল সেদিন। শেষ পর্যন্ত তোমার প্রেমের, তোমার ঈর্ষার জয়ে তৃপ্তির হাসি ফুটল ঠোঁটে। বিপদ কাটল আমার। এখনও ভাবলে অবাক লাগে, সেদিন তুমি আমাকে কি কান্নাটাই না কাঁদিয়েছিলে!

সে কান্নার জবাবে তোমাকেও একবার কাঁদিয়েছিলাম আমি। সে ঘটনাটাও স্পষ্ট মনে আছে।

দোষ আমার ছিল না। বৌদির তাকের ওপর বইটা পেয়েছিলাম। কামসূত্র। নামটা দেখে চোখে জলুনি হচ্ছিল, কয়েকপাতা পড়ে বুক জ্বলতে লাগল। বইটাতে পড়লাম

চুম্বন একপ্রকার নয়, বহু প্রকার। ভাবলাম বহু প্রকার না হোক, এক প্রকারের অন্তত স্বাদ পেতে পারি আমি। পেতে পারি তোমার কাছ থেকে। বই বন্ধ করে অনেকক্ষণ ভাবলাম। কিন্তু সাধ যতই থাক, মনে হচ্ছিল এ আমার সাধ্যাতীত। তোমার সামনে গিয়ে এ জিনিস আমি চাইতে পারব না। মাথায় বুদ্ধি এলো। মুখ ফুটে চাইতে যখন পারব না তখন কাগজে লিখে পেশ করলেই তো হয়। তাই করলাম। একটা চিরকুটে লিখলাম,—একটা চুমু দেবে চিনু?

(তোমার ডাকনামটার মায়া আমি কাটাতে পারি নি। ছেলের নাম রেখেছি চিন্ময়, ডাকি চিনু বলে। মেয়েলী নাম বলে প্রতিবাদ ছিল ওর মার। কিন্তু উনিও হার মেনে ওকে চিনুই ডাকতেন।) যা বলছিলাম ফিরে আসি সেই চিরকুটে। চিরকুটটা নিয়ে তোমাকে খুঁজতে লাগলাম। পেলাম তোমাদের রান্নাঘরে। উনুনের পাশে উবু হয়ে বসে তুমি একমনে ফুটন্ত চাল দেখছিলে। আমি এসে চৌকাঠে বসলাম ফুটন্ত এক দুঃসাহস নিয়ে। তুমি চমকালে,—নসুদা, তুমি?

বললাম,—হ্যাঁ চিনু। আমি। এইটুকু বলেই চুপ হয়ে গেলাম। তুমি হাটুর উপর থুতনি রেখে বললে,—আজকে পড়া নেই? পরীক্ষা তো এসে গেল।

বললাম,—আমার পরীক্ষার জন্য ভেবো না। নিজের পরীক্ষায় তুমি পাস হতে পারবে?

আমি পাস না করি ফেল করব তাতে তোমার কি—ফুঁসে উঠলে তুমি।

বুঝলাম স্রোত অন্যদিকে বইছে। এভাবে এগুলে চিরকুট পৌঁছুতে এক যুগ লাগবে। তাই বললাম,—যা খুশী তুমি করো, ফেল বা পাস আমার কিছু বলবার নেই। আমি একটা জিনিস চাইতে এসেছিলাম। দেবে?

কি?—তুমি সরল শান্ত চোখে তাকালে,—এখন বাপু তোমার জন্য চা করতে পারব না আমি।

চা নয়,—আমি বললাম।

তবে কি? কুলের আচার, এখন নয় বিকেলে করে দেবো'খন।—তুমি অন্তরঙ্গতার ছলছল গলায় বললে।

না,—আমি বললাম, তারপর চিরকুটটা বার করে থরথর বুকে কম্পমান হাতে তোমার দিকে বাড়িয়ে বললাম,—এটা পড়ে দেখো।

খুব একটা দুষ্টুমি ভেবে তুমি মৃদু হেসে কাগজটা নিলে, পড়লে। সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখ তোমার লাল টুকটুকে হয়ে উঠল। গনগনে সূর্যের মতো লাল। রক্তের আভায় এত লাল লাগছিল, না উনুনের আভায় বলতে পারব না। তোমার কিশোরী সুলভ চঞ্চলতা কোথায় উবে গেল। একটা চিরকুটে তুমি কিশোরী থেকে নারী হয়ে উঠলে। কাঁপা হাতে তুমি চিরকুটটা কচলাতে লাগলে। আমার মনে হচ্ছিল তুমি আমার হৃৎপিণ্ডটা দলেমলে রক্তাক্ত করে দিচ্ছ। হঠাৎ তুমি মাসিমার গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলে, সঙ্গে সঙ্গে চিরকুটটা উনুনে ছুঁড়ে দিলে। দপ করে জ্বলে উঠল কাগজটা। তোমার মুখে সেই জ্বলন্ত শিখাগুলো নাচছিল আমার দুরন্ত ইচ্ছার সাপের মতো ফণা তুলে। আস্তে আস্তে কাগজটা জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলি নি। তারপর থরথরে গলায় বললাম,—কি দেবে না?

তুমি নিজেকে সংযত করলে, চোখ তুলে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকালে, তারপর পরিচ্ছন্ন গলায় প্রশ্ন করলে,—কি দেবো?

তোমার নিস্পৃহ কণ্ঠ, নির্মল চোখ দেখে আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল। মনে হল আমি উষ্ণ এক নারীশরীরের সামনে নয় শীতল কঠিন এক গ্লেসিয়ারের সামনে বসে

আছি। কী শীতল তোমার চোখ! আমি বোজা গলায় বললাম, (ভাবলে এখনও হেসে কুটিকুটি হতে ইচ্ছে করে)—এক গ্লাস জল দেবে?

তোমার মুখের মানচিত্রে একটুকু কম্পন লাগল না। কোণের কলসী থেকে গড়িয়ে এক গ্লাস জল তুলে দিলে আমার হাতে। উঃ কি অসহ্য পরাজয়। আমি হাত বাড়িয়ে জলটা নিলাম। কিন্তু খেলাম না। আমার ইচ্ছা মৃত্যুর আগে তার শেষ শিখাটা দেখাতে চাইলো। তাই জলটা আমি ধীরে ধীরে তোমার চোখের সামনে নর্দমায় ফেলে দিলাম। এত ধীরে ফেললাম যে জলের সরু রেখাটা শেষই হতে চাইছিল না। জলটা শেষ হতেই ঠং করে গ্লাসটা মেঝেতে রাখলাম। তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে এলাম।

পরাজয়ের গ্লানিতে দূর্বার আক্রোশে জ্বলতে লাগলাম। প্রতিশোধের বাসনা জাগল বুকে। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলাম। শুরু করলাম আমার মৌনব্রত। আর আমার এ চালে হেরে গেলে তুমি।

বিকেলে চা দিতে এসেছিল। আমি বই খুলে আমার মনের বাঘটার দাঁত ধারালো করছিলাম। তুমি সহাস্যে বললে—বাবুমশায় আপনার চা।

আমি হিমালয়ের মতো নিঃশব্দ।

তুমি বললে,—কার ধ্যান করছ শুনি? যার ধ্যান করছ সে তো এখানে।

আমি বর্ণহীন আকাশের মতো স্তব্ধ। তুমি উচ্চকণ্ঠে বললে,—এ্যাই, তোমার চা।

কঠিন কণ্ঠে বললাম,—আমি কালা নই, শুনেছি।

তুমি এখনও কণ্ঠের উত্তাপ ধরতে পারো নি, বললে, দেখে তো মনে হচ্ছে না কিছু শুনেছো।

বললাম, শুনে কি করতে হবে শুনি? নাচবো?

এইবার তুমি বুঝলে। সারা মুখ সাদা হয়ে গেল তোমার? (ভয়কে কি যে মধুর লেগেছিল সেদিন) বললে, কি হয়েছে? ওরকম করছ কেন?

বললাম, আমি এখন পড়াশুনা করছি। দয়া করে আপনি এখন বিরক্ত করবেন না, আপনি যেতে পারেন।

জল টলমল করে উঠল তোমার চোখে। আমার এ কণ্ঠ তুমি আগে শোন নি। সবুজ বনময় গিরি বলে যাকে জানতে তার আগ্নেয়গিরি রূপ তুমি কল্পনাও করতে পারো নি। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তারপর ভেজাকণ্ঠে বললে,—রাগ করেছো?

কি করুণ তোমার কণ্ঠ। কিন্তু আমার প্রেম আজ নির্মম প্রেম। ভালবাসার একটা দিক পাশবিক, আঘাত দিয়েই তার তৃপ্তি। সে বৃত্তির বিষে আমার কণ্ঠ আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠল, বললাম,—দেখো চিনু, যার তার উপর রাগ করে নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার। পরীক্ষা সামনে। দয়া করে এখন তুমি যাও।

টলটলে চোখ থেকে ঝরঝর করে জল উপচে পড়ল তোমার গালে। আঁচলে চোখ ঢেকে পালিয়ে গেলে তুমি।

আক্রমণের সাফল্যে আমি জয়ের হাসি হাসলাম।

চলল আমার মৌন আক্রমণের পালা। দূর থেকে তুমি দেখো আমি কাছেই আসি না। তুমি এলে আমি বই টেনে পড়তে শুরু করি। মা'কে বললাম,—মা এক গ্লাস জল দাও। মা তোমাকে বললেন–এক গ্লাস জল দে তো চিনু। তুমি জল নিয়ে এলে। কিন্তু আমি জল নিলাম না, বললাম,—থাক এখন আর জল খাবো না। তোমার হাত কাঁপতে লাগল। মা বললেন—কেন রে, এইমাত্র চাইলি যে। বললাম,—ভুল করে চেয়েছি আর এরকম চাইব না। মা বোবা। তোমার চোখে জল। তোমার চোখেই জল আনতে চেয়েছিলাম। সে জল দেখে তৃষ্ণা মিটল, উঠে চলে এলাম।

দিনের পর দিন যায়। আমার মৌনতার প্রাচীর কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে।

তোমার চেহারা খারাপ হতে লাগল, জানি তোমার রাত্তিরে ঘুম হতো না। মা আঁচ করলেন,—কি রে নসু, তুই আজকাল চিনুর সঙ্গে কথা বলিস না কেন? বললাম,—পরীক্ষা মাথায় এখন কি আর কারুর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারি।

ছেলের বিদ্যানুরাগে মা ক্ষমাসুন্দর হাসি হেসে আমাকে রেহাই দিলেন। কিন্তু তুমি। তুমি প্রতিমুহূর্তে কোটি মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে বাঁচতে লাগলে।

শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারলে না। সেদিন দুপুরবেলা তুমি আমার পড়ার ঘরে এলে। আমি টের পাওয়া মাত্র চোখ রাখলাম বইয়ের পাতায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলে। তারপর বললে,—শোনো, আমি রাজী আছি। এইবার আমার উদাসীন হবার পালা। নিস্পৃহ নিষ্কম্প নিরুদ্বেগ হবার পালা। তাই অসীম ঔদাসীন্যে আমি নিরুত্তর রইলাম। তুমি আবার বললে নিষ্প্রভ গলায়,—আমি রাজী আছি।

আমি মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম তোমার দিকে। সহজ সরল গলায় বললাম,—কী রাজী আছো?

আমার সেই দৃষ্টির কপট সারল্যে তোমার চোখ ঝল্‌সে গেল। চোখ নামিয়ে বললে,—তুমি যা চেয়েছো তা দিতে রাজী আছি।

কি কণ্ঠস্বর তোমার! যেন নিজের ফাঁসীর আদেশ পাঠ করে গেলে নিজের মুখে। তোমার কি চেহারাটাই হয়েছে! ফাঁসীর আসামীর মতোই চুল উস্কুখুস্কু, শবের ঠোঁটের মতো সাদা ঠোঁট, নির্ঘুম ফোলা চোখ। করুণা হল আমার? না, হওয়া উচিত ছিল, হল না। নিষ্ঠুর প্রেমে আমি তখন চেঙ্গিস খাঁ। বললাম,—রাজী আছো। যেন তোমার রাজী হওয়াটা আমার কাছে কিছু না। বললাম,—দরজাটা বন্ধ করে দাও। চমকে উঠলে তুমি। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখলে সত্যি কথাটা আমিই বলেছি কিনা। আমি এবার আরো স্পষ্ট করে বললাম,—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

এবার তোমার চোখকানের বিশ্বাস হল। এক মুহূর্ত কি ভাবলে তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলে তুমি। কি বিগলিত আত্মসমর্পণের ক্লান্তি তোমার। আমি বললাম,—এবার এদিকে এসো। তুমি এক পা এক পা করে মাঝঘর পর্যন্ত এলে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে, ভীতা হরিণীর মতো বন্ধ দরজার দিকে তাকালে, চেঁচিয়ে উঠলে না, আমি পারব না। আমার মুখে বিন্দুমাত্র বিস্ময় দেখা দিল না। কাছে না এসে আমি সোজা দরজার ছিটকিনি খুলে দিলাম। বললাম, যেতে পারো। কোন জবরদস্তি নেই। বলে ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম। বই খুলে পড়তে আরম্ভ করলাম নিরুদ্বিগ্ন ঔদাসীন্যে। নির্মম যান্ত্রিকতায় আমি মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছিলাম। তোমার পায়ের শব্দ পেলাম। বুঝলাম চলে গেলে। আমি একটু হতাশ হলাম, তবে কি আমার অভিনয়ে কোন ত্রুটি হয়েছে, না কি তোমার ভালবাসার তারার জ্যোতি কমে এসেছে। ভাবতে ভাবতে বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। তারপর অন্যমনস্কের মতো পেছন ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। তুমি। দেখলাম তুমি যাও নি। কখন নিঃশব্দে দরজাটা আবার বন্ধ করে দরজায় পিঠ দিয়ে অটল প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছো। দু'চোখ বেয়ে নেমেছে জলের ধারা। প্রেমের জন্য কি মহৎ আত্মনির্যাতন। কতক্ষণ ওভাবে ঠায় দাঁড়িয়েছিলে জানতেই পারি নি। চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলাম তোমার কাছে। আস্তে আস্তে, যেন ভঙ্গুর কাঁচের পুতুল ধরছি, তোমার মুখটা দু'হাতে তুলে ধরলাম আমি। আহা কি বেদনাবিধ্বস্ত বিষাদ প্রতিমা-মুখ! চোখ বুজে ফেললে তুমি। নিশ্বাস রুদ্ধ করে প্রতীক্ষায় রইলে আমার চুম্বনের জন্যে, তোমার লজ্জার অপমৃত্যুর জন্যে। কিন্তু কাকে চুমু খাবো আমি? পাগল, আমি আক্রোশের অধিকার দিয়ে তোমার ভালবাসার পবিত্রতাকে কি কলুষিত করতে পারি? আগ্রহের মাধুর্যকে নষ্ট করে দেবো নিগ্রহের শুষ্ক

হিসেবে? কক্ষনো না। তাই হাসলাম, বললাম,—চিনু, দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম, না?

চোখ খুললে তুমি। স্বর শুনে বুঝলে এ পশুর কণ্ঠ নয়, এ শিশুর কণ্ঠ। দেখলে আমার মুখে প্রাপ্তির পূর্ণ হাসি। বুঝলে এ জন্তুর হাসি নয়, যন্ত্রণার হাসি। তোমার যন্ত্রণায় বুক আমার ভেসে যাচ্ছিল। তুমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। যেন সুদূর কোন তারা হারিয়ে ফেলেছিলে তুমি, তাকে আবার খুঁজে পেয়েছো। তারপর হঠাৎ কূলভাঙা বন্যার মতো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললে, আমার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলে। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছিল তোমার শরীর। আমি দু'হাতে তোমাকে চেপে ধরে আশ্বাসভরা কণ্ঠে বললাম,—রসিকতা করছিলাম। রসিকতা বোঝ না?

তুমি এবার কান্নার সঙ্গে রাগ মেশালে। দু'হাতে আমার বুকে কিল ঘুষি মারতে লাগলে পাগলের মতো। তোমার প্রেমের সে পাগলামি দেখে মন ভরে গেল। এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামলে তুমি। কান্নাও থামল। কিন্তু হেঁচকি তখনও চালু ছিল। বললাম,—ঢের হয়েছে, এবার দেবী প্রসন্ন মুখে একবার হাসো। বলো আমার অপরাধ নাও নি। বলো, আমার এই কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডের পর তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো।

তুমি ঠোঁট টিপে হাসলে, বললে, না।

আমি বললাম, না?

তুমি বললে, না, না—আর বলতে পারলে না তুমি। প্রগাঢ় চুম্বনে ঠোঁট আটকে দিলাম আমি। শেষ 'না'টা তোমার আর বলা হল না।

ছেড়ে দিতেই ঝিক্‌মিক চোখে লজ্জায় গাল গোলাপী করে হাসলে তুমি। তারপর চোখ নিচু করে প্রেম জরো জরো কণ্ঠে বললে,—এই?

বললাম,—এই। এর জন্যে এত কাণ্ড।

আমি দরজাটা খুলে দিলাম এবার। বললাম,—দেবী এবার আশা করি অপরাধের মার্জনা হয়েছে?

তুমি বললে,—না। যেভাবে আমাকে তুমি কষ্ট দিয়েছো তার জন্যে শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।

বললাম বেশ। কি শাস্তি দেবে দাও।

এ আমার কল্পনাতীত ছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট্ করে আমার ঠোঁটে একটা চুমি খেয়েই ছুটে পালালে তুমি।

বললাম,—গুরুদণ্ডে বড় লঘু শাস্তি হল চিনু।

দূরে গিয়ে দাঁড়ালে তুমি,—ইস্, আরো চাই, অসভ্য কোথাকার। আর নয়।

বললাম,—আবার কবে শাস্তি পাবো চিনু?

তুমি বললে—কোনদিন না। এখন থেকে তোমার সব অপরাধের সাতখুন মাপ।

বলেই চলে গেলে তুমি। বলা বাহুল্য এরপর তুমি আমাকে সর্বদা মোটেই মার্জনা করো নি। কালভদ্রে 'শাস্তি' দিয়েছ কয়েকবার।

শেষবার 'শাস্তি' দিয়েছিলে যেদিন বি, এ, পাস করে চাকরি খোঁজার জন্য আমি কোলকাতা রওনা হলাম।

বলেছিলাম,—চাকরি পেয়েই তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবো আমি।

বলেছিলে,—যেদিন চাকরি পাবে তার পরের দিন-ই আমাকে এসে নিয়ে যাবে।

বলেছিলাম,—বা রে, চাররি পেয়ে পরের দিন চাকরিতে জয়েন করব না।

না, বলেছিলে তুমি চাকরি পেলে আগে আমি তোমাকে জয়েন করব তারপর তুমি চাকরিতে জয়েন করবে।

হেসেছিলাম, বলেছিলাম—ওরকম পাগলামি অবশ্য করব না। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যাবো বিয়ে করে। তুমি চাও তো এখন থেকেই সিঁদুর পরা শুরু করতে পারো। আর চিনু, এখন থেকেই বলে দিচ্ছি চিঠিতে আমাকে নসুদা বলে সম্বোধন করো না।

তবে কি করব?

হেসে বললাম, লিখো, প্রাণনাথ।

বললে, প্রাণনাথ না আরও কিছু। লিখব প্রাণঘাতী।

লিখো, বললাম আমি, কোন আপত্তি নেই।

তুমি বললে, আমাকে কি সম্বোধন করবে?

বললাম, ধর্মপত্নী বা ধর্মপেত্নীটেত্নী করব আর কি।

ইস্ ছোটলোক কোথাকার, বললে তুমি লিখবে হৃদয়েশ্বরী আর নিচে লিখো দাসানুদাস।

আমি হেসে উঠলাম, হৃধয়েশ্বরীই লিখব'খন। তারপর গলা নামিয়ে বললাম এবার দাসানুদাসকে একটা শাস্তি দেবে না?

গোলাপী গালে লজ্জারুণ কণ্ঠে বললে তুমি, না। এখন থেকে সব শাস্তি পাবে চিঠিতে।

বেশ, বললাম, কোলকাতায় কোন মেয়ের কাথ থেকে শাস্তিগুলো ক্যাশ করে নেবো'খন।

খবরদার, বললে তুমি, তখন তোমার কণ্ঠে রসিকতা বিন্দুমাত্র ছিল না। ছিল আদেশের ঋজুতা। বললে হাতের এই সোনা ছুঁয়ে দিব্যি করো অন্য কোন মেয়ের দিকে কক্ষনো তাকাবেও না।

সোনা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলাম। আহত কণ্ঠে বলেছিলাম,—আমাকে বিশ্বাস কর না চিনু?

তুমি বললে, কি জানি পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করতে ভয় করে। তারপর আমার আহত মুখ দেখে আশ্বস্ত কণ্ঠে বললে, ঠাট্টা বোঝ না বোকারাম।

তোমাকে বিশ্বাস না করতে পারলে বাঁচবো কি করে। আমি জানি তুমি কোনদিন আমাকে ঠকাবে না।

কিন্তু তোমার সে ঠাট্টাটাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত। তোমার বিশ্বাসের মূল্য আমি দিতে পারি নি। তোমাকে ঠকতেই হল আমার কাছে। কেন, সে ইতিহাস জানাবার জন্যই আজকের এই চিঠির অবতারণা। ওপরের যে পুরনো দিনের ঘটনাগুলো লিখেছি সেগুলো স্মৃতির প্রলাপ হিসাবে বেরিয়ে গেল কলমের মুখে। এসব লেখার উদ্দেশ্য ছিল না আমার, কেননা এসবই তো তোমার জানা কিন্তু কুম্ভকর্ণ স্মৃতির অর্ধজাগরণে এইসব বেরিয়ে এল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। শুরু হোক আমার বিশ্বাসঘাতকতার অধ্যায়।

কোলকাতায় এলাম। কেন? না, চাকরি চাই। শুরু করলাম খোঁজ। এ দপ্তরে সে দপ্তরে দরখাস্ত, অমুক কাকা তমুক মামাকে তোযামোদ। কোন ফল হল না। ক্রমে হতাশ হতে লাগলাম। তুমি আশ্বাস দিতে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে। তার জবাবে একবার লিখেছিলাম —'ঈশ্বরের চাকরি দেবার ক্ষমতা নেই চিনু। উনি মিনিস্টার বা কোন অফিসের বড়বাবু নন।' সত্যি, ধীরে ধীরে সিনিক হয়ে উঠলাম। তোমাকে চিঠি লেখাও ক্রমে বন্ধ করলাম। কি লিখব? লেখবার কি আছে? ব্যর্থতার কথা বার বার লিখে কি [illegible]

যখন এভাবে এক বছর কেটে গেল তখন নিদারুণ এক সত্য আবিষ্কার করলাম

আমি। আবিষ্কার করলাম হৃদয় বড় নয়, হৃদয়ের চেয়ে অনেক বড় পেট। এই শীতল সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

দিন আর কাটে না। ধার দেবার ভয়ে বন্ধুরা কাছে ঘেঁষে না, থাকতে দেবার ভয়ে আত্মীয়েরা সরব অসন্তোষ প্রকাশ করে।

তারপর একদিন রাত্তিরে একা ময়দানের অন্ধকারে বসেছিলাম চুপচাপ। খেয়াল করি নি কখন মস্ত কালো একটা গাড়ি দাঁড়ালো এসে অদূরে। হঠাৎ মৃদু মেয়েলী হাসি আর মোটা মাতাল কণ্ঠ শুনে তাকালাম গাড়িটার দিকে। গা ঘিনঘিন করতে লাগল। উঠব উঠব ভাবছি হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। খিলখিল হেসে দৌড় দিল অন্ধকারে।

পেছনে বেরিয়ে এল এক বৃহৎ বপু মাতাল। সে মেয়েটিকে ধাওয়া করতে গেল টলমল করে। তারপর মেয়েটিকে না দেখতে পেয়ে আমাকে অন্ধকারে দেখতে পেয়ে ভাবলো মেয়েটি বুঝি বসে আছে। বলল,—আর কত ঘুরাবি আমায়? বলে সোজা আমার কাছে এসে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। আমি সামনে গিয়ে তুলে ধরতেই চিনলাম। ভবতোষ দত্ত। আমাদের মানিকগঞ্জে কুঞ্জ দত্তের বড় ছেলে। যাকে ছোটবেলায় ডাকতাম,—বুলুদা। আমি ডাকলাম,—বুলুদা, বুলুদা। চমকে উঠল ভবতোষ দত্ত। বাজারী মেয়েটাও ছুটে এসেছিল। পোশাকী ড্রাইভারও। ভবতোষ দত্তের নেশা কেটে গেল। সবার মুখে একবার করে তাকালো তারপর ভীতকণ্ঠে বলল,—নসু না?

তারপর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। ভবতোষ দত্ত আমাকে অফিসে দেখা করতে বলল। চাকরি পেতে পারি এক শর্তে—বলল ভবতোষ দত্ত,—ইয়ে মানে এসব কিছু যেন কেউ জানতে না পারে। কথা দে নসু। নইলে স্ত্রী-পুত্র সংসার নিয়ে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

কথা দিলাম। ভবতোষ দত্তের চরিত্র নিস্কলঙ্ক রইল আর আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাওয়া গেল।

না, এভাবে কাজ নিতে ঘেন্না হয় নি। যাদের চাকরি নেই, যারা বেকার, তাদের ঘেন্না থাকতে নেই।

চাকরিতে জয়েন করতে গেলাম সেদিন। অনেকদিন পর ভালো করে স্নান করে পরিষ্কার কাপড়জামা পরে হাজির হলাম অফিসে। মনে আমার খুশীর বন্যা। চাকরি মানে স্বপ্ন, চাকরি মানে ঘর, চাকরি মানে ঘরনী। আর ঘরনী মানে তুমি, চিনু তুমি। ভাবলাম অফিসে বসেই চিঠিটা লিখব তোমায়।

কিন্তু অফিসে ঢুকেই আঁচ করতে পেলাম। থমথমে আবহাওয়া। সবাই আমাকে দেখছে নিষ্ঠুর চোখে। আমি কয়েকজনকে নমস্কার করলাম কেউ প্রতিনমস্কার করল না। যার দিকে তাকাই সেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। বুঝতেই পারছিলাম না এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ। কি অপরাধ আমার? কেন এরা আমার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করছে! নিজের টেবিলে বসে ভাবছি। মনটা তেতো হয়ে গেছে। ভাবছি কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করবো আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহারের হেতুটা কি। হঠাৎ একটা ছেলে ফোনে কি বলল উত্তেজিত কণ্ঠে, কি শুনল, শুনে ছেলেটার মুখ সাদা হয়ে গেল। সবাই প্রায় আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল,—কি, কি খবর পেলে সুধীর?

সুধীর প্রথম হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকালো, তারপর কান্নাভরা গলায় [illegible] ভেবেছি তাই। উনি আত্মহত্যা করেছেন। গঙ্গায় ওর বডি পাওয়া গেছে কাশী[illegible]

সবাই বজ্রাহতের মতো চুপ করে রইল। শুধু ফ্যানগুলো ঘুরছে শন্‌শন্। সুধীরই

উঠে দাঁড়ালো প্রথমে,—আমাদের যাওয়া উচিত। আমি যাচ্ছি, কে কে যাবেন চলুন।

সুধীরের সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠল। ধীরে ধীরে অফিসের সব লোক বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। কয়েকজন জ্বলন্ত চোখে আমাকে দেখে গেল। সারা অফিস খালি। আমি রহস্যের কোন কিনারাই করতে পারছিলাম না। বোবার মতো বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর আমার ধ্যান ভাঙল কান্নার শব্দে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে কাঁদছে। দেখলাম কোণে টুলে বসে বেয়ারাটা কাঁদছে। কাছে গিয়ে বললাম,—কি হয়েছে ভাই, কাঁদছ কেন তুমি? সবাই কোথায় গেল? কে আত্মহত্যা করেছে? আমাকে কেউ কিছু বলছে না কেন?

বেয়ারাটা মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, এতক্ষণ বাদে প্রথম একজনের মুখে সমবেদনার ছায়া দেখলাম। ও বললে, বাবুরা মিছিমিছি আপনার ওপর রাগ করছেন, এতে আপনার কোন দোষ নেই। চিন্তাহরণবাবুর ভবিতব্য ছিল এই, কে আর তাকে রুখতে পারে বলুন?

চিন্তাহরণবাবু কে?—প্রশ্ন করলাম আমি।

আপনি যে কাজটা করছেন সে কাজটা করতেন চিন্তাহরণবাবু, চিন্তাহরণ মজুমদার। বুড়ো মানুষ, বড় সংসার। স্ত্রী তিন ছেলে এক মেয়ে নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে এ মাইনেতে সংসার চালাতেন। মেয়ের বিয়ের জন্য অনেকদিন চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সাধারণ চেহারার কালো মাঝারী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। স্ত্রী সর্বদা অসুস্থ থাকতেন বলে ধারে-দেনায় ডুবে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলেন চিন্তাহরণবাবু। দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল। তারপর বিনামেঘে বজ্রপাত হয়। চাকরি গেল চিন্তহরণবাবুর। বুড়ো মানুষ কাজকর্মে এক-আধটু গণ্ডগোল হয়ে যেতো। তার জন্য ধমকটমক খেতেন বড়বাবুর কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমনভাবে চাকরি যাবে ভাবেন নি। ওঁর জন্য সবাই সুপারিশ করেছে। ফল হয় নি। কাল নিজে এসে অনেক কান্নাকাটি করেছেন। বলেছেন মেয়ের বিয়েটা পর্যন্ত তার চাকরি রাখতে। বড়বাবু কান দেন নি তাঁর কান্নায়।

তারপর কাল আর বাড়ি যান নি। রাত্তিরবেলা খবর পাওয়া গেল চিন্তাহরণবাবু নিখোঁজ। সারা রাতেও যখন ফিরলেন না তখন আজ সকালে পুলিসে খবর দেওয়া হল। খানিক আগে ফোনে জানা গেছে উনি আত্মহত্যা করেছেন। ওঁর লাশ পাওয়া গেছে কাশীপুরের কাছে গঙ্গার জলে। বেচারা, না মরেই বা কি করতেন! কি করে বিয়ে দিতেন মেয়ের, কি করে পুষতেন এত বড় সংসার?

তাঁর শূন্য জায়গায় আপনি এসেছেন বলেই সব বাবুদের রাগ যেন আপনিই ওঁর চাকরি খাবার জন্য দায়ী। জানি এ বাবুদের ভুল। আপনার কি দোষ? চিন্তাহরণবাবুর অদৃষ্ট কি আপনি রচনা করেছেন? বলে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বেয়ারাটা।

সমস্ত শুনে বুকের ভিতরটা পর্যন্ত হিম হয়ে গেল আমার।

এতক্ষণে সমস্ত রহস্যের হদিস মিলল। মেরুদণ্ড বেয়ে কালো কুয়াশার মতো বোবা অন্ধকার একটা ব্যথা জেগে উঠল। আমার চাকরি পাওয়ার ইতিহাসটা মনে পড়ল। মনে পড়ল ময়দানের সেই কলঙ্ক রাতের কথা। পাগলের মতো অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় কোথায় ঘুরলাম জানি না। এক সময় দেখি আমি শ্মশানে এসে গেছি। আমার অফিসের লোকেরা আমাকে দেখে নি। সামনে এসে আমারও নিজেকে জাহির করতে ভয় করল। দূর থেকে দেখলাম চিন্তাহরণবাবুর শব। মনে হল এক্ষুনি বুঝি উনি চোখ খুলবেন, খুলে আমাকে দেখবেন। দেখবেন তাঁর হত্যাকারীকে।

ভয়ে পালিয়ে এলাম। তবে কি আমিই দায়ী? আমিই কি হত্যা করেছি চিন্তাহরণবাবুকে। বুকের ভেতর একটা কালো শকুন যেন চেঁচিয়ে উঠল। মনে হল, যে যাই বলুক আমিই চিন্তাহরণ মজুমদারের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

সারা রাত ঘুমতে পারলাম না। চিনু, সে রাত আমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘরাত।

এ রাতেই তোমার প্রেমের মৃত্যু হল চিনু।

পরদিন ঠিকানা খুঁজে আমি গেলাম চিন্তহরণবাবুর বাড়ি। দেখা করলাম সদ্যবিধবা চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে। পরিচয় দিলাম তাঁর স্বামীর পরিচিত একজন শুভানুধ্যায়ী বলে। ধীরে ধীরে সব শুনলাম। চিন্তাহরণবাবুর দেনার পরিমাণ প্রচুর। শুনলাম বাড়িওয়ালা ইতিমধ্যে সাত দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে নোটিশ দিয়েছেন। শুনলাম মেয়ের বিয়ে ঠিক ছিল আগামী ২১শে। কিন্তু চিন্তাহরণবাবুর মৃত্যুর খবরের সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন। শুনলাম ছেলেদের স্কুল ছাড়ানো ছাড়া উপায় নেই।

তারপর দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললাম, আমি, না মা, কিছুই করতে হবে না। বাড়ি আপনাদের ছাড়তে দেবো না। দেনা আমি চুকিয়ে দেবো। ছেলেদের পড়া বন্ধ হবে না। আর আপনার মেয়ের বিয়েও হবে।—তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ বুলিয়ে নিলাম সেই ধ্বংসস্তূপ মুখগুলির দিকে। শেষে চোখ রাখলাম কালো রোগা অশ্রুআর্দ্র মেয়েটির মুখের ওপর। স্পষ্ট কণ্ঠে আমি বললাম, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব। সারা সংসারের বোঝা আমি তুলে নেব নিজের কাঁধে।

মেয়েটি চমকে আমার দিকে তাকালো। যেন ওরা সবাই ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনতে পেল। আমি বললাম, আমার নাম শ্রীমন্ত চৌধুরি। আজ থেকে আমি আপনাদেরই একজন।

ওরা কোন জবাব দিল না। বেরিয়ে আসবার সময় দেখলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। জল টলমল অশ্রুকমল মুখ।

এই হল মাধুরীর সঙ্গে আমার বিয়ের ইতিহাস। যেদিন বিয়ে ঠিক হল সেদিন রাত্তিরে ভাবলাম তোমাকে সবিস্তারে সব ঘটনা জানিয়ে চিঠি লিখি। আমার আত্মদণ্ডের পূর্ণ কাহিনী জানাই তোমায়। কিন্তু না, বাড়িতে এসে তোমার চিঠি পেলাম। লিখেছ—"নসুদা, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে। দিল্লীতে। অনেক কান্নাকাটি করেছি, বাবা-মা কান দেননি। এখন তুমি ভরসা। চাকরি পাও আর না পাও অবিলম্বে এসে আমাকে তুমি উদ্ধার করো। তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাবো আমি। নসুদা, তোমার চিনুকে তুমি বাঁচাও।"

আমি নীরব রইলাম। যে আগেই মৃত সে কি করে অন্যকে বাঁচাবে? মনে হল ঈশ্বর যা করেছেন ভালোই করেছেন। তোমার বিয়ে হোক দিল্লীতে, তুমি সুখী হবে। এখন আর আমার ঘটনার ইতিহাস তোমাকে জানানো অর্থহীন।

মনে হল নীরবতাই সব সমস্যার সমাধান। আমি চুপ করে রইলাম। এমন কি কয়েকদিন তোমার টেলিগ্রামের আর্তকণ্ঠ শুনেও আমি কোন জবাব দিই নি।

তারপর আর কি? খবর পেলাম তোমার, বিয়ে হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে আমারও বিয়ে হয়ে গেল। মাধুরীকে ভালবাসার চেষ্টা করেছি অনেক, পারি নি। কিন্তু মাধুরীর তাতে কোন দুঃখ ছিল না। ও আমার মহত্ত্বেই মুগ্ধ, আমার করুণাতেই তৃপ্ত। শাশুড়ী চিররুগ্না। কিছুদিনের মধ্যে উনি মারা গেলেন। তারপর মা মারা গেলেন। এদিকে অজস্র দেনায় আমার প্রায় ভরাডুবি অবস্থা। ভবতোষ দত্ত আমাকে প্রচুর এডভান্স দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত একদিন এডভান্সের বদলে উনি আমার একটু সহযোগিতা চাইলেন। ভবতোষ দত্ত মধুর হেসে বললেন,—মাধুরীকে শরীর ভালো করবার জন্যে চেঞ্জে পাঠানো উচিত। করুণাপরবশ হয়ে আরও বললেন,—উনি ভাবছেন দেওঘর যাবেন কয়েকদিনের জন্য। আমার যদি অনুমতি থাকে উনি মাধুরীকে

সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। একাই যাবেন ঠিক করেছেন। গিন্নী না থাকলে এখানকার বাড়িঘর কেউ সামলাতে পারে না। তা'ছাড়া বাচ্চাদের কিচমিচে বিশ্রাম ওর হবেই না। তাই উনি একা যাবেন। উনি আর মাধুরী—ব্যাস। বেশী লোক থাকলে রিলাক্সেশনের কোন মানেই হয় না। বুঝলাম। মাধুরীর শরীর চাই ওঁর দেওঘরের বিশ্রামের জন্য।

আমি কোন জবাব দিই না। এক মুখ থুতু নিয়ে শুধু ভবতোষ দত্তের গোল মুখটাকে সিক্ত করে দিলাম। মুখকে থুকদানি করার আনন্দ যে কী জীবনে প্রথম সেটা অনুভব করলাম।

তারপর চাকরি গেল। দুর্দিন ঘনিয়ে এল আরও। এ রকম ঘোর দুর্দিনে খোকার জন্ম হল। খোকার জন্মের পরই মাধুরীর শরীর ভাঙতে আরম্ভ হল। ওরা ভাইরা টিউশনি করে পড়া চালাতে লাগল। আমি চাকরির উমেদারী করে করে শরীর ভাঙতে লাগলাম।

তারপর একদিন মাধুরীও মারা গেল। খুশীই হলাম বোধহয়। আমার অক্ষমতা দেখেই সম্ভবত ভগবান ওকে কাছে টেনে নিলেন। ওর ভাইগুলো অভাবের তাড়নায় কে কোথায় ছিটকে গেল জানি-না। হারাধনের ছেলেদের মতো আমার পরিবারের এক একজন করে সরে সরে রইল বাকী দুই। আমি আমার ছেলে।

একটা চাকরি পেলাম প্রেসে। ভাবলাম এইবার আবার আমি বাঁচবো। ভাবলাম আমার নামে খোকার পরিচয় না হোক খোকাকে এত বড় করে তুলব যে, ওর নামে আমার পরিচয় হবে। লোকে একদিন বলবে চিন্ময় চৌধুরীর বাবার নাম শ্রীমন্ত চৌধুরী।

কিন্তু ওয়েসিস আমার মরীচিকা হয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন অসম্থ হলাম। বেশী রকম অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য হলাম। নিজের জন্য নয়, চাকরি রক্ষার জন্য। ডাক্তার বললে নিষ্ঠুর কণ্ঠে—লুকিমিয়া। ব্লাড ক্যানসার। বললে,—আমার আয়ুর বড় জোর আর এক বৎসর।

দুঃখ? না, দুঃখ হল না। মৃত্যুকে পরমাত্মীয় মনে হল। মরতে আমার ভয় নেই। ঈশ্বর করুণাময় বলেই বোধহয় আমার মৃত্যুর নোটিশ দিলেন। বিনা নোটিশে আসতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। খোকার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করবার জন্যেই একবৎসর সময় দিলেন আমাকে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে চেষ্টা করতে ছ'মাস কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত মাথায় এলো বিজ্ঞাপন দেওয়ার আইডিয়া। সহৃদয় পরিবার কেউ যদি ওকে দত্তক নিয়ে আমাকে উদ্ধার করে সে আশায় বিজ্ঞাপন ছাপালাম। সে বিজ্ঞাপনের জবাবেই তুমি আর তোমার স্বামী এসেছিলে। কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতকের ছেলেকে দত্তক নিতে চাও না সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছ। সেইজন্যেই এই চিঠির অবতারণা।

আমার আর কিছু বলবার নেই। এই চিঠি পড়ে তোমার যদি ইচ্ছে হয় আমার ছেলেকে নিয়ে যেও। ইতি—

করুণাপ্রত্যাশী—শ্রীমন্ত চৌধুরি।

।। ডানকুনি আর কতদূর ।।

রূপ দু'জাতের। এক যা উগ্র, উষ্ণ আর অন্য যা মধুর গুঞ্জরণ। এক যা চোখকে ফিরিয়ে দেয়, অন্য যা চোখকে ফেরাতে দেয় না। বৌটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপকন্যা। ট্রেনের কামরায় ও যেন ব্যতিক্রম। কঠিন অঙ্কের বই-এর মধ্যে ভাঁজ-করা কবিতা। নির্লজ্জ চোখে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। চোখে চোখ পড়তেই লজ্জা পেলাম। অথচ আকর্ষণ অবহেলা করার জো নেই। যৌবন মস্ত বড় এক রহস্য উপন্যাসের মত, ওর মধ্যে যেন চুপ করে আছে। কবে এসেছিল বলতে পারব না, মেয়েটি নিজেও হয়তো জানে না। কিন্তু এখন আর নড়তে পারছে না ওকে ছেড়ে। কে এই বৌটি!

কোন পুরুষের সিঁদুর ওর মাথায়? কোথায় থাকে ও? মনের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন উচ্চৈঃস্বরে সোরগোল তুলে দিল। শালীনতাবোধ চোখ রাঙাল, তবুও কৌতূহল আকাশ উঁচু। বৌটির ওপর চোখ অন্যান্য যাত্রীদেরও। সারা কামরায় ও আর ওর সঙ্গে এক বুড়ি—এই দু'জনেই মেয়েযাত্রী। সবারই লক্ষ্য সম্ভবত বৌটি। কিন্তু ওর এদিকে এতটুকু ভাবান্তর নেই। জানালার বাইরে নির্নিমেষ চোখে ও প্রাকৃতিক শোভা দেখতে ব্যস্ত। নিজের চুম্বকী সৌন্দর্যের সম্পর্কে একেবারেই চেতনা নেই মেয়েটির। থাকলে অমন অন্যমনস্ক রয়েছে কি করে? আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়েছে, কিন্তু কই ওটা গুছিয়ে রাখবার কথা তো ওর মনেও পড়ছে না। হঠাৎ মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—মা, ডানকুনি আর কতদূর? আমার কিন্তু বডড ভয় হচ্ছে। কণ্ঠস্বর নয়, যেন বাঁশীর রাগিণী। ঠাণ্ডা বাতাবী লেবুর গন্ধের মত সারা কামরায় মধু ঝরিয়ে দিল সে কণ্ঠস্বর। বুড়ি জবাব দিল,—ব্যস্ত হস্‌নে লক্ষ্মী চুপ থাক। ডানকুনি আর দু'টো স্টেশন বাদেই।

মেয়েটির মুখের ওপর ভয়াটে কুয়াশা ওড়না জড়ানো। ভয় ছমছম গলায় বলল ও, আরও দু'টো স্টেশন!

গাড়ি ছুটে চলেছে। দু'পাশে জানালার ফ্রেমে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চলচ্চিত্র। যাত্রীরা কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ আমেরিকা-কোরিয়া-রাশিয়ার সমস্যায় উদ্বিগ্নতা প্রকাশে ব্যস্ত, কেউ মামলার তারিখ সম্বন্ধে সন্দিহান, আর কেউ পাকিস্তানের বোকামিতে খুশমেজাজ। কোণ থেকে একজনকে চালু একটা হিন্দী গান গাইতে শোনা গেল। কিন্তু আমার কানে একটানা যেন বেজে চলেছে বৌটির সেই মায়াবী কণ্ঠস্বর—'মা ডানকুনি আর কতদূর?' মনে হল চাকার আওয়াজেও শুধু এক কথা—ডানকুনি আর কতদূর? ডানকুনি আর কতদূর?

কি একটা স্টেশন আসতে চমক ভাঙল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম, তারপর ব্যাগ থেকে খুলে ফেললাম ট্রেনে পড়বার জন্যে আনা বইটা। ট্রেন

চলল। একবার মনে হল, কাবেরী আসবে তো স্টেশনে? না এলেও শান্তিনিকেতন যেতে অসুবিধে হবে না। বোলপুর থেকে কতটা আর দূর। আর ওখানে কাবেরীর বাসা খুঁজে বার করা এমন কিছু কঠিন হবে না।

কতদিনের সাধ ছিল গুরুদেবের শান্তিনিকেতন দেখব। সুযোগ ঘটে নি আসবার। আজ এতদিন বাদে সে তীর্থের বাসনা আমার চরিতার্থ হতে যাচ্ছে।

কম আনন্দ!...

মা, ডানকুনি এর পরেই তো, না? আমার ভয় কমছে না মা।

চমক ভাঙল আমার। সেই কণ্ঠ, সেই মাধুর্য, সেই আকর্ষণ! তাকালাম আমি। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম মেয়েটির দিকে। তারপর হঠাৎ মনে হল আমার, বৌটির অধৈর্য প্রশ্ন, ভয়—সবকিছুর কারণ আমি জানি। আবিষ্কার করলাম এক মুহূর্তের চাউনিতে—বৌটি সন্তানসম্ভবা।

আর সন্তানসম্ভবা জানবার পরই চোখের সামনে ভেসে উঠল আরেক পৃথিবী। যেন ঐ জ্ঞানটুকুর চাবিটা না থাকায় এতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দরজার বাইরে।

এখন সে চাবি লাগাতেই খুলে গেল একটা দরজা, উন্মুক্ত হল একটা করুণ ইতিহাস।

সেখানে বৌটি, বৌটি নয় আর, বৌটির নাম লক্ষ্মী হাজরা। পলাশপুরের গুণময় হাজরার ছোট মেয়ে।

গুণময় হাজরার সবই কম। জমিজমা তার যা ছিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নতুন রাস্তাটা শত্রুতা করে তার মোটা অংশ হজম করে নিয়েছে। চারটে ভালো যাঁড় ছিল, তার দুটো বড় বড় চোখ গোল করে হঠাৎ মরে গেল কি এক ব্যামোয়। দুশ্চিন্তায়-দুঃখকষ্টে মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ক্রমে পাতলা হয়ে উঠে গেল গুণময়ের। প্রয়োজনের সব বস্তুই তার কম। কিন্তু ভগবানের আর কিছু থাক আর নাই থাক রসজ্ঞান প্রচুর। তাই গুণময়কে তিনি মুক্তহস্তে সন্তান দান করেছেন। গুণময়ের পাঁচ মেয়ে, তিন ছেলে।

তিন মেয়ের বিয়ে দিতেই গুণময় প্রায় দেউলে হয়ে গেল। ধার প্রায় গলাডুবি। ধুঁকতে ধুঁকতে চার নম্বরের বিয়েটাও দিয়ে দিলে গুণময়, আর চার নম্বর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি রওনা হওয়ার পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে দেখলে গুণময়, ছোট মেয়ে লক্ষ্মী তার অজান্তেই কখন বড় হয়ে উঠেছে। শ্বাস ফেলতে দেবে না মেয়েগুলো। একজনকে পার করতে না করতেই পরের জন ঘাটে এসে হাজির। তবে বাঁচোয়া এই সব মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্মী দেখতে ভালো। তবুও অন্তত পাঁচ শ' টাকার ধাক্কা তো বটেই। গুণময়ের মাথায় যে ক'টা ক্ষীণায়ু চুল তখনও মুমূর্ষু হয়ে বেঁচে ছিল, এইবার সে ক'টাও গেল। লক্ষ্মীর বিয়ে দেবার চিন্তা যত-না, তার চেয়েও বেশী লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেলে একা থাকার চিন্তা। কেননা লক্ষ্মীকে বড় ভালবাসত গুণময়। বোধ করি ওর মা'র চেয়েও বেশী।

সে লক্ষ্মীর বিয়ে হল শেষ পর্যন্ত। বিনা খরচায়, অথচ জবরদস্ত ঘরে। লক্ষ্মীরই অদৃষ্ট। নইলে পলাশপুরের গরীব কিষাণের মেয়েটিকে কখনো ডানকুনির মদন মল্লিকের ছেলে গোকুল বিয়ে করে? সেকথা ভাবলে লক্ষ্মীর এখনো লজ্জায় গাল রাঙা হয়ে ওঠে।

রক্ষিতদের পুকুরটা আমবাগানের মধ্যে। দুপুরে যদিও বা সামান্য ভিড় থাকে, অপরাহ্নে একেবারে নির্জন। মোটা মোটা আমগাছগুলো স্থির জলের আয়নায় মুখ দেখে, শাপলা ফুলগুলোর ওপর দলছুট এক আধটা মৌমাছি ভন্‌ভন্ করে, কামরাঙার ডালে বসে টুনটুনি লেজ নাচায় আর মাঝে মাঝে সরসর করে এক-আধটা কাঠবেড়ালী ছুটে পালায় হারমোনিয়াম রিডের মত শুকনো পাতার ওপর শব্দের ঢেউ তুলে। বিকেলে এই নির্জন

পরিবেশে গা ধুতে আসে লক্ষ্মী। রোজ, প্রতিদিন। একা একা এই প্রকৃতির কোলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বড় ভালো লাগে ওর। এই পুকুরে এলেই ও একা নিজেকে খুঁজে পায়। নিজের কথা ভাবতে পারে, নিজেকে দেখতে পারে বা কোন কিছু না ভেবে না করে চুপচাপ গলা জলে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণও করতে পারে। মাঝে মাঝে কোন কিছু না করা না ভাবাতেই সত্যিকারের শান্তি খুঁজে পায় লক্ষ্মী।

সেদিনও এমনি এক গতানুগতিক অপরাহ্নে স্নানে এসেছিল লক্ষ্মী। ভিজে চুল পিঠময় ছড়িয়ে একটা শাপলা ফুলের ডাঁটি দাঁতে কাটছিল অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ চোখে পড়ল হাত-পাঁচেক দূরে একটা পানকৌড়ি। এখানে পানকৌড়ি! এই প্রথম দেখল লক্ষ্মী। হঠাৎ ছেলেমানুষী পেয়ে বসল লক্ষ্মীকে। ডুব দিয়ে ঠিক ওটার নিচে উঠে ধরা যাক না পাখিটাকে! চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? টুপ করে ডুব দিল লক্ষ্মী। জলের নিচে থেকে ভেসে যখন উঠল লক্ষ্মী তখন শুধু পানকৌড়ি নয়, গা থেকে কাপড়টাও কোথায় খুলে ডুবে গেছে। খোলবার সময় টের পেয়েছিল লক্ষ্মী, কিন্তু তখন আর পায়ের কাছ থেকে সরে যাওয়া আঁচলটা ধরা সম্ভব ছিল না, কেননা দম ফুরিয়ে আসছিল ওর। এখন! চানের জন্য লক্ষ্মী যখন আসে, তখন আবার অন্তর্বাসের ঝামেলা রাখে না।

এক কাপড়েই চলে আসে। কিন্তু এখন কি করে ও! ঘোলা জল ওর লজ্জা ঢেকে রেখেছে, তবুও কি লজ্জা, কি লজ্জা! এখন কেউ দেখে ফেললে আত্মহত্যা করতে হবে ওকে। পর পর ডুব দিয়ে কাপড় খুঁজতে থাকে লক্ষ্মী। ভয়ে লজ্জায় হাত পা জমে যাচ্ছে। শুকনো কাপড়ও ছাই ঘাটে আনে নি যে, কোনরকমে চোখ বুজে গায়ে জড়িয়ে পালাবে ও। মধুসূদন রক্ষে করো ঠাকুর, কাপড়টা আমায় পাইয়ে দাও, নইলে এই পুকুরে ডুবেই মরব আমি।

ডুবে ডুবে চোখ লাল হয়ে উঠল, গায়ের চামড়া খরখরে হয়ে গেল, আঙুলগুলো সিঁটিয়ে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মীর বিশ্রাম নেই। ভগবান এইবার ডুব দিয়ে যেন পাই, বলে লক্ষ্মী ডুব দিল, আর উঠল একহাতে আঁচলটা ধরে। উঃ! পাওয়া গেছে। প্রাণ ফিরে পেলো যেন লক্ষ্মী। মনে মনে ভগবানকে অজস্র প্রণাম জানিয়ে ওপারে সাঁতরে এল। পায়ের নিচে মাটি পেতে খানিকটা উঠে হাঁপাতে লাগল। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই। সারা শরীর হিম হয়ে গেল লজ্জায়। কামরাঙা গাছটার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ। চোখে চোখ পড়তেই সে পেছন ফিরে হন্‌হন্ করে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ নিজের দিকে তাকাল লক্ষ্মী। মরণ! কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে, আর জটপাকানো কাপড়টা হাতে ঝুলছে। নিজেকে এমন করে আর কোনদিন দেখে নি লক্ষ্মী।

ও, মাগো—বলে ও জলে ডুব দিল লজ্জা বাঁচাতে, উঠল গিয়ে গলা জলে। তারপর সে অবস্থায় কোনমতে কাপড়টা পরে চলে এলো বাড়িতে।

এসেই বিছানা নিলো। বালিশ থেকে মুখ তুলতে পুকুরের দৃশ্যটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। চোখ বুজে থাকে ও। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে! এমন বিড়ম্বনা মানুষের হয়? পুরুষটি যে কে তা ভাল করে দেখে নি লক্ষ্মী, ওর তখন কি আর তাকিয়ে দেখবার অবস্থা! গ্রামের কোন চেনা লোক না ভিন্ দেশী কেউ, কে জানে। ভিন্‌দেশী হলেই রক্ষে, অন্তত ফের দেখা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

কিন্তু গোকুল বদ্ধপরিকর। এই মেয়েকেই বিয়ে করবে ও।

মেয়ে দেখবার জন্য কনকপুর যাচ্ছিল গোকুল বন্ধু গৌরাঙ্গকে নিয়ে। রাস্তায় পলাশপুরে এক জায়গায় কাদায় পা নোংরা হয়ে গেছে ওর। গৌরাঙ্গ বলল, ঐ

আমবাগানে একটা পুকুর আছে, যা গোকুলে পা'টা ধুয়ে আয়। গোকুল চলে যেতে গৌরাঙ্গ গাছতলায় বসে বসে বিড়ি ফুঁকছিল।

বেশ-খানিক বাদে গোকুল ফিরে এল হন্‌হন্‌ করে। আর অবাক হয়ে দেখল গৌরাঙ্গ, পায়ে যেরকম কাদা ছিল, সেই রকমই আছে।

কি রে? পা ধুলি না?

না।—তারপর খানিক বাদে প্রশ্ন করে গোকুল,—আচ্ছা ঐ আম-বাগানের শেষে ভাঙা বাড়িটা, ওটা কাদের জানিস?

নিশ্চয়ই। ওটা হাজরার বাড়ি। গুণময় হাজরার।

হুঁ। ওঁর মেয়ে আছে বিয়ের যুগ্যি?

মেয়ে? বিয়ের যুগ্যি? ও হো, বিয়ের যুগ্যি বোধহয় ওর ছোট মেয়েটা হয়ে উঠেছে। কেন?

চল্‌।—গোকুল নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে।

কিন্তু এদিকে কোথায়?

বাড়ি ফিরে যাবো।

বাড়ি ফিরে যাবি? মেয়ে দেখবি না?

মেয়ে দেখেছি।

দেখেছিস?

হ্যাঁ। ঐ গুণময় হাজরার মেয়েকেই আমি বিয়ে করব। চল, কথাবার্তা বলতে বাবাকে পাঠিয়ে দেবো। ওঠ্‌—

হতভম্ব গৌরাঙ্গ বলল, কিন্তু—

কিন্তু-টিন্তু না, চল্‌—বলে সোজা বাড়িমুখো হাঁটতে শুরু করল গোকুল।

এসব লক্ষ্মীর অদৃষ্ট ছাড়া আর কি। নইলে ডানকুনির জাঁদরেল জমিজমার মালিক নকুল মল্লিকের ছেলে গোকুলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়।

সমস্ত খরচ বহন করলে গোকুল নিজে। গ্রামের সবাই বললে, লক্ষ্মীর কপাল ভালো, সার্থক ওর নাম।

বিয়ের রাতে লজ্জায় আনন্দে মুখ তুলতে পারছিল না লক্ষ্মী। কিন্তু জোর করে মুখের কাপড় সরিয়ে বলেছিল গোকুল, কি বৌ, মুখ তুলতে লজ্জা, মুখ দেখাবে না?—তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, যা দেখবার তাতো আগেই—

দু'হাতে কান চাপা দিল লক্ষ্মী। মা গো, ছেলেরা এত অসভ্যও হয়!

পৃথিবী ভারি সুন্দর লাগছিল লক্ষ্মীর কাছে। একটা বছর কাটল যেন স্বপ্নের মত। প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী আছে গোকুলের। দুঃখে-কষ্টে দরিদ্র সংসারের মানুষ লক্ষ্মী, এত সুখ ঐশ্বর্য পেয়ে আনন্দে চোখে জল আসে। এত সুখ কি সইবে?

সত্যি সইল না।

দেড়বছর কাটার পর ক্রমে চাপা গলায় আলোচনা শুরু হল দু'বছর কাটার পর ভাতের থালায়, পুকুরঘাটে, মেয়েলী জটলায় বিষয়টা উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠল। প্রথমে শুনে অবিশ্যি ভয় পেয়েছিল লক্ষ্মী, কিন্তু স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু দু'বছর পর ওর নিজের মধ্যে একটা আতঙ্ক ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অত্যাচার। বৌ বাঁজা। শাশুড়ী প্রথমে অত্যাচার শুরু করলেও তাগাতাবিজ পুজো-মানত চালু করলেন। কিন্তু তিন বছর কাটার পর শুরু হল সত্যিকারের অত্যাচার। অলুক্ষুনে বৌ, তাঁর সোনার-টুকরো ছেলেকে ফাঁদ পেতে ধরেছে, সোনার সংসার জ্বালিয়ে দেবে এ বৌ। শাশুড়ীর শাপশাপান্তর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মেয়ে খোঁজা। ছেলের ফের বিয়ে দেবেন

তিনি, বংশ নির্বংশ হয়ে গেলে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি ঘটতে পারে না।

সবকিছু'র মধ্যে লক্ষ্মীর একমাত্র ভরসা ছিল স্বামী গোকুল। কিন্তু ক্রমে লক্ষ্য করল লক্ষ্মী, গোকুলও বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। যেটুকু সর্বনাশ বাকী ছিল সেটুকু করে দিলেন এক জ্যোতিষী। শাশুড়ী খুব আশা নিয়ে বৌ'এর হাত দেখালেন, কিন্তু জ্যোতিষী মাথা নাড়লেন, সন্তান সম্ভাবনা নেই, নিষ্ফলা মেয়ে লক্ষ্মী। জ্যোতিষী, শুধু হাত দেখেই গেল না, ঘটকালী করেও গেল। গোকুলের মাকে খবর দিয়ে গেল সর্বগুণসম্পন্না লক্ষ্মীমন্ত এক মেয়ের, গোবিন্দপুরের নটবর দাসের মেয়ে চাঁপা। যাবার আগে বলল, যদি বলেন মা, তবে কথা বলি।

গোকুলের মা তৎক্ষণাৎ রাজি।—মেয়ে দেখতে চাই না জ্যোতিষ-ঠাকুর শুধু ভালো সন্তানবতী মেয়ে চাই আমি। নটবর দাসের মেয়ে যদি তাই হয়, তবে পাকা কথাই বলে দিন তাদের। এই অঘ্রানেই আমি ছেলের বিয়ে দেবো।

কাঠের মত দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল লক্ষ্মী। আর পারল না, দুম করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

শাশুড়ী মুখিয়ে উঠলেন, যত সব ভড়ং!

রাত্তিরে গোকুল বলল, তুমি এখানে থাকতে না চাও বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারো, মাসে মাসে খরচ পাঠাব আমি।

কি? হিংস্র আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল লক্ষ্মী।—তুমি আবার বিয়ে করবে?

না করে যে উপায় নেই লক্ষ্মী। বংশ তো নির্বংশ হতে দিতে পারিনে।

বংশ!—দাঁতে দাঁত ঘষল লক্ষ্মী।—তারপর বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল গোকুলের ওপর। গোকুল তৈরী ছিল না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ও। আর লক্ষ্মী দু'হাতে খামচে সারা শরীর রক্তাক্ত করে ফেলল গোকুলের, হ্যারিকেনটা তুলে প্রচণ্ড জোরে মাথায় মারতেই পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল গোকুল। চিৎকার শুনে চাকরেরা, মা সবাই ছুটে এল। দরজা ভেঙে ঢুকতে হল ওদের। অনেক কষ্টে লক্ষ্মীর হাত থেকে ছাড়াল গোকুলকে।

মা প্রায় মরাকান্না জুড়ে দিল সেখানেই। গোকুল চুপ। লক্ষ্মী কোনরকমে কাপড়টা সামলে নিয়ে দাঁড়াল। তারপর গোকুলকে বলল ভয় নেই। আমি যাচ্ছি। এই মারে তুমি মরবে না। যা একটু কেটে ছড়ে গেছে নতুন বৌ'র যত্নে সব ঠিক হয়ে যাবে। বলেই বেরিয়ে পড়ল লক্ষ্মী।

তারপর পলাশপুরে পৌঁছে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল ও। সব শুনে মা কিছু বললেন না। গুণময় হাজরার হাঁপানির কাশি বেড়ে গেল শুধু। বুড়োর শরীর ভেঙে পড়েছিল মাসখানেক মধ্যে। একদিন হাঁপানির দমকে হঠাৎ নেতিয়ে পড়ল দাওয়ায়। আর উঠল না।

লক্ষ্মী হাসি ভুলে গিয়েছিল অনেক দিন। বাপের মৃত্যুর পর কথা বলতে ভুলে গেল। পাষাণ প্রতিমার মত চুপ করে সারাদিন বসে থাকে। খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি। মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সান্ত্বনার ভাষা কোথায়!

গোকুল একেবারে নেমকহারাম নয়। লক্ষ্মী এখানে আসবার পরের মাসে ও মনিঅর্ডার করে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিল। লক্ষ্মী টাকা ফেরত পাঠিয়েছে। তারপর মাসখানেক বাদে এক বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পাওয়া গেল। আঠারই অঘ্রান গোকুলের বিয়ে নটবর দাসের মেয়ে চাঁপার সঙ্গে। আর সতেরই ঘটল অঘটন।

অঘটন কি?...ঘাট থেকে বাসন নিয়ে উঠে আসছিল লক্ষ্মী। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, দুম করে পড়ে গেল ও। আর তক্ষুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। লক্ষ্মীর মা-ভাইরা মাথায় জল ঢেলে হাওয়া করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারল না। শেষ পর্যন্ত

ডাক্তার ডেকে আনল ওরা। ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বলল, সামান্য আঘাত, দুর্বল শরীরের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। একটা ইনজেকসান দিতেই জ্ঞান ফিরে পেল লক্ষ্মী।

যাবার আগে ডাক্তার চুপি চুপি লক্ষ্মীর মাকে জানিয়ে গেল—শরীরের যত্ন নেবেন মেয়ের, ভাল খেতে দেবেন। এই সময়ে ভালভাবে রাখতে হয়।

এই সময়ে?

হ্যাঁ, ওর বাচ্চা হবে। মাস দুই হয়েছে মনে হয়।

ডাক্তারবাবু!...

আনন্দে না দুঃখে কে জানে, মা কেঁদে ফেললেন। নারায়ণ শিলার নিচে জমানো তিনটে টাকা এনে ডাক্তারকে দিলেন মা।

আজ আঠারই অঘ্রান। গোকুলের বিয়ে। লগ্ন সাড়ে আটটায়। বর রওনা হবে পাঁচটায়। কিন্তু পাঁচটার আগে পৌঁছুতেই হবে ডানকুনি। বন্ধ করতে হবে এ বিয়ে। সমস্ত কুৎসা, কলঙ্ক, ভণ্ড জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সবকিছুর জবাব লক্ষ্মীর নিজের শরীরে। সন্তান তো নয় যেন, স্বপ্ন, সুখ, শান্তি। তার নিজস্ব পৃথিবীর অধিকার এই সন্তান। তার জিয়নকাঠি, তার বাঁচবার ছাড়পত্র। তাই ভয়, যদি পৌঁছুতে পৌঁছুতে গোকুল রওনা হয়ে গিয়ে থাকে। যদি, না, না, সে কিছুতেই হতে দেবে না লক্ষ্মী, কিছুতেই না।

উঃ, ডানকুনি যে আসছেই না।

মা, ডানকুনি আর কত দূর? আমার যে ভয় কাটছে না!

আর একটা স্টেশন, লক্ষ্মী।—ধীরে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন মা।

গাড়ি ছুটে চলেছে। দু'পাশে ঢেউ খেলিয়ে সরে যাচ্ছে টেলিগ্রাফের তার। খুঁটির ওপর কোথাও শান্ত চিল বসে আছে, কোথাও ফিঙে দম্পতি। চোখ কচলে ভালো করে তাকালাম। দিগন্তবিসারী ধানক্ষেতের শেষে ছোট ছোট গ্রামের স্কেচ। আর তার ওপারে অস্তগামী সূর্য। অপরাহ্নের কমলা রোদ মাঠের সবুজকে প্রসারিত করেছে। মেঘের প্রান্তে প্রান্তে রূপোলী জরির কাজ। ভারি সুন্দর বিকেল!

ভেতরে তাকালাম। লক্ষ্মী চুপ করে বসে আছে। হয়তো ভাবছে প্রথম পুকুরের সেই লজ্জা পাওয়ার কথা, নাকি শেষ রাতের ঝগড়ার ছবি ভেসে উঠেছে ওর মনে। কে জানে। মনে মনে কামনা করলুম, ও যেন ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারে ডানকুনি। ওর যাত্রা যেন শুভ হয়।

ডানকুনি।

তিনজন হোমগার্ড উঠল কামরায়। লক্ষ্মী আর ওর মা নেমে যাচ্ছিল ওদের পাশ কাটিয়ে। প্রথম দু'জন কিছু বললে না। কিন্তু তৃতীয়জন খপ্ করে লক্ষ্মীর হাত ধরল।

এই পেটে কি তোর?

এত বড় আস্পর্ধা! হিংস্র রাগে রি রি করে উঠল শরীর। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি।

মুখ সামলে কথা বলবেন, চেঁচিয়ে উঠলাম, ভদ্র মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলতে জানেন না?

হোমগার্ডটা আমার মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেল। পরমুহূর্তে হেসে বলল, দাদার খুব চোখে ধরেছে, না? তাই ভদ্র মেয়ে হয়ে গেছে এছুঁড়ি।—বলেই খপ্ করে ওর বুকের মধ্যে দিয়ে পেটে হাত চালিয়ে দিল লোকটি। এক লাফে সামনে চলে এলাম

আমি।

কিন্তু একি, পেটের কাপড়ে টান পড়ায় ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল চাল।

চাল ?—বোকার মত তাকিয়ে রইলাম আমি।

হ্যাঁ দাদা, চাল। চোরাই চালান করে এই মাগীগুলো। এরা এই রকম মেক্-আপ নিয়ে চোরাই চালের কারবার করে, কিন্তু আমাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সোজা কথা নয় দাদা। দেখুন, ঠিক ধরেছি কি না। এই, চল্ চল্ শ্বশুরবাড়ি।—ধাক্কা দিতে থাকে লক্ষ্মীকে হোমগার্ডটা।

দোহাই বাবু, এইবার ছেড়ে দে, তোর পায়ে পড়ছি বাবা—লক্ষ্মী অনুনয়ে ভেঙে পড়ে।

ছেড়ে দেবো কিরে ? ডেলিভারি হয়ে গেল, এখন কিছুদিন হস্‌পিটালে থাকবি না ?

টানতে টানতে নামিয়ে নিয়ে গেল ওকে। সারা ট্রেনে কদর্য অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু আমার কানে যেন কিছুই ঢুকছিল না। শুধু সুদূর কোন দ্বীপের বাঁশীর মত অর্ধস্ফুট স্বরে শুনতে পাচ্ছিলাম,

মা, ডানকুনি আর কতদূর মা ?

ডানকুনি আর কতদূর ?...

।। বিপরীত চৌধুরী ।।

বিপরীত চৌধুরীর গল্প শুনিয়েছিলেন মিস্টার মিত্র। মিস্টার মিত্র, যাঁর পুরো নাম শশধর মিত্র, বম্বের বি, বি, সি, আই রেলওয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কি করে বিপরীত চৌধুরীর কথা উঠল সেটা বলতে গেলে একটু ভূমিকার প্রয়োজন। গোড়া থেকেই শুনুন তা'হলে ঃ

উইলসন ড্যাম গিয়েছিলাম আমরা আউটডোর সুটিং করতে। উঠেছিলাম ড্যামের ওপর চমৎকার বাংলো বাড়িতে, যেটাকে বলা হয় ফার্স্টক্লাস বাংলো। ফার্স্টক্লাস বাংলো সত্যি ফার্স্ট ক্লাস। একদিকে শান্ত গরুর চোখের মণির মতো কাজল কালো ভরপেয়ালা জল আর অন্যদিকে পাগলা ষাঁড়ের খেপামির মতো গর্জনমন্দ্রিত প্রস্রবণ। মাঝখানে এক বাগান ফুলের হাসি নিয়ে সুন্দর এই বাংলোটা। এখানে উঠে প্রথমেই আলাপ হল বাংলোর প্রতিবেশী মিঃ মিত্রের সঙ্গে। সাত দিনের ছুটি নিয়ে কর্মব্যস্ত বম্বে থেকে পালিয়ে এসেছেন বিশ্রামের আশায়। প্রথম দিন শুধু মৌখিক আলাপ হল। নিজেদের জিনিসপত্র গুছোতেই অর্ধেক রাত্রি গড়িয়ে গেল, তখন কারুর সঙ্গে গল্প করবার অবস্থা নয়। পরদিন সকালেই সুটিং-এ বেরিয়ে পড়লাম আমরা। মিঃ মিত্র তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। সকালে যখন বেরোলাম তখন পরিষ্কার আকাশ ছিল, কিন্তু যে-ই লোকেশানে গিয়ে ক্যামেরা সাজিয়ে বসলাম, অমনি হঠাৎ একরাশ মেঘ এসে ঢেকে দিল আকাশ। রোদ্দুরের আশায় বসে রইলাম আমরা। এক একবার মনে হচ্ছিল মেঘ কেটে গেল বুঝি। একটা দুটো রিয়ার্সালও হয়ে গেল, কিন্তু এক মিনিটের জন্য সূর্য একগাল হেসেই মেঘের ঘোমটা টেনে ফের চোখ-আড়াল। সারাদিন কেটে গেল অমনি। আমাদের প্রতীক্ষা বৃথা গেল। একটা শটও নিতে পারলাম না। হতাশ হয়ে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ফিরে এলাম আমরা। তখন সন্ধ্যার শাড়িতে তারার চুমকি বসানো শুরু হয়ে গেছে। অস্পষ্ট একটা কুয়াশা সদ্যসজল চাউনির মতো ঝাপসা করে দিচ্ছে সব কিছু। বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজ বাতাসে। যে যার ঘরে গিয়ে প্রথমেই ভালো করে চান করে নিলাম। তারপর বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে গুলজার হয়ে বসলাম সবাই চা নিয়ে। এমন সময়ে মিঃ মিত্র তাঁর রিলে গাড়ির সর্বাঙ্গে ধুলো ছিটিয়ে এলেন কোথাও থেকে। আমাদের পরিচালক—মিঃ পরাঞ্জপে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন—এই যে মিঃ মিত্র আসুন, কোত্থেকে এলেন ?

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন মিঃ মিত্র—গিয়েছিলাম রান্‌ধা ফল্‌স দেখতে। তারপর, আপনাদের সুটিং কেমন হল ?—মিঃ মিত্র এসে আয়েশ করে বসলেন একটা চেয়ার টেনে।

আর বলবেন না। সুটিং করতে পারলাম না আজ!

কেন ?—মিঃ মিত্র চুরুট ধরালেন।

পরাঞ্জপে হেসে তাঁর স্ত্রীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—এঁর জন্যে।

সবাই হেসে উঠলেন। মিঃ মিত্র কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। পরাঞ্জপে স্ত্রীকে বললেন, বলো না, মিঃ মিত্রকে তুমিই বলো।

মিসেস পরাঞ্জপে কপট রাগে স্বামীর দিকে কটাক্ষ হেনে বললেন, সকাল থেকে আমাকে খেপাচ্ছে দেখো না। জানেন মিঃ মিত্র, কাল সারাদিন মেঘলা গেছে। বিকেলে যখন আমরা বেরুচ্ছিলাম তখন ক্যামেরাম্যান মিস্টার গুঞ্জন বলেছিলেন, কাল যদি এমনি ওয়েদার থাকে তাহলে তো সুটিং করার বারোটা বেজে যাবে। কথা শুনে সবাই কেমন একটু ভাবনায় পড়ে গেল। তখন আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম,—আমি বলছি কাল মেঘটেঘ থাকবে না, কালকে একেবারে চনমনে রোদ থাকবে, ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু আজ তার উল্টো হয়েছে। রোদ দূরে থাক কালকের চাইতে বেশী মেঘ ছিল আজ। ওদের সুটিং সব মাটি। সেই থেকে ওদের ইউনিটসুদ্ধ আমাকে গঞ্জনা দিয়ে চলেছে। আমি বলেছি বলেই নাকি উল্টো হয়েছে। সবাই আরেক প্রস্থ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম। মিঃ মিত্র হাসলেন না। চুরুটে লম্বা একটান দিয়ে বললেন, আশ্চর্য, মানুষ যে কত বিচিত্র হয়। সবাই চুপ করে মিঃ মিত্রের কথার মানে বোঝার চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত, নায়িকা শীলাবতী প্রশ্নই করে বসলেন, আপনি হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেলেন যে! সিরিয়াস? মিঃ মিত্র বললেন, না সিরিয়াস নয় হঠাৎ পুরনো একজনের কথা মনে পড়ে গেল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে না, কিন্তু সব সত্য। তাই বলেছিলাম, মানুষ কত বিচিত্রও হয়। রিয়েলী, ইট ইজ এ স্ট্রেঞ্জ স্টোরী।

স্টোরী,—মিঃ পরাঞ্জপে বললেন, বলুন না যদি আপত্তি না থাকে। উই উইল এনজয় ইট।

মিঃ মিত্র জবাব দিলেন না। চোখ বুজে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন ঃ

তার নাম ছিল বিপরীত চৌধুরী।

বলে সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেন মিঃ মিত্র।—অদ্ভুত নাম, তাই না? না, এটা ওর আসল নাম নয়, এ নামকরণ পরে করা হয়েছিল। আসল নাম ছিল রমেন চৌধুরী। কিন্তু এ নাম বলতে গেলে কেউই জানতো না। কিন্তু বিপরীত চৌধুরী বললে এক ডাকে সারা হাটখোলা চিনত। এ নামকরণের, বলা বাহুল্য, কারণ ছিল। সব সময়ে দেখা গেছে সে যা হবে বলে ঘোষণা করত, ঠিক তার উল্টো হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই নাকি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেছে। ফুটবল ম্যাচে বিপরীত চৌধুরী যে দল জিতবে বলত অপরপক্ষে সে ম্যাচে নিঃসন্দেহে জয়ী হত, ইলেক্শনে যাঁর নাম করত, দেখা যেতো অতিরিক্ত কম ভোট পাওয়ায় সে বেচারার জামানত জব্দ হয়ে গেছে। হাটখোলার প্রিয়নাথ কেবিনের চেহারা আন্দাজ করতে পারেন। চার পাতার দৈনিক, হাতলভাঙা কাপ, ছাতাধরা কেক, তেঠেঙ্গে টেবিল আর শুঁড়ভাঙা গণেশ। এখানে বসেই আমরা রাজাউজীর মেরেছি, রেসের টিপস নিয়ে গজল্লা করেছি, আর মাপ করবেন, ফিল্মের অভিনেত্রীদের স্যাণ্ডাল আউড়েছি। এক কথায়, পাড়ার রেস্তোরাঁয় যা হয় প্রিয়নাথ কেবিনে ঠিক তাই হত। এখানে আমরা রাত্তিরে দরজা এঁটে ফ্লাশও খেলেছি। বিপরীত চৌধুরী এ দলের একজন সভ্য।

ফ্লাশে বরাবর ও হারতো না তবে যা বলতো তার উল্টোটাই সচারচর ঘটত।

যখন ব্লাইণ্ড চাল চেলে বলতো,—এই জগার কাছে নির্ঘাত বাদশার পেয়ার, দেখা যেতো জগার তাস বাজে, কিন্তু রবীনের হাতে বিবির পেয়ার, যদিও কাটায় কাটায় বাদশা নয়। বলা বাহুল্য, সে বোর্ড রবীনই পায়। নামটা ক্রমশ যেন বেশী করে খাপ খেয়ে

যাচ্ছে। দিনকে দিন বিপরীত চৌধুরীর নাম জানল সবাই। সবাই জানে পয়সা দিয়ে হেড টেল করলে বিপরীত চৌধুরী যা বলবে তা কক্ষনোই হবে না। শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে গেল যে, আমরা যে কোন ব্যাপার সমাধান করতে হলে বিপরীত চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করতাম। যুদ্ধে কে জিতবে, মল্লিক আর রায়েদের মামলায় কে জিতবে, সাহাদের মেয়ে মণিকার বিয়ে রতন দত্তের সঙ্গে হবে কিনা, টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতবে কি এম সি, সি, ইত্যাদি যতরকম প্রশ্ন সম্ভব। অবাক কাণ্ড—বিপরীত চৌধুরী যা বলতে লাগল উল্টোটা ঠিক ঠিক ঘটে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চৌধুরী নিজে খেপে গেল। একটা অন্ধ ভয় বাসা বাঁধল ওর বুকে, তাবে কি সত্যি ওর জিভ এমন, এমন অপয়া ও। রুদ্ধ আক্রোশে বিপরীত চৌধুরী ক্রমে তিরিক্ষি মেজাজী হয়ে উঠল। একদিন গজাননের টুঁটি চেপে ধরেছিল বিপরীত চৌধুরী বলে খেপানোর অপরাধে। অনেক কষ্টে ছাড়ানো হয় ওকে।

ব্যাপারটা আমার ভালো লাগল না। এ সব ধারণা মিথ্যে। নেহাতই ঘটনাচক্রে এভাবে বেচারীর কাঁধে চাপিয়ে ভুল একটা বিশ্বাসের শেকড় গাড়াতে আমার ভয়ানক আপত্তি। মজার ছলে আমি যে খেপাতাম না তা নয়, আর এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে বলে অবাক হতামও একটু, তবে ব্যাপারটা আমি কখনো সিরিয়াসলি নিই নি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম বিপরীত চৌধুরী সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। বিপরীত চৌধুরীকে আমি একটু বেশীই ভালবাসতাম বোধ হয়। তাই অন্য বন্ধুদের উদ্বিগ্ন না করলেও আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলল।

দুর্ভাবনা বেড়ে গেল যেদিন বিকেলে উস্কুখুস্কু চুলে এসে ও হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল আমার ঘরে।

কি ব্যাপার চৌধুরী ? কি হয়েছে ?—আমার স্বরে রীতিমতো উৎকণ্ঠা।

আর সহ্য হচ্ছে না মিত্তির, তুই একটা উপায় করে দে ভাই, নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

পাশে বসিয়ে আমি সমবেদনায় হাত রাখলাম পিঠে, খুলে বল ভাই কি হয়েছে ?

আজ,—বলতে গিয়ে দু'চোখ জলে ভরে এল বিপরীত চৌধুরীর।—আজ আমি বাসন্তীর গায়ে হাত তুলেছি।

হাত তুলেছিস ?—আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। বাসন্তী চৌধুরী ওর স্ত্রীর নাম। শুধু স্ত্রীর নাম বললে কিছু বলা হয় না, বাসন্তী ওর সব কিছু। ভালবাসতে অনেক দেখেছি, কিন্তু চৌধুরী বৌকে যেমন ভালবাসতো সে ভালবাসা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে ভালবাসার কাছে ভালবাসা কথাটা যেন বিদ্রূপ বলে মনে হতো। সেই বাসন্তীর গায়ে হাত তুলেছে বিপরীত চৌধুরী কতখানি ক্রোধে এই অসম্ভব সম্ভব সে শুধু আমিই জানি। অনেকক্ষণ চুপ করে ওর নিঃশব্দ কান্না দেখলাম। তারপর বললাম,—কেন, কেন তুই—

জানিস মিত্তির,—বাধা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিপরীত চৌধুরী,—বাসন্তী পর্যন্ত আমাকে মনে করে আমি, আমি অলক্ষুনে। আমার জিভ দিয়ে যা বেরোয় তার উল্টোটাই হয়, আমি অপয়া। আমাকে এই মিথ্যে অপবাদ থেকে বাঁচা ভাই, নইলে আমি এই কলঙ্কের অশান্তিতে জ্বলে যাবো, মরে যাবো আমি।

ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা জানাল বিপরীত চৌধুরী। ওদের একমাত্র সন্তান চার বছরের মেয়ে রুমার খুব জ্বর হয়েছে। বাড়িতে গিয়ে অমন জ্বর দেখায় চৌধুরী নিজেও দুর্ভাবনায় পড়েছিল। কিন্তু বাসন্তীর দুশ্চিন্তা আরো বেশী।

জ্বর যে বাড়ছে, কি হবে, হোমিওপ্যাথী ওষুধে হবে না, তুমি বড় ডাক্তার ডাকো,—অনুনয় জানালো বাসন্তী।

অত ভাবনার কি আছে। দেখো না, সবে তো ওষুধ খেয়েছে—চৌধুরী আশ্বস্ত করে।

না, আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে।—বাসন্তীর ভাবনা কমে না।

আমি বলছি ভালো হয়ে যাবে, বিশ্বাস করো, চিন্তা করবার কিছু নেই।

আর যাবে কোথায়! হঠাৎ সামনে যেন যমদূত দেখেছে এমনি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল বাসন্তী। দু'হাতে রুমাকে টেনে নিল কাছে, নইলে যেন চৌধুরী ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর হিস্টিরিয়া রোগিনীর মত বলে উঠল,—তুমি বলছ ভালো হবে, তুমি বলছ? মারবে, মেরে ফেলবে তুমি, রুমাকে, তোমার মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে তখন আর রক্ষে নেই। দূর হও, দূর হও তুমি সামনে থেকে।—উঃ, সে কি চিৎকার। আর সহ্য করতে পারে নি চৌধুরী। প্রচণ্ড জোরে এক চড় কষিয়েছে বাসন্তীর গালে। তারপর বাসন্তীর আতঙ্কে বিস্ফোরিত চোখের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।

সমস্ত কাহিনী শুনে একটা শীতল ভয়ের ঢেউ খেলে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। ক্রমশ ব্যাপারটা ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সন্দেহ নেই। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে কে জানে, এ বিশ্রী সন্দেহের আওতা থেকে বাঁচাতে হবে ওকে। অনেক ভেবে বললাম,—এই বাজে ধারণাকে দূর করতে গেলে প্রমাণ দিতে হবে। সবার কাছে এমন প্রমাণ দেখাতে হবে যে তুই যা বলিস তার উল্টো হয় না একবার দু'বার যদি দেখানো যায় ঠিক হয়, বৎস, তখন এই মিথ্যে কলঙ্কের মেঘ কেটে যাবে।

কিন্তু—

কিন্তু-টিন্তু নয়, আশ্বাস দিলাম আমি,—এমনি কয়েকটা প্ল্যান করতে হবে যাতে তুই যা বলবি তা হবেই হবে।—বেশ খানিকক্ষণ পায়চারি করলাম আমি।—দি আইডিয়া, চেঁচিয়ে উঠলাম—সিলভার উইংস।

সিলভাব উইংস? চৌধুরী ধরতে পারল না।

হ্যাঁ, সিলভার উইংস। এ রোববারের রেসে সিলভার উইংস প্রিন্সেপ প্লেটে সিওর উইন। এ টিপস একেবারে ঘোড়ার মুখ থেকে পাওয়া। রবার্টস্ সাহেবের খবর একেবারে খাঁটি। সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে কিন্তু সিলভার উইংসকে ঠেকাতে পারবে না কেউ। তুই এটা সর্বত্র প্রচার করে দে যে, তুই সিলভার উইংস ধরেছিস। ব্যস্, দেখ তোর কথা ফলে কিনা।

শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিপরীত চৌধুরীর মুখ। প্রিয়নাথ কেবিন জানল বিপরীত চৌধুরী সিলভার উইংস ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই ঠিক করল ব্লু প্রিন্সেস। হাটখোলার কোন রেস-খেলিয়ে সিলভার উইংসের নামও করল না।

রেসের দিন ঘোড়া ছুটল। সিলভার উইংস একের পর এক সবাইকে পিছে ফেলে চলল এগিয়ে। বিপরীত চৌধুরীর কি উল্লাস, ঐ উইনিং পোস্ট এসে গেল, কিন্তু একি, উইনিং পোস্টের আধ ফার্লং দূরে এসে লেজ তুলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সিলভার উইংস। এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু টেরিব্‌ল আপ্‌সেট্। গণ্ডোলা বেরিয়ে গেল আগে, বেরিয়ে গেল—সব ঘোড়া। বিপরীত চৌধুরী মাঠের মধ্যেই বসে পড়ল মাথায় হাত দিয়ে।

এরপর সাতদিন প্রিয়নাথ কেবিনের সব গল্প হল বিপরীত চৌধুরীকে নিয়ে। এরকম কাণ্ড হবে স্বপ্নেও ভাবি নি আমি। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। নতুন প্ল্যান ভাবতে শুরু করলাম আমি। ঠিক। এইবার আর হার নয়।

শোন, এবার যে প্ল্যান করেছি তাতে তোর দুর্নাম ঘুচবেই ঘুচবে।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো চৌধুরী। খুব যে বিশ্বাস হচ্ছে মনে হল না।

বললাম, আই-এফ্-এ ফাইনাল এসে গেছে। ডারহাম আর কে, আর, আর। তুই

এক কাজ কর, প্রিয়নাথ কেবিনের বন্ধুদের কাছে বল্, শীল্ড নেবে ডারহাম আর হাজরা ক্লাব, বারোয়ারীতলায়, অফিসপাড়ার বন্ধুদের বল শীল্ড নেবে কে আর আর। ফাইনালে দু'দলের একদল তো জিতবেই। ব্যস্, একদলের কাছে তোর কথা সঠিক বেরোবেই। কেমন বুদ্ধি ?

বিপরীত চৌধুরী দু'হাতে আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

সত্যি ভাই, তোর বুদ্ধির তুলনা হয় না। এইবার আমার দুর্নাম ঘুচবেই। আর ভয় নেই।—আনন্দে আবেগে চকচক করে উঠল চৌধুরীর চোখ। যেন আমি জীয়নকাঠি তুলে দিয়েছি হাতে প্রাণভোমরা কৌটো দিয়েছি ওকে।

কিন্তু এবার হিমালয়ে চিড় ধরল। আমার সমস্ত মনের জোর ভেঙে গেল। অবাক হবেন শুনে, সেই বছর ডারহাম আর কে, আর, আর দু'বার পর পর ড্র করল, আর তৃতীয়বার ঝগড়া করে খেলল না। আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনাল প্রথমবার অমীমাংসিত রয়ে গেল। খেলার নিস্পত্তি হল না।

এতবড় ধাক্কার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি, এতবড় অসম্ভাব্যতার জন্য প্রস্তুত ছিল না বিপরীত চৌধুরীও। এ যে কতবড় আত্মগ্লানি—বিপরীত চৌধুরী না হলে বুঝতে পারবেন না আপনারা। তারপর—মিঃ মিত্র থামলেন একটু—এইবার আমি গল্পের উপসংহারে চলে এসেছি।

নিবে যাওয়া চুরুটটা ধরালেন আবার মিঃ মিত্র। দুটো কাঠি নষ্ট হল। বুঝলাম, ভেতরে ভেতরে উনি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। চোখদুটো রক্তাক্ত।

এ'ও হয়তো সহ্য করতে পারত চৌধুরী। কিন্তু রুমা যখন সেই জ্বরের বিছানায় শেষ পর্যন্ত টাইফয়েডে মারা গেল তখন আর সইতে পারল না। মৃতা মেয়েকে কোলে নিয়ে নাগিনীর মতো হিংস্র চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল বাসন্তী,—তুমি ওকে মেরেছ, তুমি খুন করেছ রুমাকে।

আদালতে পরবর্তী ঘটনার সাক্ষী ওদের চাকর গোপীর জবান-বন্দীতে জানা গেছে—

কি বললি,—? বিপরীত চৌধুরীর চোখ ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝলসে উঠল,—আমি খুন করেছি? আমি? না, করি নি। আমি রুমাকে খুন করি নি। তবে করব, তোকে। এই হাত দিয়ে খুন করবো তোকে। পৃথিবীর কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। কেউ না। আমার কথা এইবারে ফলবে।—

এক লাফে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসন্তীর ওপর। দু'হাতে টিপে ধরল ওর গলা।

জেনে যা, আমি যা বলি তা-ও ফলে, তা-ও ঠিক হয়। আমি বলেছি তোকে খুন করব, এই করছি খুন। প্রমাণ দিচ্ছি আমার কথাও সঠিক হয়, আমার মুখে যা বেরোয়, তার উল্টোই শুধু ঘটে না। একবারের মতো অন্তত আমার কথা ফলেছে জেনে মর, আমার এ অপবাদ, এ দুর্নাম মিথ্যে।

বাসন্তীর চোখদু'টো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, সেই যন্ত্রণাময় চাউনি একসময় নিথর হয়ে গেল। চাকর বন্ধ দরজার বাইরে অবিরাম করাঘাত করে যখন লোক ডেকে আনল তখন সব শেষ। কেউ একজন ডাক্তারও ডেকে এনেছিল।

চৌধুরী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল চুপি চুপি, সত্যি সত্যি মারা গেছে, না এখনো বেঁচে আছে।

পরীক্ষা শেষে ডাক্তার রায় দিল, বাসন্তী মৃতা।

প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল বিপরীত চৌধুরী। জিতে গেছি ডাক্তার। ঘুচে গেছে দুর্নাম। বেঁচে গেছি আমি। যা বলি তার উল্টো হয়, বলতে তোমার। এই দেখো, সে কথা আমি মিথ্যে প্রমাণিত করেছি। আমি বলেছিলাম, ওকে আমি খুন করব। আমি তাই করেছি। কই, এবার বাঁচাও তোমরা। উল্টোটা কেমন হয়, দেখাও।

দাঁড়িয়ে দেখছ কি, অ্যাঁ? কি, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তোমাদের? বিশ্বাস হচ্ছে না?

সে দৃশ্য আমি দেখি নি। কিন্তু যারা দেখেছে বর্ণনা করতে আজো তারা শিউরে ওঠে।—

মিঃ মিত্র চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

হ্যাঁ, যা ভাবছেন তাই। বিপরীত চৌধুরী এখন রাঁচীতে। অনেকবার ভেবেছি দেখা করতে যাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাই নি। যেতে পারিনি।

মিঃ মিত্র হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন,—মাপ করবেন। আমার একটি জরুরী চিঠি লিখতে হবে এক্ষুনি, আমি উঠছি।

তাড়াতাড়ি উঠে এলোমেলো পা ফেলে নিজের ঘরে চলে গেলেন মিঃ মিত্র। আমরা চুপ করে রইলাম।

সেই ভরাটে নিঃশব্দতার মধ্যে শুধু উইলসন ড্যাম গর্জন করে চলল একটানা।

।। টটি লেন ।।

মার্লিন হোটেল টটি লেনে।

সাডার স্ট্রীট ধরে এগোলে অনেকগুলো হোটেল পাবেন পর পর। ফেয়ার লন, অস্টেরিয়া, ওয়েজ্বুর, হোয়াইটহল, সিসিল, হলিডে আরও কত কি! কিন্তু ক্ষুদে টটি লেনে ঐ একটি মাত্র হোটেল। মিসেস্ বেরির মার্লিন হোটেল।

সারাটা দিন টটি লেন তার প্রায় নির্জন ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু নিয়ে ঝিমোয়। আর সন্ধ্যা যখন গ্যাসবাতির চোখ জ্বালিয়ে বেড়াল পায়ে এসে ঢোকে এ গলিতে, যখন মোড়ের নির্জন নিমগাছটার পাতারা দুপুরে অর্গানের সুর তোলে, তখন মার্লিন হোটেলের কতগুলো কামরার আয়না তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের দেখে। যারা গালের উপর পুরু এনামেল বুলোয়, ভুরুর অস্পষ্ট রেখাটার উপর কালো কালিমার ধনুক আঁকে, নখ আর ঠোঁটকে রক্তিম করে, নিপুণ সজ্জায় লজ্জাকে আরো সোচ্চার করে তোলে, তারপর হিল উঁচু জুতোর তবলা বাজিয়ে যারা একে একে এসে ওঠে নির্দিষ্ট গাড়িতে বা রিকশায় বা ফিটনে। টটি লেনে হয়তো একমুঠো পোড়া মবিল অয়েলের গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে ভাসবে, হয়তো ঘোড়াব পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাবে দূরে, হয়তো ঠুনঠুন রিকশাওয়ালার ঘামের দু'চার ফোটা টটি লেনের পীচের উপর পড়ে আপনাতেই শুকিয়ে যাবে কখন। তারপরই আবার একক যোগাসনে ধ্যানমগ্ন গ্যাসপোস্ট, কানা উপচানো ডাস্টবিন আর চার পাঁচটা নীল মাছির কোজাগরী, হলডেন সাহেবের লন্ড্রীতে বসে ছোকরা অ্যাংলো ছেলেটার হঠাৎ দু'চার গৎ মাউথ অরগান, আর বড় জোর, মিসেস্ বেরির চীৎকার,—আবদুল, আয়া আভিটক জেনিকো নেই লেয়ায়া? নেহি মেমসাব। তটস্থ চাকরের জবাব শোনা যাবে হয়তো। জেনি, বুড়ি বেরির নাতনী। বুড়ির যেটুকু ভালো সম্পর্ক শুধু এই নাতনীর সঙ্গে। যতক্ষণ মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবে, বুড়ি জেনিকে আদর করবে, বাইবেলের গল্প শোনাবে বা আইরীশ রূপকথা শোনাবে। বাকী সময় সারা হোটেলের বোর্ডারদের সঙ্গে ওর অভিধান বহির্ভূত গালাগালির সম্পর্ক।

শুধু ডোরা মজুমদার বুড়ির খুব পেয়ারের।

ডোরা হোটেলের একমাত্র সাউণ্ড পে-মাস্টার।

ডোরা যায় ইসমাইলের ফিটনে। একটু বেশী রাতে।

পোঁয়া পোঁয়া সন্ধ্যা যখন তারাদের গোয়েন্দা চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে ভারি কালো কম্বল টেনে ঝিম মেরে বসে এসে টটি লেনে, যখন টটি লেনে সবকটা পেরাম্বুলেটার নিয়ে ফেরা শেষ করে আয়ারা, যখন ময়দান থেকে এক ঝলক বাতাস এসে নিমগাছটাকে কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় আচমকা, আর অর্থহীনভাবে খানিকটা চেঁচিয়ে নেয় মিসেস্ বেরির অ্যালসেশিয়ান, তখন একজোড়া ঘোড়ার খুর ক্রমশ এগিয়ে আসবে টটি লেন

ধরে, মার্লিন হোটেলের সামনে কাঁচভাঙা গ্যাসপোস্টের পাশে এসে দাঁড়াবে। ধীর পায়ে উঠবে এসে মার্লিনের একমাত্র বাঙালী মেয়ে ডোরা মজুমদার। টটি লেনে ঘুরে কিড স্ট্রীট ধরে পার্ক স্ট্রীটের মুখে এসে বেরুবে ইসমাইলের ফিটন। তারপর? ময়দানের অভিসার!

ইসমাইলের ফিটনের এসব মুখস্থ। অনেক দেখেছে সে। ঘোড়াগুলো অবধি সব জানে। লড়াইয়ের বছর তাদের তো বিশ্রাম ছিল না, কিন্তু ইসমাইল জানে স্বর্ণযুগ আর ফিরে আসবে না। কোনদিন হয়তো নয়। মিসেস্ বেরির সঙ্গে বন্দোবস্তে কাজ ছাড়া এখন আর উপায় কি!

হাতে রেসের বই বা খবরের কাগজ নিয়ে ছুটোছুটি করলেও শিকার চিনতে অসুবিধে হয় না ছোকরাগুলোর। সুবিধে মতো ধীরে ধীরে এনে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, থিয়েটার রোড, হার্লিংটন রোড, রেড রোড, সারা চৌরঙ্গীর এখানে ওখানে থাকা ফিটন বা রিকশায় তুলে দেয়। পার্সেন্টেজ খারাপ পায় না ওরা। ভালো পুষিয়ে যায়।

একসময় ইসমাইলের গাড়িতেও আসে মানুষ।

ঝিমোতে ঝিমোতে চমকে ওঠে ইসমাইল কাল্লুর ডাকে।—চাচা।

হাঁ, জেগে ওঠে ও।

এক সাবকো লে আয়া।

ও জরুর। আও সাব,—প্যান্টপরা ভিতু ভিতু ছাত্র বা কোন মাঝবয়সী চৌকস অ্যাংলো, ভটা বয়সী বিশাল দেহ মাড়োয়ারী বা খুদে কোন নেপালী, সুদেহী কোন পাঠান বা গিলেকোঁচা উত্তর কোলকাতা; যেই আসুক ইসমাইলের মুখে কোন ভাববৈচিত্র ঘটে না। পরম আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে সে বলে—আও সাব, আও শেঠ আও। ডোরাও এইবার মুখ বাড়িয়ে বলবে, কাম ইন ডার্লিং, আসুন। তারপর রঙিন ঠোঁটে আগুন জ্বালানো হাসি হাসবে একটু, অর্ধেক কাজ হাসিতেই হাসিল।

এ সমস্ত প্রক্রিয়াই মুখস্থ ইসমাইলের। ওর ফিটনের সবই জানা। রোজ রাত্রির কর্মতালিকা এই।

তারপরে ক্রমে রাত গভীর হবে, ময়দানের এ রাস্তা সে রাস্তা ধীরে ধীরে চলে বেড়াবে ওর ফিটন, বাইরে অনেক রাত, লেড-ল'র ঘড়িতে নজর পড়বে দু'টো, আউটরাম ঘাটে হঠাৎ বেজে উঠবে কোন জাহাজের ভোঁ বা লঞ্চের উল্লাস, এক একা রাত জাগবে ফোর্টের ওপর লাইট পোলের রক্তিম চোখ, আর দূরাগত চৌরঙ্গীর নিওনি বিদ্যুতালঙ্কার অক্লান্ত নেচে বেড়াবে চিরযৌবনা লাস্যময়ী বাঈজীর মতো। তখন, তখন হয়তো ইসমাইলের মনে পড়বে পাঞ্জাবের কোন গ্রামে ফেলে আসা জরু আর বেটির কথা। মৃদুস্বরে গান করবে সে, কোন চটুল হিন্দী সিনেমার গান। ওর গলার দরদ বেসুরো হলেও কোন বেদনার আর্তিতে কেঁপে কেঁপে বেড়াবে ময়দানে স্নিগ্ধ বাতাসে, অলস কোন প্রৌঢ় পাতা ঝরে পড়বে কাছের গাছ থেকে, দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠতে পারে কোন ভয়ার্ত রাতকানা পাখি। তারপর চুপ, সব চুপ, চুপ চাপ অন্ধকার, আর তুষারতুহিন পাথর প্রশান্তি।

সেদিন সন্ধ্যাতেই এমন ময়দানে চলে বেড়াচ্ছিল ইসমাইলের ফিটন। কাল্লু এখনও লোক নিয়ে আসে নি। ডোরা আলতোভাবে মুখ মুছছিল আর কুশানে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছিল দৈনন্দিন আগন্তুকের। হঠাৎ কানে এলো কাতর একটা ডাক,—এই ফিটনওয়ালা, এই—আরে যা মাতাল কাঁহিকা।—ইসমাইল ওপর থেকে ধমকে উঠল।

না না, আমি মাতাল নই, মাতাল নই। একটা গাড়ি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গেছে উঠতে পারছি নি। আমাকে দয়া করে নিয়ে চলো, এই ফিটনওয়ালা।

কৌতূহল বাঁধ মানে না ডোরার। পর্দা সরিয়ে ও মুখ বাড়াল এইবার। রাস্তার ধার

ঘেঁষে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে একটা লোক। দূরের গ্যাসপোস্টের আলোতে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গলাটা, যেন কোথায়—। রোকো ইসমাইল।—ডোরা থামালো ফিটন।

দেখো তো উ ক্যা বোল্‌তা—

কুছ নেই মেমসাব, শালা মাতোয়ালা হোগা—

নেহি—দেখো না উতরকে। এইবার একটু বিরক্ত শোনাল ডোরার গলা। অগত্যা ইসমাইল নামল। গেল লোকটার কাছে। এই কেয়ারে? হুয়া কেয়া?

লোকটা কাত্‌রে কাত্‌রে আবার তার দুর্ঘটনার কথা বলল। গলাটা, গলাটা যেন—না আর ধৈর্য থাকে না ডোরার। পর্দা সরিয়ে ও আবার নিজেই নেমে এলো লোকটার কাছে। কিন্তু নিজের কিছু বুঝে উঠবার আগেই আঁতকে উঠল লোকটা, রমা, তুমি?

চমকাবার কথা ডোরারও। কিন্তু না, ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল একবার তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনি ভুল করছেন। আমি রমা নই। আমার নাম ডোরা।

তারপর ইসমাইলকে বললো, ইনকো গাড়ি পর চড়া লেও।—না না থাক। আরেকটা গাড়ি দয়া করে ভেজ দেও ফিটনওয়ালা। তা'হলেই হবে, তা'হলেই—

চড়া লেও,—কঠিন কণ্ঠে এবার বলল ডোরা। বিমূঢ় ইসমাইল এইবার ওকে প্রায় পাঁজাকোলা করে এনে ফিটনে ওঠাল।

ডোরা উঠে পর্দাটা ফেলে দিয়ে বলল, হোটেলে চল ইসমাইল। চাকা ঘুরতে শুরু করল ফিটনের।

রমা তুমি—

হ্যাঁ, আমি। অবাক হয়ো না হিমাদ্রি। কিন্তু তোমার কোথায় লেগেছে?

হাঁটুতে। বেশী জোরে মারে নি। তবে হাঁটুটা একটু মচকে গেছে আর হাত পা একটু ছড়ে গেছে। গাড়িটা ধাক্কা দিয়েই ভয় পেয়ে পালিয়েছে। তোমরা না থাকলে কতক্ষণ পড়ে থাকতে হতো কে জানে! স্কাউন্ড্রেলটার গাড়ির নাম্বারটা রাখতে পারি নি। উঃ কিন্তু রমা, এতদিন বাদে তোমাকে যে এমনি—

কী বলবে বলো—আমার প্রাণদায়িনীরূপে দেখতে পাবো ভাবি নি, —বা বলতে পার এমন ময়দানের অভিসারিকারূপে দেখতে পাবো কল্পনাই করি নি, তাই না?—কঠিন সুপুরি চিবনো হাসি হাসল ডোরা।—তারপর হিমাদ্রি, সে স্কাউন্ড্রেলটা বুঝি ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল! আর পঙ্গু করে ফেলে রেখে—হ্যাঁ!—যেন হাসির কথা বলেছে এমনি প্রায় উচ্চস্বরেই একগাল হেসে উঠল ডোরা। কিন্তু হিমাদ্রিশেখর, যে স্কাউন্ড্রেলটা লেক রোডের একটি গরীব ঘরের বালবিধবা মেয়ের ইজ্জত লুটে নিয়ে পঙ্গু করে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে কি ধরতে পেরেছিল সে?

রমা তুমি পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আমাকে একটা ট্যাক্সিতে—ওমা অমন বীরপুরুষের এত ভয়? ডোরা একটু কাছে ঘেঁষে আসে।—সেই সাহস গেল কোথায়? যে সব ছেঁদো কথা বলে আমাকে একদিন বার করে এনেছিলে নতুন স্বপ্নভরা জীবনের লোভ দেখিয়ে। এখন যে আমার সঙ্গে দু'মিনিট থাকতেই বুকের জল শুকিয়ে যাচ্ছে? দাঁতে দাঁত চাপল ডোরা, তারপর বলল, ভয় পেও না, নিজের জন্য আর কৈফিয়ত চাইব না তোমার কাছে। হোটেলে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ফার্স্ট এডটুকু করেই ট্যাক্সি দিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো তোমার সাদার্ন এভিন্যুর সাজানো বাড়িতে।

না, না—ও সব করতে হবে না তোমার। আমাকে এখানেই কোন ট্যাক্সি—

আঃ, চুপ করো। এতদিন বাদে তোমাকে পেয়েছি একটু বেশীক্ষণ কাছেও রাখতে পাবো না। একটু না হয় সেবাই করলাম। চাবুক খাওয়া মুখ করে হিমাদ্রি মাথা নিচু করে থাকে।

তারপর আমাকে পৃথিবীর মতো বিরাট গার্জিয়ানের কাছে ফেলে রেখে শুনেছিলাম বিলেত গিয়েছিলে। কাগজে পড়েছি তুমি বাংলার গৌরব হয়ে, নতুন বিদ্যাদিগ্‌গজ উপাধি-টুপাধি নিয়ে ফিরে এসেছো। ভেবেছিলাম দেখতে যাবো তোমাকে। পোষা জন্তুজানোয়ারও অনেকদিন না দেখলে মন কেমন খারাপ হয়ে যায়, দেখতে ইচ্ছা করে। আর তুমি তো ছোটখাটো জন্তুও ছিলে না।

রমা। এভাবে আমাকে অপমান করার চেয়ে—

অপমান! চোখদু'টো একবার জ্বলে উঠল ডোরার। কিছু কঠিন কথা বলতে গিয়ে অনেক কষ্টে সংযত রাখল নিজেকে। তারপর জোর করে একটু হাসি টানল মুখে।

যাক্ গে। তুমি যে রায়বাহাদুর শঙ্করজীবনের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছ সে খবরও কাগজে পড়েছি। বৌ কেমন হয়েছে হিমাদ্রি? নিশ্চয়ই সুন্দরী, মনের মতন বৌ হয়েছে, না? আমার চেয়েও রঙ ফর্সা?

কোন জবাব দিল না হিমাদ্রি।

ছেলেপুলে ক'টি?

দু'টি।—গম্ভীর গলায় জবাব এল।

ভালো।

খানিক বাদে ডোরা তাকাল হিমাদ্রির মুখের দিকে।

অমন করে আছো কেন মুখটা? হাঁটুতে এখনো লাগছে?

না। যেন বরফের ওপর দিয়ে ভেসে এলো হিমাদ্রির গলা।

টটি লেনে আবার সেই ওপচানো ডাস্টবিনের পাশ কাটিয়ে হলডেন সাহেবের লন্ড্রী ছাড়িয়ে কাঁচভাঙা গ্যাসপোস্ট ঘেঁষে এসে দাঁড়াল ইসমাইলের ফিটন।

কেন মিছিমিছি আমাকে তুমি এখানে আনলে রমা?

ভয় নেই, তোমার স্ত্রীর কানে উঠবে না। মার্লিন হোটেলের কামরায় রাত কাটাতেও বলছি না আমি! দু'এক ঘণ্টা কাটাবার কলঙ্কও জুটবে না তোমার কপালে। তোমার ফুলের মত নির্মল চরিত্রে টটি লেনের এতটুকু আঁচড়ও থাকবে না। যে ডাক্তার ডাকব, সে তোমার 'ডব্লু-আর' দেখবে না, হাঁটুই দেখবে। ইসমাইল, সাবকো মেরা কামরামে লে আও।

ফোন করতে গেলে মিসেস বেরির সপ্রশ্ন চোখের মুখোমুখি হতে হলো ডোরার। ডাক্তারকে ফোন করতে করতে জানালো ডোরা—শাঁসালো মক্কেল, মিসেস বেরির ঘাবড়াবার কিছু নেই।

আশ্বস্ত হয়ে মিসেস বেরি জানতে চান ক'বোতল পাঠাবেন ঘরে। হেসে জানালো ডোরা, ঘরে কাবার্ডে যে ক'বোতল মজুত রয়েছে, তাতেই চলে যাবে।

ডাক্তার এসে যথারীতি প্রেসকৃপশান, একটা ইনজেকশন আর পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার যেতেই ফের বলে উঠল হিমাদ্রি, ও বড়ো ভাববে রমা। একটা ট্যাক্সি এক্ষুনি ডেকে দাও।

ও, তোমার বৌ'র কথা বলছ? মুহূর্তের জন্যে চোখদু'টো সাপের মতো ঝিকিয়ে উঠল রমা'র।—খুব ভাবে বুঝি! হাসল রমা, সাপের মতোই।

রমা।

আঃ কতদিন ওরকম ডাক শুনি নি কারুর। আরেকবার ডাক না হিমাদ্রি, সেই

পুরনো নামে আরেকবার ডাকো তো। সেই ধরা ধরা গলায়, সেরকম জলদ স্বরে। ডাকো না! হিমাদ্রির বন্দীকাতর চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে সুর কেটে গেল ডোরা'র।

চোখদুটো দেখে মনে হচ্ছে যেন জেলখানায় এনে রেখেছি তোমাকে। বেশ, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বয়কে কফি করতে বলেছি, খেয়ে একটু ভালো বোধ করবে। কফিটা খেয়েই যাবে, আর পাঁচ মিনিট বোস।

কোন জবাব দিল না হিমাদ্রি। মুখ ফিরিয়ে টয়লেট সরঞ্জামে ভর্তি আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। একমুহূর্ত কঠিন চোখে তাকিয়ে কি ভাবল ডোরা। মনে মনে কি ঠিক করে নিল ও।

তারপর উঠে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এল কিচেনে। কফিটা শেষ করেই যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল হিমাদ্রি।

বাব্বা, যাওয়ার কি তাড়া, কফিটা যেন গিললে এক চুমুকে। বোস একটু, ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাই আবদুলকে।—বিশ্লেষণী চোখে হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ডোরা।

ততক্ষণ পরেই ফিরল যতক্ষণে ঘুমের ওষুধে কাজ করতে পারে। ঘুমন্ত অসহায় হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে বিজয়িনীর মতো হাসল ডোরা। ও জানে, যে ডোজ দেওয়া হয়েছে তাতে সকালের আগে আর ঘুম ভাঙছে না।

ভোর হতে আর দেরি নেই। আকাশের লালের ছাপ লেগেছে একটু। টটি লেনের নিমগাছের ওপর পাখা ঝাপটে উঠলো কয়েকটা ঘুমভাঙা পাখি। তখন দেখা গেল একটি ঘুমন্ত লোক আর একজন নিশাচর গণবধূকে নিয়ে ঢাকা ফেলা ইসমাইলের ফিটন ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে টটি লেন ধরে। চৌরঙ্গীতে পড়ে গাড়ির গতি একটু বাড়ল।

কর্মচঞ্চল চৌরঙ্গী এখন শান্ত। নির্জন। শুধু হোসপাইপ দিয়ে রাস্তা ভেজাচ্ছে কর্পোরেশনের কুলিরা। সেই সদ্যভেজা রাজপথ ধরে ছুটে চলল ইসমাইলের ফিটন। যাবে সে অনেকদূর। সাদার্ন এভিন্যু।

বাড়ির সামনে এসে নামল ডোরা।

গেট খুলে দরজার কড়া নাড়ল ও।

শোনা গেল ভেতর থেকে শান্ত পায়ে এসে দরজা খুলে দিল কে।

দরজা খুলে দাঁড়াল একটি চিন্তাক্লিষ্ট বধূ। ফোলা ফোলা চোখ, রাত জাগার নিশানা বিস্রস্ত বেশবাসে উদ্‌ভ্রান্তের মানচিত্র।

আপনি হিমাদ্রিবাবুর স্ত্রী?

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল বৌটি।

আপনার স্বামীকে নিয়ে এসেছি আমি। আসুন আমার সঙ্গে।

বিমূঢ় মহিলা ডোরার গৌরবদৃপ্ত পায়ের পেছন পেছন ফিটনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ডোরা ফিটনের পর্দাটা সরিয়ে দেখায় হিমাদ্রিকে। কুশনের গায়ে ঘুমে ঢলে আছে হিমাদ্রি। ডোরার আচরণে বৌটি শুধু নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ডোরা এগিয়ে এসে ঝাঁকনি দেয় হিমাদ্রিকে।

এই হিমাদ্রি, ওঠো ওঠো শিগ্‌গীর। তোমার বাড়ি এসে গেছে, ওঠো এইবার।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল হিমাদ্রি। মাথার ভেতর সব কিছুই কেমন এলোমেলো মনে হয় ওর। দুর্বোধ্য।

বৌটির দিকে তাকিয়ে এবার বলল ডোরা, কাল সারারাত ছিল আমার সঙ্গে হোটেলে। পুরো রাত আগে কোনদিন কাটায় নি ও। আপনার কথা বলে ঠিক সময়েই চলে আসত। কিন্তু কাল এত বেশী ড্রিংক করে যে, হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামতে

গিয়ে চোট পায় হাঁটুতে। তারপর সারারাত নেশায় আর ব্যথায় বেহুঁশ হয়ে কাটিয়েছে।

রমা.—মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়ে হিমাদ্রি। হিংস্র আক্রোশে চেঁচিয়ে ওঠে ও। সমস্ত ষড়যন্ত্রটা ও এতক্ষণে টের পেল।

চেঁচিয়ে রাস্তায় সিন করো না হিমাদ্রি। এটা টটি লেনের রাত্রি নয়, এটা সাদার্ন এভিন্যুর সকাল, মনে রেখো।—বলে আড়চোখে ও তাকালো বৌটির দিকে। বৌটির মুখ বেদনায় একেবারে নীল হয়ে গেছে, গেটটায় হেলান দিয়ে কেবল সংজ্ঞাহীনের মতো আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ও। দেখে বুকের ভেতরটা আনন্দে নেচে ওঠে ডোরার। হিমাদ্রির সারা মুখ কিন্তু আগুনের মতো টক্‌টকে।

সত্যি বীণা, এসব সাজানো, সব মিথ্যে। তুমি কিছু বিশ্বাস করো না বীণা। আমি, আমি—বলেই হিমাদ্রি ক্রুর হাসিমাখা ডোরার মুখের দিকে তাকালো,—তুমি, তোমার ষড়যন্ত্র এ সব, তোমাকে আমি পুলিশে দেবো, তোমাকে আমি,—দু'হাতে বৌটি মুখ ঢাকল এবার। সারা শরীর ফুলে ফুলে ওঠে ওর। বীণা, শোন আমি তোমাকে সব বলব, সব বলছি,—হিমাদ্রি মরিয়ার মতো বোঝাবার চেষ্টা করে স্ত্রীকে।

আঃ—বাধা দিয়ে বলল ডোরা, তোমার দাম্পত্য মিটমাট পরে করো। ঘরে গিয়ে বসো তারপর। বীণার দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। ও একা হেঁটে যেতে পারবে না। না হয় এক হাত আপনি ধরুন, আমি এক হাত ধরছি।—

ডোরা এগিয়ে গেল হিমাদ্রির দিকে।

যেন ভূত আসছে এগিয়ে এমনি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল হিমাদ্রি, ছুঁয়ো না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না। দূর হও তুমি, আমার চোখের সামনে থেকে এই মুহূর্তে দূর হয়ে যাও।—

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল হিমাদ্রি!

বেশ। চলে যাচ্ছি, এক্ষুনি যাচ্ছি! তোমার ছেলেমেয়ে তোমার চিৎকার শুনে জেগে ওঠবার আগেই চলে যাচ্ছি আমি। কিন্তু তার আগে আমার পাওনাটা পুরিয়ে দাও হিমাদ্রি। পুরো রাতের জন্যে পঞ্চাশ টাকা তো বটেই। এর কম আমি নিই না।—ফসফরাসের মতো নীল নীল হাসি জ্বলতে থাকে ডোরার ঠোঁটে মিসেস বেরির অ্যালসেশিয়ানের মতো।

।। সায়াহ্নে যূথিকা ।।

ঘটনাটি আমার কাছে যতটা রহস্যজনক মনে হয়েছিল, সোনালীর কাছে ততটা নয়। আগাথা ক্রিস্টির পোকা সোনালী, ও তাই হার্কুল পায়রোটের মতো সহজ বিশ্লেষণ করে বললে, ডাক্তার আসলে মেয়েটাকে খুন করেছে।

খুন? আমি রীতিমতো অবাক।

হ্যাঁগো। সোনালী গোয়েন্দার ভাষায় বললে, মোটিভটা তো পরিষ্কার। সম্পত্তি, টাকা পয়সা। লোকটাকে প্রথম দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

সোনালীর বুদ্ধি নিশ্চিন্ত সাবধান খুঁজে পেলেও আমি অমন সহজে মেনে নিতে পারছিলাম না। ডাক্তার মিত্র খুন করেছেন? সম্পত্তির জন্য?

হাওয়া বদলাতে খাণ্ডালা এসেছি। এক মাস হয়ে গেল। আমি আর সোনালী দু'টি প্রাণী। এমন নির্জন পাহাড়ী জায়গায় সময় কাটানোও এক দুশ্চিন্তা। সোনালীর কি? বাক্স ভর্তি আগাথা ক্রিস্টি, কার্টার ডিকসন, এলেরী কুইন আর রেকস্ স্টাউট। খুন খারাবী মেয়েদের যে এত ভাল লাগে, সোনালীকে বিয়ে করবার আগে জানতাম না। সোনালী তো খুনীর পিছনে ঘুরে ঘুরে সময় কাটাচ্ছে, আমি করি কি? কিন্তু ভাগ্য ভাল আমার। পরদিন বিকেলেই পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বাঙালী। ডাক্তার পীযুষ মিত্র। খাণ্ডালাতে আছেন পনের বছর। বেশ ডাকসাইটে ডাক্তার। ব্যাচেলর। মাঝে মাঝে ওঁর টেবিলের চা খেতে শুরু করলাম। আমার টেবিলেও ডেকে আনি কোনদিন। সোনালী লুচি করে দেয়, চপ কাটলেটও করে। সাত সতেরো আলাপ করি। কাশ্মীর, জহরলাল, রবীন্দ্রনাথ, ক্যানসার, আবহাওয়া।

কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। ডাক্তার অনুপস্থিত। প্রথমে ভাবছিলাম কাজ, তারপর দেখলাম শাড়ী। সোনালী সাহিত্য রুচিতে পুরুষ হলেও কৌতূহলে অকৃত্রিম নারী। ডাক্তার মিত্রের বাড়িতে শাড়ী এলো কী করে?

খাওয়ার টেবিলে ফিসফিস করে জানালো, সোনালী,—আজ দেখেছি।

দেখেছো?

হ্যাঁ, বললে বিশ্বাস করবে না, আরতি রায়।

আরতি?

তোমাদের ফিল্মস্টার গো, যার কথা ভেবে তোমাদের রাতে ঘুম হত না, সেই আরতি রায়।

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তুমি কি দেখতে কি দেখেছো। আত্মীয়া-টাত্মীয়া হবেন।

আত্মীয়া বুঝি? তুমি কি করে জানলে? দরদী এসেছেন আমার, বলে ডাল দিতে গিয়ে টেবিলে ডাল ফেলল সোনালী, হুঁ, আত্মীয়া, পরমাত্মীয়া! গজগজ করে ও, ঐ সব পরমহংসদের আমার চেনা আছে, বুঝেছ।

সত্যিই আরতি রায়!

সেদিন বিকেলেই সোনালী ডেকে আমায় দেখালো ডাঃ মিত্রের বেডরুমের জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খুব দুর্বল লাগছিল, কিন্তু আরতি যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

ডাঃ মিত্রের চরিত্র সম্পর্কে এবার আমিও সন্দেহাক্রান্ত হলাম।

সত্যি তো ব্যাচেলর মানুষ, তার ঘরে আরতি কেন। যে আরতির গাদা গাদা স্ক্যাণ্ডাল শুনে আমাদের কান বোঝাই, সে মেয়ের সঙ্গে পীযুষবাবুর যোগাযোগটা আমাদের কাছে বিশেষ রুচিকর লাগল না। এ রকম লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াই উচিত হয় নি, সোনালীর এই সিদ্ধান্ত আমার কাছে যুক্তিসঙ্গতই মনে হল।

দিন কাটতে লাগত। সোনালীর রহস্য উপন্যাসে তেমন মন নেই আজকাল, বিকেলে চায়ের টেবিল ও পাশের বাড়ির খবর দিতে থাকল। মুখরোচক খবরগুলো ছাড়া বিকেলের চা-ই বিস্বাদ লাগত আমার। পরচর্চা এমন উপাদেয় আগে ভালো করে জানতামই না!

কিন্তু হঠাৎ অনেকদিন বাদে ডাক্তার এসে হাজির হলেন। বিকেলবেলা। ডাক্তার আমাদের মুখ চোখের অসৌজন্য উপেক্ষা করে বললেন, মিসেস গাঙ্গুলী আপনি আমাকে একটা জিনিস দিতে পারেন?

সোনালী তেতো গলা একটু ভিজিয়ে বললে,—কি জিনিস?

একটু সিঁদুর।

সিঁদুর?

হ্যাঁ, বড্ড দরকার। দিতে পারেন? আমি, আমি বিয়ে করছি।

বিয়ে? সোনালী বিষম খেল।

আমি যথেষ্ট চমকেছি সন্দেহ নেই কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম। ব্যস্ত হয়ে বললাম, সিঁদুর দিয়ে দাও সোনালী।

সোনালী প্রায় ছুটে গিয়েই নিয়ে এল। কৌটোটা হাতে পেয়ে ডাক্তার আর দেরি করল না, ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

আমরা দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

এর তিনদিন বাদে মাঝরাত্তিরে মারা গেল আরতি। মাঝরাত্তিরে শোরগোল শুনে জেগে উঠে খবর পেলাম আমরা। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অসম্ভব ঠেকল। কিন্তু ভোর সকালেই দেখলাম। অজস্র ফুলে সাজানো আরতির মৃতদেহ।

কলকাতা থেকে হঠাৎ আরতি রায়ের আগমন, ডাঃ মিত্রের সিঁদুরকৌটো চেয়ে নিয়ে বিবাহ করে তারপর আচমকা মাঝরাত্তিতে মৃত্যু—সবটা মিলিয়ে কেমন গা-ছম্‌ছম্‌ রহস্যের গন্ধ।

কিন্তু সোনালীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওর অটুট বিশ্বাস। খুন। আরতি রায়ের সম্পত্তির জন্যই ডাঃ মিত্রের বিবাহ ও হত্যা। এমন রোমহর্ষক ঘটনা আমি মেনে নিতে না পারলেও একটু যেন ভয় ভয়, একটা 'হয়তো' লুকিয়ে ছিল মনের ভেতর। ডাঃ মিত্রকে আর আমি কতটুকুই বা জানি। হয়তো, হয়তো সোনালী যা বলছে, না, কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। যাকগে তার চেয়ে নিজের শরীরের ভাবনাই ভাবি। কোথাকার কে ডাক্তার মিত্র, কোথাকার কে আরতি রায় তাদের সম্পর্কে আমার এতটা উদ্বিগ্ন না হলেও চলবে। মনে মনে এমন একটা সিদ্ধান্ত করে নিজেকে অনেকটা হাল্কা মনে হল।

ভুলেই হয়তো যেতাম, কিন্তু—

সেদিন বিকেলে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। রোদ্দুরের শুভদৃষ্টি ছিল সেই সঙ্গে অম্লান। সেই শিয়ালের বিয়ে বিকেলে, রেশমী সুতোর মতো বৃষ্টির ধারায় স্নিগ্ধ পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বারান্দায় বসেছিলাম। আত্মমগ্ন সোনালী ব্যস্ত ছিল বেণী বন্ধনে। সোনালীর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ও সত্যিই সুন্দরী। অজস্র চুলের মাঝে ওর মুখ, যার ওপর ভেজা রোদ্দুরে কমলা রঙের একটা আভায় ওকে গোধূলি-মদির বাসর-বধূর মতো-লাবণ্যময়ী করেছে, সে মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। এ এক নতুন আবিষ্কার। আস্তে আস্তে ডাকলাম, সোনালী।

উঁ। চোখ তুলল।

শোন।

কি?

কাছে এসো।

কেন?

এসো না।

চুল বেঁধে নি, দাঁড়াও।

না। শোন তুমি।

সোনালী উঠল। কাছে এসে বললে, কি, বলো?

দু'হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিলাম আমি।

আরে, আরে কি হচ্ছে, ছাড়ো ছাড়ো বলছি।

না।

এই অসভ্য, ছাড়ো। দেখো, কে যেন আসছে গেট দিয়ে, ছাড়ো শীগ্‌গিরি।

ছেড়ে দিলাম। সত্যি গেট খুলে এগিয়ে আসছে একজন। এগিয়ে আসছেন ডাক্তার মিত্র। মুহূর্তে আমার মুখ কঠিন হয়ে গেল, সোনালীর মুখ আরো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই কাষ্ঠহাসি হেসে সোনালী এগিয়ে যাওয়া গোছের একটা নমস্কার করলে। তারপরই আমার দিকে তাকিয়ে বললে,—মাথা ধরেছে বলছ, তা বসে আছ কেন! বিছানায় গিয়ে একটু রিলাক্‌স্ করো না।

ডাক্তার মিত্র বোকা নন। বুঝলেন। ম্লান হেসে বললেন,—মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না আপনারা, আমি বসতে আসি নি। মিসেস গাঙ্গুলী, আপনার সিঁদুরের কৌটো ফেরত দিতে এসেছি। পকেট থেকে কৌটোটা বের করলেন ডাক্তার।

না, না, এখন খুব ব্যস্ত,—বলে সোনালী আরো বিব্রত বোধ করল নিজেকে, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল কৌটোটার জন্য।

কার দোষ জানি না, হাত ফস্‌কে কৌটোটা মাটিতে পড়ে গেল আর সমস্ত সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ল বারান্দায়। সোনালী আর ডাক্তার দু'জনেই বোকার মতো তাকিয়ে রইলো সেদিকে। তারপর চোখ যখন তুলল তখন সেই কমলা রোদের ভেজা আলোয় স্পষ্ট দেখলাম দু'ফোঁটা জল। ডাক্তার মিত্রের চোখে চকচক করছে দু'টি অশ্রুবিন্দু। সোনালীও দেখল। এইবার আমি কথা বললাম, ডাক্তারবাবু, বসুন। হাত ধরে সামনের বেতের চেয়ারে বসিয়ে দিলাম আমি। দু'হাতে মুখ ঢেকে ধপ্ করে বসে পড়ল ডাক্তার। সোনালী কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে মানা করলাম। নিঃশব্দ কয়েকটা মুহূর্ত। শুধু ঝিরিঝিরি বৃষ্টির নূপুর।

আমার জীবনে সিঁদুর কোনদিন আসবে ভাবতেও পারি নি আমি। এলেও তা এমনি সামান্য চারটে দিনের জন্যে তাও কি জানতাম? দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুলে তাকালো

ডাক্তার, এক গ্লাস জল দেবেন মিসেস গাঙ্গুলী ?

সোনালী উঠল কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে দিল। এক নিঃশ্বাসে গ্লাস খালি করে দিয়ে বললেন ডাক্তার, আমার পাগলামীকে ক্ষমা করবেন আপনারা। সিঁদুরটা নষ্ট হওয়ায় আমি লজ্জিত। চলি এখন।

এবার সোনালীই বাধা দিলে, না, না, আপনি বসুন। না জেনে রূঢ় ব্যবহার আমরাই করেছি। এমনিভাবে চলে গেলে আমরা সত্যি বড় কষ্ট পাব ডাক্তারবাবু। আপনি বসুন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ ডাক্তার বলে উঠলেন, আচ্ছা মৃন্ময়বাবু, আপনি তো লেখক মানুষ। বলতে পারেন, আসলে ভালবাসাটা বড়, না ভালবাসার দম্ভটা ?

আচমকা প্রশ্নটা, বলা বাহুল্য আমার বোধগম্য হয় না। ডাক্তার তাই হাসলেন, হেঁয়ালী লাগছে, না ? বেশ, সবটাই বলি। এই বলার পেছনে সস্তা একটা অহমিকা হয়তো নজরে পড়বে আমার, ওটা যদি একটা উচ্চস্বর মনে হয়, মাপ করবেন। সেধে যাদের গান শুনতে হয় তাদের চেয়ে সেধে যারা গান শোনায় তারা ছোট দরের শিল্পী সন্দেহ নেই। তবু শ্রোতারা তাদের ক্ষমা করে। কারণ তাদের সুরে বারোয়ারী ব্যাপ্তি নেই ঠিকই, কিন্তু স্বরে আত্মতুষ্ট ব্যক্তির তৃপ্তি স্পষ্টগোচর। এই ছোট ছোট সন্তুষ্টিতে হাততালি দিতে মানা নেই। চুপ করলেন ডাক্তার। বাইরে তখন রোদ মরে এসেছে, বৃষ্টির রঙটাও তাই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন ডাক্তার, আরতির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ স্টুডিওতে। আমার তখন মেডিক্যালে ফাইনাল ইয়ার। রঞ্জন মুখার্জিকে চেনেন নিশ্চয়ই, রঞ্জনদা আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। দাদার বন্ধু বলে দাদার মতই শ্রদ্ধা করতাম, কথা বিশেষ বলতাম না, কালে ভদ্রে হয়তো এক আধটু সামান্য বলেছি। রঞ্জনদা তখনই নামকরা পরিচালক, একটা ছবি করে বেশ নাম করেছেন। ক্রিকেট খেলে বাড়ি ফিরছি একদিন, দেখলাম, ড্রইংরুমে দাদা আর রঞ্জনদা গল্প করছেন। আমাকে দেখেই রঞ্জনদা বললেন,—ওহে পীযুষ, শোন তো এদিকে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একটু উপকার করতে পারো ভায়া ? আমার নতুন ছবিটায় হাসপাতাল হচ্ছে পটভূমি ? ডাক্তার নার্সের গল্প। আমার তো ওসব বিদ্যে একেবারেই নেই। কয়েকটা সেটে তুমি যদি এডভাইজার হয়ে থাকো বড় উপকার হয়।

আমি জবাব দেবার আগেই দাদা বললেন,—তা ওকে অনুরোধ করবার কি আছে রঞ্জন, ও যাবে। যখন দরকার হয় খবর পাঠিয়ে নিয়ে যেও।

আমি, বলা বাহুল্য, মাথা নাড়লাম।

রঞ্জনদা হেসে বললেন, পীযুষ ডাক্তারী পড়ছে বলে আমার এমন উপকারে লাগবে কে জানত। তা পীযুষ এ কাজে তোমার বিরক্তি লাগবে না তা বলতে পারি। ছাত্রীটি কে হবে তোমরা জানো ? আরতি রায়। কি, পছন্দ তো ?

আমি বোকার মতো একটু হেসে চলে এলাম।

খাওয়ার টেবিলে আমাকে একা পেয়ে বৌদি খুব ঠাট্টা করলেন। খবরটা নিশ্চয়ই রঞ্জনদা দিয়েছেন বৌদিকে।

তারপর ঠাকুরপো, আরতি রায়কে ডাক্তারি শেখাতে গিয়ে নিজেই আবার ওর পেশেন্ট হয়ে যেও না যেন।

কি যে বলো বৌদি,—লাজুক গলায় বললাম। তখন কি ছাই পীযুষ মিত্র বুঝতে পেরেছিল সত্যি আরতির কাছে পেশেন্ট হয়ে যাবে ও।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি না জানি আরতি রায় কেমন মেয়ে। রূপ তো ওর

জানতাম, সে রূপে যে কি সাংঘাতিক চুম্বক লুকনো তা সে রাতে ভেবে আন্দাজ করতে পারি নি।

সেটে গিয়ে দেখলাম আরতি রায়কে। মাপ করবেন মিসেস গাঙ্গুলী, তার সেই অপূর্ব স্বাস্থ্যে তখন ভলকানো। খুব নার্ভাস হয়ে গেলাম। আমাকে দেখে মৃদু হাসলে আরতি, রঞ্জনবাবু, এই সেই মেডিক্যাল স্টুডেন্টটি, যে সব দেখাবে-টেখাবে?

রঞ্জনদা বললেন, হ্যাঁ।

আরতি ব্লাউজের বোতামটা আঁচল দিয়ে আলতো একটু ঢেকে বললে, একেবারে বাচ্চা তো।

শুনে কান পর্যন্ত অপমানে লাল হয়ে গেল আমার। আরতি রায় এমনি একটি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ (তখন লোকে সত্যি সুপুরুষ বলতো আমাকে) যুবককে একেবারে নস্যাৎ করে দিল বাচ্চা বলে! গা জ্বলে উঠল আমার। কাঁচা বয়সের রাগে বলে উঠলাম রঞ্জনদা, আপনি এ কাজের জন্য বেশ বড় দেখে এডভাইজার যোগাড় করুন, আমি চললাম।

আরে আরে, আরতি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত চেপে ধরলেন আমার, বাচ্চা বলেছি বলে বাচ্চার মতো চটতে আছে, বুঝি? বসুন, বাচ্চা ছেলেই তো আমার পছন্দ। রাগ করবেন না, বসুন।

দু'চোখ তুলে তাকালাম ওর চোখের দিকে। সমস্ত অভিমান মুছে গেল আমার। জানি না সেদিন ওর চোখে কি ছিল। আজো ভেবে কুল পাই না, আমি কি দেখেছিলাম সেদিন ওর চোখ দুটোয়। বিদ্যুৎই ছিল বোধ হয়, যা ভাল করে দেখতে পাই নি, যখন পেলাম তখন বজ্রকে এড়ানো সম্ভব ছিল না!

কাজ চলতে লাগলো। রোজ কাজ শেষ হয়ে গেল মন খারাপ লাগত আমার, একটি মিষ্টি দিন তো ফুরিয়ে গেল! দিনের পর দিন ওর আকর্ষণ দুর্বার হয়ে উঠলো আমার কাছে। একটা সেট্ শেষে অধৈর্য অপেক্ষায় থাকতাম, পরের সেটের জন্য। এমনি একমাস পরে একটা সেট্ লাগাতে আমি ন'টায় গিয়ে হাজির হলাম। এত তাড়াতাড়ি আসায় নিজেই লজ্জিত বোধ করছিলাম। তারপর সুটিং শুরু হবার সময় হঠাৎ খবর এলো, আরতি রায়ের শরীর খারাপ, আসতে পারবেন না। হঠাৎ আমার কি হল, চুপি চুপি প্রোডাক্সন ম্যানেজারের কাছ থেকে ও'র ঠিকানাটা নিয়ে সোজা হাজির হলাম বাড়িতে। পার্ক স্ট্রীটের সেই মস্ত ফ্ল্যাটের প্রশস্ত সজ্জিত ড্রইংরুমে বসে নিজেকে বড্ড নার্ভাস মনে হল। একবার ইচ্ছে হল, পালিয়ে যাই। কিন্তু তার আগেই বেয়ারা এসে বললে আপনাকে মেমসাব ভেতরে ডাকছেন।

ঢিপঢিপ বুকে ঢুকলাম বেডরুমে। মস্তো বড় পালঙ্কে মাথাটা এলিয়ে শুয়ে আছেন আরতি রায়। চুল উস্কখুস্ক, সারা শরীরে আলস্য। অপরূপ দেহটির ওপর বস্ত্রের আবরণ শালীনতার বিজ্ঞান মানে নি। মাথাটা আমার ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো।

তুমি হঠাৎ আমার বাড়িতে?—(কাজের চতুর্থ দিনে আরতি আমারই অনুরোধে 'তুমি'র মাধুর্যে নেমে এসেছিল।)

মানে স্টুডিওতে শুনলাম আপনার জ্বর, তাই দেখতে এলাম।

তাই বুঝি? হাসল আরতি, কিন্তু চোখ মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে জ্বর তোমারই!

আমি প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘামতে লাগলাম। একটু সরে গিয়ে আরতি বললে, বোস।

ভয় ভয় গলায় বললাম, বিছানায়?

হ্যাঁ, অমন ভয় পাচ্ছো কেন? বসতেই বলেছি, শুতে তো বলিনি।

সারা শরীর হিম আমার। বসলাম। বললাম,—কাল রাত্তিরে বুঝি জ্বর এসেছে?

জ্বর? জ্বর কোথায়? কাল ঐ বিনয় সেনের পাল্লায় পড়ে বেশী হুইস্কি গিলে ফেলেছি তাই সকাল থেকে এই হ্যাঙ্গওভার, মাথা তুলতে পারছি না।

আপনি, আপনি মদ খেয়েছেন?

কেন? জানতে না, আমি মদ খাই?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে বসলাম, আপনি আর মদ খাবেন না আরতি দেবী।

কি? কি বললে? বিস্ময়ে চোখ গোল গোল করে আমার দিকে তাকালো ও, পীযুষ, আমি মদ খাই বলে তোমার এত কষ্ট হচ্ছে কেন বলতো? প্রেমে পড়ে গেছ বুঝি?

কিছু বললাম না। চোখ যখন তুললাম দু'চোখে তখন দু'ফোঁটা অবাধ্য জল। শোয়ার ভঙ্গি থেকে উঠে বসলো আরতি, দু'হাতে মুখটা ঘুরিয়ে ধরে বললো, ছিঃ, কাঁদছো কেন? বোকা ছেলে।

আর পারলাম না। দু'হাতে বুকে টেনে নিলাম ওকে। বাধা দিল না আরতি, শুধু কানের কাছে মুখ এনে আবেগভরা গলায় বললে, বোকা ছেলে।

আমি তোমাকে মদ খেতে দেবো না। কিছুতেই না। কান্নায় বুজে আসে আমার গলা! চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে আরতি, মদ না খেলে কি তোমার এমন ভালবাসা দেখতে পেতাম আমি! চোখ মোছ, বাচ্চা ছেলের মত কাঁদছ কেন? কাঁদে না ছিঃ—আঁচল দিয়ে চোখ মোছাল আরতি। তারপর চোখে চোখ রেখে হাসল। সে চোখেরও মানে কি, তখন বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি সে চোখের আরেক নাম ভস্মলোচন।

তারপর—

ঝড়! ঝড় বৈকি। আমার জীবনে সব মিথ্যে তখন। একমাত্র সত্য আরতি রায়। ডিপ্লোমাটা জুটে গিয়েছিল আগেই নইলে সেটাও পেতাম না কোনদিন। সারা শহরময় কুৎসা, কিন্তু আমি বেপরোয়া! উপহারে উপহারে সঞ্চিত অর্থ ঢেলে দিতে শুরু করলাম আরতির পায়ে। যে দাদা আমাকে বাবার মতো স্নেহ করতেন তাঁর সঙ্গে, মাতৃতুল্য বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে সম্পত্তি আলাদা করে নিলাম। সে সম্পত্তি লিখে দিলাম আরতির নামে। সে কি উন্মত্ত দিন গেছে! শুধু জীবনকে ভোগ করে গেছি। পেছন ফিরে তাকাই নি, হিসেব করে দেখি নি, কি পেলাম আর কি পাই নি।

তারপর? খুব সাধারণ। ঝড় একসময় থামলো। আমি তখন আরতির সেবায় নিজেকে নিঃস্ব করে ফেলেছি। তেমনি একদিনে আরতি দিল্লী গেল কি সব চ্যারিটির কাজে। ফিরে এলো সঙ্গে কোন এক স্টেটের ছোকরা প্রিন্সকে নিয়ে! ফোন করেছিলাম দেখা করব বলে, জানলাম সন্ধ্যায় ও বাড়িতে থাকবে। সন্ধ্যা থেকে বসে বসে পুরো রাত জাগলাম, আরতি বাড়ি ফেরে নি। সকালবেলায় হঠাৎ খবর পেলাম প্রিন্সটাকে নিয়ে ও গ্র্যাণ্ডে থাকছে এখন। সমস্ত ক্রোধ এক লহমায় হিংস্র হয়ে উঠলো। পাগলের মতো ছুটে গেলাম গ্র্যাণ্ডে। দরজা নক্ করে ঘরে ঢুকেই গলা টিপে ধরলাম ওর। শোরগোল পড়ে গেল হোটেলময়। প্রিন্সপুঙ্গব পুলিশও ডাকলো।

চেঁচিয়ে বললাম, তুমি এমন নীচ, নেমকহারাম—

বেড়ালের মত শয়তানি হাসলো আরতি, তারপর নিজের গলায় হাতে বুলোতে বুলোতে বললো, ইন্সপেক্টর, ওকে অ্যারেস্ট করুন। ও ঘরে ঢুকে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করে। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে,—বোকা ছেলে। ভালবাসতে এসেছিল ত্রিশ হাজার এক সম্পত্তি হাতে নিয়ে, ফুঃ!

টাকা? টাকার জন্যে তুমি, হাতকড়ার মধ্যে আমার হাত দুটো শক্ত হয়ে উঠে।

না। টাকার জন্যেই নয়। নতুন বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলতে বেশ

লাগে আমার। বেশ লাগে ওদের বোকামী চাখতে। কিন্তু একবার সে বোকামী ভেঙ্গে গেলে তাতে আর স্বাদ পাইনে। এবার পীযুষ, সত্যি তুমি তেতো হয়ে উঠেছিলে। গুড্ বাই। বলে প্রিন্সের বগলে হাত ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেল আরতি আমার চোখের ওপর দিয়ে। এত দিনের সমস্ত সম্পর্ক আরতি একমুহূর্তে এমনভাবে উড়িয়ে দিতে পারবে কল্পনাও করতে পারিনি।

পাগলের মত ঘুরলাম অনেকদিন। তারপর ঠিক করলাম, প্রতিশোধ নিতে হবে। নির্মম প্রতিশোধ। খুন করবো? না, খুন নয়। একদিন সোজা গিয়ে বললাম, তোমাকে ভালবাসায় নয়, টাকার অংকে পেতে হলে কত চাও তুমি, বলো?

ব্যবসার অংকে জানতে চাও?

হ্যাঁ।

পঞ্চাশ হাজার। একমাসের জন্যে। পারবে দিতে?

যেদিন পারব সেদিনই আসবো। সেদিন ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

না। বিশ্বাস না হয় লিখে দিচ্ছি, দেবো।

দরকার নেই। তখন অস্বীকার করলে শাস্তি আমি নিজের হাতেই দেবো।

পঞ্চাশ হাজারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যেদিন পুরো টাকাটা হবে সেদিন নতুন একজন মানুষ হয়ে আসবো ওর কাছে। আর নিষ্ঠুর নির্যাতনে ওকে নির্মম শাস্তি দেবো।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে খাণ্ডালা। পাগলের মতো টাকা জমাতে লাগলাম। পঞ্চাশ হাজার আমাকে জমাতেই হবে। এর জন্যে কিছু বাজে কাজ করতেও লাগলাম। পয়সা চাই, প্রতিশোধ যে আমায় নিতেই হবে।

তারপরই অঘটন ঘটলো। অঘটন কি? কে জানে। বোম্বে থেকে একজন আর্টিস্ট, যার অনেক চিকিৎসা আমি করেছি, একদিন গাড়ী করে নিয়ে এলো এক অসুস্থ রোগিণীকে। তাকে ভালো করে দিতে হবে, দুরারোগ্য রোগ তার।

দেখলাম রোগিণী। আশ্চর্য ঘটনাচক্র। যা ভেবেছেন, আরতি রায়। হাসি পেল আমার, উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠতে চাইলাম। এ সেই আরতি রায় বিশ্বাস করা শক্ত। কার উপর আর প্রতিশোধ নেবো আমি? কুৎসিত জীবনই ওর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে আজ। অতীতই প্রতিশোধ নিয়েছে, প্রতিশোধ নিয়েছে প্রকৃতি। আরতির সিফিলস হয়েছে।

তারপর আপনারা জানেন। ওকে ঘরে তুলে নিলাম। আরতি কিছু বললে না। শুধু অজস্র কান্নায় গলতে লাগলো। আজ ও কপর্দকহীনা। সমস্ত ঐশ্বর্য লুপ্ত, রূপ গেছে, বয়েসও জেঁকে বসেছে, আর মৃত্যু এখন শিয়রে। ছেঁড়া জুতোর মতো ওকে ছুঁড়ে ফেলেছে তারাই যারা একদিন মৌমাছির মতো ঘিরে রেখেছিল। বড্ড করুণা হল।

বললাম, আরতি, এতদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরো করেছি আমি। তোমার পুরোন সেই চুক্তি যদি তুমি রাখতে রাজি থাকো এখনও, তবে আমিও রাজী। বলো।

আরতি কিছু বলল না। শুধু পা জড়িয়ে ধরলো আমার। হাসি পাচ্ছিল, প্রতিশোধ নোবো কার উপর? কাকে আমি নিষ্ঠুর নির্যাতনে দগ্ধ করবো এখন? এতদিনের যে কঠিন ব্রত ছিল, সে ব্রতের সমাপ্তি হবে কিসে? প্রকৃতির কি অমোঘ বিধান।

জল টলটল চোখে আরতি বললে, তোমার কাছে মরতে পারছি এ পুণ্যেই হয়তো স্বর্গে যেতে পারবো আমি।

জানি মিথ্যে, তবু আশ্বাস দিলাম, তুমি বাঁচবে আরতি। আমি ডাক্তার। আমি তোমাকে বাঁচাবো।

না। আরতি বললে, সারা জীবনে যা করেছি তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই পীযূষ। জীবনকে আমি বাহান্নটা তাসের মতো ছিটিয়ে প্রায় সবগুলো তাসই উলটিয়ে দেখে নিয়েছি তার জোর কতটুকু। এ ভাবেই বা ক'জন জীবনটাকে দেখে? শুধু দুঃখ এই, সবচেয়ে বড় তাসটাই বুঝি উলটাতে পারিনি।

তার মানে, কি বলতে চাও তুমি?

সিঁদুর আর ঘোমটার জীবনটা জানা হয়নি আমার। জানা হয়নি নতুন নামের, নতুন জন্মের জীবন। সেটাই বাকী রয়ে গেল।

তাই মিসেস গাঙ্গুলী সেদিন আপনার কাছ থেকে সিঁদুরের কৌটা নিয়ে গিয়েছিলাম, শহর থেকে রেজিস্ট্রার ডেকে বিয়ে করেছিলাম আমরা। হয়তো এটাই আমার প্রতিশোধ।

সেই অপূর্ব সন্ধ্যার একটা করুণ সত্য জানালো আরতি। ও বললো, মনে হচ্ছে তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম, অথচ ভালোবাসতে আমি চাইনি। তাই জীবনের অজস্র ভোগের মধ্যে আনন্দ খুঁজেছি, কিন্তু সত্যি করে জানাই, আনন্দ আমি পাইনি। যত বেশী উগ্র লোভে গা ডুবিয়েছি তত বেশী রিক্ত বেদনায় জ্বলেছি আমি। ঐশ্বর্য যত বাড়লো ততই নিঃস্ব হয়ে যেতে লাগলাম। তখন সেই প্রাচুর্যের ক্লান্তিতে বুকের মধ্যে একটা অস্ফুট বেদনা ককিয়ে উঠতো মাঝে মাঝে। তখন বুঝিনি, এখন বুঝেছি, সে বেদনা আর কিছু নয়, সে তুমি।

আয়নায় ওর সিঁদুর টিপ ঘোমটা মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধের মত বললো আরতি, আজ সেই আনন্দ পেলাম পীযূষ। আজ আমি সুখী। আমি মরে গেলে ভুলে যেও আরতি রায়কে, ভুলে যেও তার অতীত। শুধু আজকের এই অপূর্ব সন্ধ্যাটি মনে রেখ, যে সন্ধ্যায় আরতি রায় নিজেকে খুঁজে পেয়েছে, সিঁদুরের চিহ্নে, পদবীর স্বীকৃতিতে। সে সন্ধ্যায় আরতি রায় পীযূষ মিত্রের স্ত্রী, একটি সাধারণ মেয়ে, একজন সাধারণ বৌ।

মরবার দিনও ওর মুখে হাসি লেগেছিল। মরবার আগে দুষ্টুমি করে ডেকেছিল, ওগো শুনছ, আরো একটু সিঁদুর পরিয়ে দাও সিঁথিতে। দিয়েছিলাম। শেষবারের মতো।

চুপ করলেন ডাঃ মিত্র। খাণ্ডালা পাহাড়ের বুকে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকার নামছিল তখন। বৃষ্টির নূপুর এবার অজস্র কান্নায় দ্রুততর হয়ে উঠলো। ঝমঝম আওয়াজ হচ্ছিল বাংলোর চালে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ মিত্র, তারপর আমরা কিছু বলার আগেই বৃষ্টি মাথায় করেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলেন। তাঁর আবছায়া মূর্তি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে সোনালী কথা বললে, গায়ে ছাট আসছে, চলো ভেতরে যাই।

ঘরে এসে ঢুকলাম আমরা। বাইরে অন্ধকার বারান্দায় পড়ে রইল তিনখানা চেয়ার আর,—আর—মেঝেতে এক কৌটো সিঁদুর। যেন তিনটি নির্বাক কান্না ও একটি বাঙ্ময় বেদনা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

।। প্রেমের কবিতা ।।

জীবনে বঞ্চনা অনেক। যুগের ধর্ম অশান্ত। যৌবন আজ extrovert, পশ্চিমী জীবনে তাই ভাঙ্গনের সমুদ্র সুস্থতার তীরকে গ্রাস করেছে। তাই এল্. এস্. ডি.-এর বুদবুদে উটোপিয়ার রামধনু দেখতে চাইছে ওরা।

হিপির বিদ্রোহে খুঁজে বেড়াচ্ছে অস্তিত্বের অর্থ, নিউডিস্ট্ কলোনীর হিড়িকে আবরণ উন্মোচনে ভাবছে হৃদয়ের লজ্জাহরণ হবে। এজিটেশন বা মেডিটেশন-এ ভাবছে আত্মরক্ষা আর আত্মারক্ষা দুইই সম্ভব। নরনারী সম্পর্ক শুধু জৈবিক থেকে গেছে, তাই যে কোন ছাত্রীর ব্যাগে বিশ দিনের জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ির পাতা। আর প্রত্যেক ছাত্রের হাতে মেরিয়ুনা সিগ্রেট বা মহেশ যোগীর আশ্রমের বিজ্ঞাপন। শুধু প্রতিবাদ। কিন্তু প্রতিবাদ তো কোন মতবাদ নয়। কুয়াশা তো শুকতারার ঠিকানা হয়, বিনাশ তো বিকাশের অন্য নাম বলবে না কেউ। তাহলে? কে জানে, জাগতিক সুখের সব সামগ্রী আস্বাদনের পর যুগ বোধহয় উন্মত্ত হয়ে যায়, অতি ঐশ্বর্যের পরিণাম বোধহয় হৃদয়ের নিঃস্বতা।

বলা বাহুল্য এ যুগে তাই প্রেমের কবিতা দেখা যায় না। বিটনিকরা করায়ুকে গুরুর নির্দেশে হাইড্রান্টের কবিতা লিখবে বা অতি ব্যবহৃত প্যান্টিসের বর্ণনায় ফেটিশ রোগকে বিদ্রোহের নিশান বলে চালাবে। ও কবিতা নয়। চিৎকার গান নয়। কান্না রাগিনী নয়।

হতাশ হয়ে তাই কবিতা পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। এমন সময় হাতে এল এক তরুণ মার্কিন কবিতার বই—Listen to the Warm। লেখক, রড্ ম্যাককুয়েন। মুগ্ধ হলাম।

কুয়াশা সব আকাশকে ঢাকতে পারেনি। এখনো দু'একটা তারা আছে যা জোতির্ময়, দৃষ্টিগোচর।

প্রথম কবিতা হল একটা বিড়াল নিয়ে—A Cat Named Sloopy. কবি নিউইয়র্কে থাকে একটা ছোট্ট কামরায় আর থাকে এই স্লুপি। দু'জনে দু'জনকে জানে, ভালোবাসে।

A dozen summers
We lived against the world.
An island on an island
She'd comfort me with purring
I'd father her with smile.
We get rich on trust
needing not the beach of butterflies,

বেশ ছিল এরা দু'জন। ভালোই। তারপর? ছাড়াছাড়ি হল। জীবনের দাবী অনেক। কিন্তু তবু মনে পড়ে—

Once was a time,
In New York jungle in a tree,
Before I went into the world
In search of other kind of love
Nobody owned me but a cat named Sloopy

Looking back
Perhaps. She has been
The only human thing
That ever gave back love to me

তিক্ত কথা কি? একটা বেড়াল the only human thing যে শুধু gave back love to me. তিক্ত কিন্তু সত্য, বিষাদের মতো, বেহালার মতো, বিদায়ের মতো।

আরেকটা কবিতা দেখুন। মিনতি। অনুরোধ। মিনতি কিন্তু প্রণতির মতো পবিত্র, ফুলের মতো, নিরক্ত বেদনার রঙে ধূসর শ্বেতকরবীর মতো নিরহংকার।

Be gentle with me, new love.
Treat me tenderly.
I need the gentle touch.
The soft voice,
The candle light after nine.

There have been so many who
did not understand
So give me all the Love I see in your
timid eyes
But give it gently
Please.

তারপর সান্নিধ্যের তাপমাত্রা জানতে চান? শুনুন—

You have been so long at the beach
You even taste like the Sun
But the sun is much to warm
even for Love.
I mean—I want you
But night is only inches away
and I can wait
Meanwhile
Watch the indolent butterfly playing
on the tall flower
In the yard
And think about the sun going down.
It always does you know.

কবি এখানে আপনার অতি পরিচিত বন্ধুর মতো কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলছে। এমন কি একান্ত casual হয়ে বলছে It always does you know. সূর্যের রোজকার কাজ—কিন্তু গর্বকণ্ঠ যেন আবিষ্কারকের!

কিন্তু কবির সূর্যকে ভালো লাগে। লাগে। তবে সব সময়ে নয়। যখন গ্রীষ্ম। যখন একা। তখন সূর্য আর বন্ধু নয়। তাই বললেন—

This summer belongs
To the people of the world
Who want each other,
The lovely have no right
To share the summer sun

কবির বিপদ মেঘ নিয়েও কম নয়। শুনুন—

Clouds are not the cheeks of angels yon know
They are only clouds.
          Friendly sometime
But you can not be sure.
If I had longer arms
I'd push the clouds away
Or make them hang above the water
          somewhere else
But I am just a man
          who needs and wants
Mostly thing he will never have.

সুতরাং কবির আবেদন। হে প্রেয়সী এসো, এগিয়ে এসো—

I've never been able
To push the clouds away by myself.
Help me
Please.

কবি একবার কি দু'বার শরীরমুখীও হয়েছেন। বলেছেন—

I want to be alone with you
I want my thighs to speak your name
so softy only you can hear.

কিন্তু কবির এ ইচ্ছা ঘনিষ্ঠতার উষ্ণতায়, প্রবল প্রতিবাদের উগ্রতায় নয়। প্রদর্শনকাতরতার বিকার নেই এতে।

মাঝে মাঝে কবি চান প্রেয়সীর চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে, প্রেয়সীর মুখের গভীরে গিয়ে ওর কথার সায়রের উৎসে কান রাখতে।

I'd like to crawl behind your eyes
and see me the way you do
or climb through your mouth
and sit on every word that comes up
through your throat.

জীবনে প্রেম অপ্রতুল। দয়িতার জীবনে কবি হয়তো একেশ্বর নন। জ্বালা সন্দেহের, তৃতীয় পুরুষের। কিন্তু যতটুকু পাওয়া তাও কি কম। এ যুগে হৃদয়ের

সম্পূর্ণতা আয়ত্তাধীন হয় কি? সে দূরাশায় হাতের পাখী ছাড়লে সে কি সন্দেহের নীড়ে ফিরে আসবে? তাই কবি ভাবছে—

I have loved you
In so many ways
In crowd or all alone
When you were away
and I imagined others watching in the street,
or worse—you in other people's arms.

না, সব ভুলতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে—

I've promised myself
I will not ask where you have been tonight
I'll only say hello
and hope.

এ যুগের প্রেমের রূপ এ নয় কি? বলুন। আর গ্রামজীবন? ঘর। কুটীর। শ্যামল মাটির ডাক। তাও শুনতে পান কবি। অবসরের কার্পেট তো বিছানো। ফুলঝরা একটি গাছের কেন, সব গাছেরই দেখবার বাসনা কবির। বাসনা আর অঢেল অবসর। এ কর্মচঞ্চল যুগে এ তো বিদ্রোহ। গতির নেশার চেয়ে কবির কাছে যতির নেশা বড়ো, সময়ের পরাজয়ের চেয়ে অনেক বড় সময়ের অধীনতা মেনে নেওয়া। এ এক নতুন সুর, এ এক নতুন সুরা।

তাই কবি লিখেছেন—

I am going home again to meet the dreaded winter
and the unsure spring.
And the girl whose eyes never left mine
when we swam together in the river
and made love
before the brick bridge.
I am going home
to see if there really is such a place as home
It takes a long tome
for a single blossom to fall
from a flower tree
And I have so much time to spare
that I can watch all the flowers fall
from all the trees.

অপূর্ব নয় কি?

ভালোবাসার সবচেয়ে বড় বেদনা কি? ভয়। কিসের ভয়? হারাবার ভয়। সে শূন্যতা কতো তীব্র হতে পারে দেখুন :

Only a day away
the loneliness is unbearable.
How will it be if you are a year gone?

বৎসর তো বড় কথা হল। দেখুন, মুহূর্তের অদর্শনই কতো না আতঙ্কজনক।

I am afraid of being alone now

it happen every time you close the door
or go into the next room
away from me.
I am like a child again
I can't be left alone.
Hurry.

কি মধুর এই যৌবনের শৈশব! নয় কি? স্মরণশক্তি কত অদ্ভুত। অনেক সময় মন শুধু জঞ্জাল জমিয়ে ফেলে! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—ধূলির প্রাপ্য ধূলিকে না দিলে জঞ্জাল জমে শেষটা। জমে, কিন্তু মন এত অবোধ বেশীর ভাগ সময়ই জমায়। মন কি তাহলে জঞ্জালের উঠোন?

The mind is such a junk yard ;
it remembers candy bars
but not the Gettysburg Address.
Frank Sinatra's middle name
but not the day your best friend died.

তাই কবি সামান্য কথা স্মরণ করাতে চান—

If in your mind there is some corner
not yet occupied with numbers you
may never need,
remind your memory of the day
we turned to watch the rain
and turning back Forgot
that we belong to one another.

অতঃপর কবি একাকিত্বের বীণা বাজিয়েছেন। সোয়াইটার বলেছেন, You can be lonely in the crowd. নিশ্চয়ই। ভিড় তো শুধু জনতা। জনতা তো দয়িতা নয়, জনগণমন তো মনজনগণ নয়। একাকিত্বের সাক্ষী কে? শুধু স্মৃতি।

I live alone.
It hasn't Always been that way
It's nice sometimes
to open up the heart a little
and let some hurt come in.
It proves you are still alive.

স্মৃতির যন্ত্রণা হল জীবনের অস্তিত্ব? হার্টের দরজা খুলে তাই কবি hurtকে আমন্ত্রণ করেছেন। কবি বাঁচতে চান। যন্ত্রণার নামই কি জীবন? বেদনার সঙ্গীতেই কি জীবনের দেনা শোধ হয়?

কবি একাকিত্বের দুঃখে কাতর কিন্তু এ ঐশ্বর্য ছাড়তে নারাজ। তাই বলেন—

It is for love that I live alone.
Because the lovers I imagine
are safer than the ones I've known.

পরিচিত ভালোবাসার চেয়ে কল্পনার নায়িকা নিরাপদ। তারা দুঃখ দেয় না। তাই কবি এখন—

I make rhymes for people who
won't hear
Some who will not turn their face to meet mine.
It is for me a kind of loving.

রড ম্যাককুয়েন সত্যি প্রেমের কবি। ভালোবাসার কবি। ভালোবাসার অন্য নাম বেদনা। ভালোবাসি যাকে তাকে কি ভয় করি? ঘুমন্ত প্রেয়সীকে তাই বলেছেন :

And now as you sleeping I'll take
a moment just to tell you
and the thing I never say when
you are awake.

কবি তাকে অজস্র ছোট্ট সব খুশীর জন্য ধন্যবাদ জানান। বলেন—

I can't look ahead to the future
And I am too old to run home to the past.
So now while you sleep on beside me
I'll do what I can to make the moment last.
Thank you for another special morning
and thank you for an even better day.
And thank you in Advance
if their's even half a chance you'll stay,
One more morning. One more day.

অপূর্ব নয় কি? এবার জাদুকরের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলার মতো সবচেয়ে বড় মুক্তো আমি আপনাদের কাছে রাখছি। শচীন ভৌমিকের মতে এটি ম্যাককুইনের সবচেয়ে আবেদনময়, উষ্ণ, কবিতার ফুলের রাজ্যে সূর্যমুখী। নাম, Song without words.

I wanted to write you some words you'd remember
words so alert they'd leap from the paper
and crawl up your shoulder and lie by your ears
and be there to comfort you down by the years.
But it was cloudly that day and I was lazy
and so I stayed in bed just thinking about it.

I wanted to write you and tell you that may be
Love songs from loves are unnecessary,
We are what we feel and writing it down
seems foolish sometimes without vocal sound.
But I spent the day drinking coffee, smoking cigerettes
and looking in the mirror practising my smile.

I wanted to write you one last, long love song
that said what I feel one final time.
Not comparing your eyes and mouth to stars

But by telling you only how like yourself you are.
But by the time I thought of it, found a pen,
put the pen to ink, ink to paper,
you were gone.
And so, this song has no words.

এরচেয়ে কোন ভালো কবিতা ইদানীং কেউ যদি পড়ে থাকেন জানাবেন—এ যুগে সম্ভবতঃ প্রেমের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু কবিতার মৃত্যু হয়নি। ভালোবাসা হয়তো নেই, ভালো-ভাষা তাই বলে ফুরোয় নি। ভুল বললাম, প্রেমের মৃত্যু হয়নি। শুধু মূল্য বদলেছে, প্রেমের হৃদয় বদলেছে। বদলাবে না কেন বলুন? প্রেমেরও তো বয়স হল। আমরা প্রেম হারাইনি, যৌবন হারিয়েছি, তাই যৌবনের মুখোশ বদলেছে প্রেমের মতো প্রেমের যৌবনও নেই। এ যুগ অত্যাচারী। এ যুগ আর যাই হোক, হৃদয়ের যুগ নয়।

কিন্তু যুগ যাবে, যুগান্তর আসবে। আবার শৈশব আসবে, যৌবনও। ততদিন কি করব আমরা? কেন স্বপ্নমৃগয়া? স্বপ্নমৃগয়া তো সম্ভব। তাই রড লিখেছেন—

For every star that falls to earth a new one glows.
For every dream that fades away a new one grows.
When things are not what they would seem
You must keep following your dream.

এইখানেই ইতি টানি। আশ্বাসের সুরে। বিশ্বাসের স্বরে।

["Listen to the warm"–Rod Mckuen. প্রকাশক : Random House. New york. U.S.A. প্রকাশ কাল : ১৯৪৩ জুলাই]

।। হিল্লী-দিল্লী নয় প্যারিস-ট্যারিস ।।

হ্যাঁ মশাই, এবার হিল্লী-দিল্লী নয়। এবার আসুন এই বিলেত-ফিলেত প্যারিস-ট্যারিসের গপ্পো করা যাক। এই যে আমি ফুরুৎ করে দেড় মাসের এক চক্কর লাগিয়ে এলাম জুন মাসে, তারই একটা ভ্রমণবিত্তান্তো বেশ জমপেশ করে লিখে আপনাদের সামনে নিট হুইস্কীর মতো রাখছি। গতবার গিয়েছিলাম জবু টুরিস্টের মতো। ট্রাফালগার স্কোয়ারের পায়রা আর ইফেল টাওয়ারের ছবি, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারী, ফলি বার্জেয়ার, জেনিভার ঘাসঘড়ি আর মোমের কলোসিয়াম, মাদ্রিদের বুল-ফাইট আর বার্লিনের ডালেস হল এইসব ছিল য়ুরোপের ধারাপাত। এবার কিন্তু ওসবে নেই। এবার ওদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গেয়েছি, মানুষ আর মেয়েমানুষের যে ইউরোপ, তাই দেখেছি। মানে এক রসিক ইংরেজের ভাষায়—ওলড্ রুইনস্ না দেখে ইয়ং রুইনস্ দেখেছি এবার। Life দেখেছি। আর সত্যিকারের Life তো Life Magazine-এর পাতার মতো রঙিন নয়। তাতে সব shado রয়েছে। আর কালোটাই বোধ হয় একটু বেশী। বক্তিমে না দিয়ে আসুন গোড়া থেকে নির্লিপ্তভাবে শোনানো যাক। অবজার্ভেশন কতটা আর কতটা কনফেসন সেটা আপনারাই বিবেচনা করুন।

সান্টাক্রুজে যখন পৌঁছুলাম তখন রাত সাড়ে দশ। বন্ধু পঞ্চম (রাহুল দেব) বর্মণ তস্যপত্নী রীটা, পার্শি বন্ধু কাওয়াস ও তস্যপত্নী পরভীন (আগে এয়ার ইণ্ডিয়ার এয়ার হোস্টেস ছিলেন, সুতরাং এয়ার হোস্টেস বপের নামতা মুখস্থ করিয়েছেন উনি। ফল হয়নি। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে শচীন ভৌমিক সিডাকসনের স্কুলের খুব মেধাবী ছাত্র নয়)। বন্ধু প্রমোদ চক্রবর্তী এসেছিলেন বাই-বাই বলতে। টিকিটের পাতা ছিঁড়ে যে মেয়েটি বোর্ডিং কার্ড দিল সে এত রোগা যে লাইটের আলোতে দেয়ালের ছায়াটা ওর নিজের না হাতের পেন্সিলের ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। ওর ব্লাউজটা যদি অন্ধ হয়ে থাকে তাহলে হয়তো সে নিজেকে ব্লাউজ নয়, ভাবছে নেহাতই সে একটা টেবিল ক্লথ। আমার বিশ্লেষণ যখন বেশ ফিলজফিক্যাল হয়ে উঠেছিল, তখন পরভীন বলল—Stop your cynical tomtom and go to the custom, যার বাংলায় দাঁড়াবে মাস্টামো না করে কাস্টমে যাও। যেতে হল। বোকা বোকা চেহারার পাসপোর্ট ছবি দেখিয়ে ডিপার্চার সান্টাক্রুজের মোহর লাগিয়ে ওঠা গেল বাতাস-ফরাসীর বোয়েয়িংএ। যাচ্চলে, সবাই ঘুমুচ্ছে। জাপানী আকাশ-সেবিকা আমাকে সিটে বসিয়ে দিল। প্রথমে একটা বারো তেরো বছরের ছোকরা। ফরাসী ছোকরা। অতঃপর মুখ দেখে মনে হল ছোকরার ভগ্নী বছর আঠারোর হবে। যথাসম্ভব পা বাঁচিয়ে নিজের সিটে এলাম। ওরা দু'জনেই একেবারে ঘুমে কাদা। লক্ষ্য করলাম মেয়েটা মাইক্রোমিনি পরে আছে। এয়ার হোস্টেস চলে যেতেই ভাবলাম এ সুযোগ হারানো উচিত নয়। যৌবনশক্তির অপমান

করা অন্যায়। তাই প্লেন উড়তেই জুতোর ফিতে বাঁধবার অছিলায় নীচু হয়ে দেখে নিলাম। না। আছে। মানে মেয়েটির অন্তর্বাস। জাঙ্গিয়া জাতটার উপর রাগ হল মিনি স্কার্ট ডাকছিল সেই গানের মতো—"এই এদিকে এসো, এসো না প্লিজ।" আর জাঙ্গিয়াটা যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল। ফিকে নীল রঙের জাঙ্গিয়া। ব্যবহার করল অবশ্য লাল রঙের মতো। মানে, স্টপ। আণ্ডারগ্রাউণ্ড শত্রুদের তালিকায় মেয়েটার আণ্ডারওয়ারটাকে আনা যায় কিনা ভাবছিলাম আমি। স্লোগান দিলে কেমন হয়? —Down with Ladies under-wears! হঠাৎ লক্ষ্য করলাম প্লেনটা ক্রমাগত অলটিচুড্ ড্রপ করছে। এই মরেছে! আমি তো ডাউন উইথ বোয়েয়িং বলিনি বাপু। না কি প্লেন যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ সেহেতু বস্ত্রহরণ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করছে। কিন্তু মাভৈ. ফরাসী ইংরেজীতে সেবিকার ভাষণ এল,—আমরা করাচীতে নামা ি। ভাবলাম, যাক প্লেনকুমারী আমার রাজনীতির গভীরতা বুঝতে পারেনি। পারলে করাচীতে না নেমে আমাকে নিয়ে হয়তো রাঁচিতে নামতো। করাচীতে একজন প্যাসেঞ্জার উঠল। দেখে আনন্দ হল। কেননা সে আমার চেয়ে কালো. বেঁটে। অন্ততঃ একজন যাত্রীর চাইতে তো সুরূপ আমি। প্লেন উড়ল। এবার বেইরুট। লম্বা রুট। টোকিও, হংকং, ব্যাঙ্কক, বোম্বে, করাচী, বেইরুট, এথেন্স, প্যারিস। পিট্‌পিটে চোখ জাপানী হাওয়া-সেবিকাকে প্রশ্ন করলাম, প্যারিস কখন পৌঁছবো। জানালো কাল সকাল ন'টায়। বললাম—চট করে দু'টো দিয়ে ফেল। মেয়েটা ওর নিজের দুটো স্তম্ভিত ঢেউ-এর ওপর দু'টো চোখ বুলিয়ে ঢোক গিলে বলল—Two. what? বললাম—আবার কি, Two scotch Please. হাওয়াই জাহাজে হুইস্কী সস্তা, তাই হ্যাংলার মতো দু'টোই ঢক করে মেরে দিলাম। সাদা ঘোড়া হুইস্কী. সুতরাং পেটে গিয়েই রক্ত ধমনীর রেসকোর্স-এ গ্যালপ করতে আরম্ভ করল। চোখ বোজার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঠাণ্ডা লাগছিল। তাই আবার ডাকলাম পানচেরা চোখ আকাশচারিণীকে, বললাম—Blanket, will you give me a Miss? মেয়েটা বলল, Beg your pardon, মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম—I mean Miss, will you give me a blanket? মেয়েটা প্লেনের ওপরের র‍্যাক থেকে কম্বল খুঁজল, ততক্ষণ আমি ওর শরীরের ওপরের র‍্যাক দেখলাম। অতঃপর কম্বল মুড়ে পাশের ফ্রেঞ্চ মেয়েটাকে নিয়ে মনে মনে সুইডিস ব্লু ফ্লিমের চিত্রনাট্য বানাতে বানাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এথেন্সে একবার চোখ খুলেছিলাম কেননা ফরাসী মেয়েটার মাথাটা আমার কাঁধে নেমে এসেছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। ওর চুলের এসেন্সই আমাকে এথেন্সে জাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু. চুল যাক চুলোয়—বলে আমি আমার ঘুমের কোলে শিশু হলাম।

প্যারিস। এখানে আমি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার। লক্ষ্য, লণ্ডন। এয়ারপোর্টের গোলযোগের মধ্যে সবচেয়ে গোল দু'টো অপসৃয়মান গোলক লক্ষ্য করে বললাম,—লণ্ডনের প্লেন কত নম্বর গেটে? মেয়েটা ঘুরে বলল,—১৫ নম্বর। ফলো মি প্লিজ। এয়ার ফ্রান্সেরই এয়ার হোস্টেস। কিন্তু ওকে ফলো করতে করতে মনে হল Air Hostess-এর বানান হওয়া উচিত। Air Host-Ass. সত্যি, অন্ততঃ এই মেয়েটাকে তাই বলা উচিত ৩৮ ইঞ্চি হবে। একবার ভাবলাম প্রশ্ন করি ৩৮ না ৩৯? সাহস হল না। হিপের মাপ না ভেবে যদি বয়েস জিজ্ঞেস করেছি ভেবে রেগে যায়। থাক বাপু। ও মেয়ে ভেগে যাক আর তার পেছনে পেছনে আমি দৌড়ুতে রাজী, কিন্তু ও মেয়ে রেগে যাক এ আমি কিছুতেই চাই না। রাগী মেয়েদের আমি পছন্দ করি না। অনুরাগীদের কথা অবশ্য আলাদা। এতক্ষণ বোয়েয়িং-এ এসেছি। এটা ক্যারাভেল। দেড় ঘণ্টার ব্যাপার। রক্ষারশি মানে সেফটি বেল্ট খুলতে খুলতে আবার বাঁধতে হল। হিথ্‌রো এয়ারপোর্ট, লণ্ডন।

ইমিগ্রেশন অফিসার যে ব্যবহার করল সেটা ভালো লাগল না। বৃটেনের বর্তমান কানুন হল কমনওয়েলথের লোককে স্থায়ীভাবে বৃটেনে থাকতে না দেয়া। কিন্তু ইমিগ্রেশন ল'টাকে খারাপভাবে লাগানো হচ্ছে। সেটা হচ্ছে অভদ্র জেরা। আমাকে প্রশ্ন করল,—কেন এসেছি। বললাম,—সেক্সপীয়রের দেশে এসেছি সংস্কৃতির ছাত্র হিসেবে কয়েকদিন থেকে কালচার চেখে দেখব বলে। আরও ২/১টা আবোলতাবোল প্রশ্নের পর বললাম,—It's down-right insulting the way you are harrassing me. If it's the way Britain welcomes her guests. I am afraid my opinion of your country will be quite unbecoming. লোকটা অবশ্য আর বাক্যব্যয় না করে যেতে বলল। যে সিংহের দাঁত নেই, সে কামড়াতে পারবে না। তবু গর্জন করতে ছাড়ে না। যাকগে। লণ্ডনে নেমে মনটা একটু তেতো হয়ে গেল। এদেশে আমাদেরও যে কোন ইংরেজের জন্য VISA করা উচিত। শ্বেতবর্ণ বলে গলে গিয়ে 'ইয়েস স্যার' করার যুগ আর নেই। কিছুদিন আগে ক্যানাডা থেকে একজন ভারতীয় ছাত্র লণ্ডন এসেছিল তাঁর অসুস্থ বোনকে দেখতে। এয়ারপোর্ট ওকে ঢুকতে দেয়নি শহরে, আট ঘণ্টা এয়ারপোর্টে আটকে রেখে ফেরত যেতে বাধ্য করেছিল। সে খবর শুনে দিল্লীর টাইমস লিখেছিল—Britain is mother country to of commonwealth. If mother becomes neurotic the children have no reason to respect her. খাসা কথা।

কাস্টমসের বাইরে এসেই দেখা হল বন্ধু অজিত সিপ্পির সঙ্গে। মার্সিডিজ ২৩০ এস. এল. দাঁড়িয়ে। বললাম,—আমাকে হিলটনে ছাড়ো। বলল,—পাগল, তুমি আমার গেস্ট। থাকবে আমাদের হোটেলে। তথাস্তু, বলে বসলাম ওর স্পোর্টস কুপেতে। ওদের নিজস্ব হোটেল রয়েছে লণ্ডনে। কিংস কোর্ট হোটেল। গাড়ি সোজা হাইড পার্ক ঘুরে বেজওয়াটার রোড ধরে এসে ঢুকল লিনসটার গার্ডেনস-এ। এসে গেল হোটেলে। রুমে গিয়ে খানিক বিশ্রাম করে প্রথমেই ট্রাংককল করলাম প্যারিস। প্যারিস হিলটনে শাম্মী কাপুর সস্ত্রীক রয়েছেন। গলা শুনেই চেঁচিয়ে উঠল শাম্মি,—হে সিলি ওয়াইলডার, কব আয়া? বললাম,—এক ঘণ্টা হয়েছে। বলল,—কাল আসবি এয়ারপোর্টে। কালই আমি আসছি লণ্ডন। হামলোগ যেহনা প্লেজ ঔর ফিল্মস হ্যায় সব একসাথ দেখেঙ্গে। বললাম—সে জন্যই বসে আছি। গুডবাঈ পোপ। ফোন রাখলাম। শাম্মিকে আমি পোপ ডাকি আর আমাকে ও ডাকে সিলি ওয়াইলডার। বিখ্যাত পরিচালক চিত্রনাট্যকার বিলি ওয়াইলডারের নামটা বিকৃত করে নামকরণ করেছে ও। এবার জামা কাপড় ছেড়ে বাথটবে যাবার জন্য তৈরী হতেই লজ্জা পেলাম। একটা মেয়ে ড্যাবড্যাব করে আমায় দেখছে। ভাবলাম কি খচ্চর মেয়ে বাপু, নির্বিকার চিত্তে তাকিয়ে আছে। উদোম পুরুষ জীবনে দেখেনি যেন! কিন্তু ও মুখ খুলতেই আশ্বস্ত হলাম। নেহাতই টেলিভিশনের স্ক্রিনে মেয়েটা গান শোনাচ্ছে। টি. ভি.-টা যে এইমাত্র চালিয়েছি খেয়াল ছিল না। মিছেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। রিলাক্সড্ হয়ে সিগ্রেট ধরিয়ে শুনলাম। মেয়েটা গাইছে—

come to me arms, let's dance,
Darling, please. I hate the distance.

আবেদনটা হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব নয়। যত ইচ্ছেই থাক এ দূরত্ব ঘোচবার নয়। কেননা মেয়েটা আমার কাছে শুধু ছবি, শুধু পটে আঁকা ছবি। সুতরাং গরম জলের আলিঙ্গনই বেছে নিতে হল বাধ্য হয়েই। রেডি হয়ে গোটা চারেক চিঠি লিখে নীচে এলাম। সিপ্পি পরিবার আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সিপ্পি-কন্যা সেদিন বলল, দাদা, উইম্বলডন চলো। বেশ রোদ ঝরঝরে দিন। পিকনিকে যাওয়া যাক! আমার বান্ধবী লখীন্দর আসছে গাড়ি নিয়ে। দারুণ মেয়ে। নিজের গাড়ি

আছে। কম্পেনীও ভালো পাবে আর হৈ-হল্লাও করা যাবে। শুনে আমি এক পায়ে খাড়া। খানিক বাদে লখীন্দর এল তার গ্যালাক্সি গাড়ি নিয়ে। মেয়ে নয়তো যেন পটকা।

জান পহেচান হল। সর্দার-কন্যা লখীন্দর জন্মেছে এখানেই। বাপ ধনী ব্যবসায়ী। নিজে কাজ করে R. C. A. কোম্পানীতে। শাড়ি পরে, শাড়ি পরে নাভির নীচে, আর মিনি নাভির ওপরে। স্যরি। হাঁটুর ওপরে। হৈ-হল্লা করতে করতে আমরা এসে গেলাম উইম্বলডন। বেশ খোলামেলা জায়গা। বেশ গ্রাম গ্রাম ভাব। স্পট্ দেখে আমরা বসলাম এক জায়গায়। লখীন্দর মাঝে মাঝে লণ্ডনে হিন্দী ছবি দেখেছে। "অনুরাধা"র লেখক আমি শুনে ও গলে গেল। ওর রুচি বেশ ভালো বলে আর উচ্চ-বাচ্যই করলাম না যে "লাভ ইন টোকিও" বা "আই দিল বাহারকে" আমার লেখা। যেটুকু ভক্তি ম্যানেজ করেছি সব পাঞ্চার হয়ে যাবে। কতটা বলে হয়, আর কতটা চেপে যেতে হয় এই জ্ঞানটা ইদানীং আমার বেড়েছে। ফলে লখীন্দরের ধারণা হলে হিন্দী ছবির গল্প লেখকের জগতে আমি একজন কেষ্টবিষ্টু। ভালোই হল। লণ্ডনের দিনগুলি ওর কম্পেনীতে বেশ ভালোই কেটেছে। সবচেয়ে যেটা লোভনীয় ছিল সেটা হল রাইড। ওর গাড়ীতে। ফলে ট্যাক্সী খরচা খুব বাঁচিয়েছি। লক্ষ্মী মেয়ে লখীন্দর। প্রার্থনা করি ওর শ্যামল শরীরের ঢেউগুলো দীর্ঘায়ু হোক। হাসবেন না। আজকাল মেয়েদের আয়ু আশীর্বাদ দিতে নেই। আয়তনের আশীর্বাদ দিতে হয়। দীর্ঘ জীবন নয়, সুডোল যৌবনই শুধু ওরা চায়। যাই হোক, পিকনিক সেরে যখন ফিরলাম তখন লণ্ডনের ঘড়িতে সাড়ে ন'টা। আকাশে অনেক আলো, সন্ধ্যা হতে তখন আধ ঘণ্টা বাকি। ফিরে এসে কালার টি. ভি.-তে দেখলাম—প্রিন্স চার্লসের ইনভেস্টিচিওর উৎসব। মজার কসটিউম ছবি যেন। কালার টি. ভি এখনও জমেনি। সবুজ রংটা সর্বত্র এসে যায়। ফলে সাদা মুখ সবুজ দেখায়, সবুদ ঘাসও সবুজ! আর ঘন মেজেণ্টা রঙ। ফলে কেমন রং-এর সং মনে হয়। তবে ইমপ্রুভ করেছে। আগামী বছর মনে হয় ড্রাকুলার মত সবুজ মুখ দেখব না।

পরদিন এলাম এয়ারপোর্ট। প্যারিস থেকে এসে পৌঁছলো সস্ত্রীক শাস্ত্রী কাপুর। তার মানেই ঝড়। তারপর? তারপর ন'দিন লণ্ডনে যে কি ভাবে কেটেছে তা গুছিয়ে লেখা মুশকিল। সিনেমা, নাটক, রেসকোর্স, পার্টি, নাইট ক্লাব, প্লেবয় ক্লাব, ক্যাসিনো, লং ড্রাইভ, রেস্তোরাঁ, নগ্ন ছবি ও শপিং সেণ্টার। আমি ছাপোষা বঙ্গসন্তান একেবারে লাট্টুর মতো ঘুরেছি। ছ'সাতটা মেয়ের পেছনে লাট্টু হয়েছিলাম কিন্তু তাদের সঙ্গে লুটোপুটি করবার বেশি সুযোগই হয়নি। আরে মশাই এত হুটোপুটি করলে কি আর আয়েস করে লুটোপুটি করা যায়। সব কিছুর জন্যে চাই সময়। সাদা খাম আর সাদা কাগজকে তো আর কেউ প্রেমপত্র বলবে না। সাদা কাগজে চুমু-চুমু অক্ষর সাজিয়ে লিখতে হয়। নীচে মখমলের চটির মতো নিজের নাম লিখতে হয়। খামের বুকে জপমালার গুরুমন্ত্রের মতো প্রেয়সীর নাম লিখতে হয়। কলমের নিবকে হৃদয়ের দোয়াতে চুবিয়ে তবে সে গিয়ে হয় প্রেমপত্র। আর প্রেমপত্রে যখন এত ঝামেলা প্রেম করতে কতটা হবে ভেবে নিন। মেয়েদের শরীরের পৃথিবীতে সরাসরি তো আর বিষুবরেখায় পৌঁছুনো যায় না। উত্তর মেরু থেকে শুরু করতে হয় বা দক্ষিণ মেরু থেকে। শীতল মেরুকে উষ্ণ মরু বানাতে হয়। অতঃপর অন্বেষণ করতে হয় ওয়েসিস্। কিন্তু পথ এত জটিল যে পথ হারাতে হয় বারবার। আর সলিল চৌধুরীর গানের নায়ক আমি নই যে 'পথ হারাবো বলেই,' পথে নামব। ডেস্টিনেসন জানি। কিন্তু প্রেম হল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সব ইস্টিশনে থামে। থামাতে থামাতে যেতে হয়, বেজায় টাইম লাগে। থামতে থামতে ঘামতে ঘামতে জমাতে জমাতে কমসে-কম আধ ঘণ্টা লেগে

যায়। সত্যি মেয়েদের চরিত্রবল দীর্ঘস্থায়ী। পঁচিশ মিনিটের আগে কিছুতেই কোন মেয়ে মনোবল হারায় না। পঁচিশ বছরের যৌবনকে ওরা শ্রদ্ধা করতে জানে। প্রতি বছরের জন্য তাই একটি দীর্ঘ মিনিট রেশন করে রাখে। কম করে দুটো ড্রিংক। একটা ৪৫ রেকর্ড, কিছু লাভ-টক ও জিপ ফাসনার খোলার সময়টুকু ওরা নেয়। কিন্তু পঁচিশ মিনিট আধ ঘণ্টা সময় কোথায় আমার হাতে। তদুপরি শাম্মি-স্ত্রী নীলা বৌদির শাসন। ভারতীয় মেয়েদের চোখ সত্যি বলছি একেবারে সি. আই. ডি-র চোখ। প্লেবয় ক্লাবে বসে জুন বলে সোনালী চুল মেয়েটার সঙ্গে গল্প করছিলাম। উল্টো দিকে শাম্মি ও নীলা বৌদি বসে। মাঝে টেবিল। ডিসকথে। ফলে প্রচণ্ড জোরে বাজনা বাজছিল। একেবারে মিটমিটে আলো। এত আওয়াজে জুনের ২/১টি দ্রুত নিঃশ্বাস শোনার কথা নয়! কিন্তু নীলা বৌদি শুনলেন। হিন্দীতে প্রশ্ন করলেন,—শচীন, তোমার হাত কোথায়?

বোকার মতো প্রশ্ন। টেবিলের ওপর হাত রাখা ছিল। বললাম,—এই তো।

নীলা বৌদি ঃ ওঠা ডান হাত। বাঁ হাতটা কোথায়? তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। খুঁজে, পেতেই বললাম—এই তো। জুনের হাঁটুতে রেখেছি। এতে দোষটা কি?

বৌদি ঃ দোষ আছে। কেন না ওটা হাঁটু নয়। তাকিয়ে দেখলাম বৌদি ইজ রাইট। হাত সরিয়ে বললাম,—মাইরি, আমার দোষ নয়। ফ্রক পরা মেয়ে। যেখানে ফ্রক শেষ হয়েছে সেটা স্বভাবতই হাঁটু হবে ভেবেছিলাম। আমি কি করে জানব মিনিফ্রক এত ছোট হয়েছে আজকাল যে যেখানে ফ্রক শেষ হয়েছে সেটা হাঁটু নয়, কুঁচকি।

বৌদি ঃ এখন তো জেনেছো। ভবিষ্যতে ইংরেজ মেয়েদের হাঁটু যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে খুঁজো না।

বললাম,—ও. কে,। খুঁজবো না

দেখলেন তো কি বিপদ। এবার বলুন যাবেন বিলেত? কি লাভ? যে দেশে মশাই হাঁটু আর ফ্রকে এত দূরত্ব সে দেশে গিয়ে কি লাভ। আর উরুতে হাত দিয়েছেন কি বৌদি শ্রেণীর ভারত ললনাদের ভুরু কুঁচকে উঠবে। ফলে উরুবক বনে যাবেন আপনি। মানে বুড়বক।

এবার লণ্ডনের ফিরিস্তি শোনাই এক নিঃশ্বাসে। প্লেবয় ক্লাব বেশ লেগেছে। বিশেষ করে "বানি" মানে খরগোশ-কান পোশাক পরা পরিচারিকাদের। এত সংক্ষিপ্ত পোষাক, এত অর্ধেক বুক ও চার ভাগের তিন ভাগ শ্রোণীদেশ বাস্তুহারার মতো খা খা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বা বলতে পারেন খাই খাই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন রয়েছে। আপনি ক্লাবে ঢোকার সময় সামনে টি, ভি,-তে নিজেকে দেখতে পাবেন। ডিসকথে দারুণ। নিগ্রো গায়ক-গায়িকারা চমৎকার গান করে। খাবার খুব ভালো সস্তাও। বিশেষ করে বুফে খাবার। ক্যাসিনো চমৎকার। রুলেট, আমেরিকান ডাইস, পুন্টো ব্যাংকো, ব্ল্যাকজ্যাক যা ইচ্ছে খেলতে পারেন। V. I. P. Room-টাও বেশ। ক্যাবারেও ভালো। ফলে চট করে প্লেবয় ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেছি আমি! এছাড়া চমৎকার খাবার জায়গা হল সুইস সেন্টার। ভারতীয় অনেক রেস্তোরাঁ রয়েছে। বেস্ট হল গেলর্ড। তাছাড়া ভালো লেগেছে গীতাঞ্জলি, মমতাজ, শাজাহান ও স্ট্যাণ্ডার্ড। চাইনিজ বেস্ট লেগেছে লোটাস হাউস। বীচকম্বার দারুণ জায়গা। হিলটনের ট্রেডারস ভীকে যাওয়া উচিত পলিনেশিয়ান খাবার জন্য। রুফ গার্ডেন চমৎকার হল দুটি—হিলটন ও রয়েল গার্ডেন।

রীতিমতো শকিং গীতিনাট্য দেখেছি HAIR, তা চুল দাঁড়িয়ে যাবে। গানে তো চার অক্ষরের সেই ইংরেজী শব্দের ছাড়াছড়ি, যে শব্দটা ওরা দেহসংগমের জন্য ব্যবহার করে। এ ছাড়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ দৃশ্য রয়েছে। ছেলেমেয়েদের সামনে থেকে নগ্ন দেখানো

এই প্রথম। এমন কি নগ্ন ছবির জন্য যেসব মেয়েরা পোজ দেয় তারা যৌন কেশ রাখে না। এ নাটকে সে রুচিরও বালাই নেই। নগ্ন শরীর যৌন কেশটেশ সবই দৃশ্য! বলাবাহুল্য এজন্য এ নাটকের টিকিটই পাওয়া যায় না। তিন বছর ধরে চলছে। তা' সত্ত্বেও এডভান্স বুকিং চার মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে। যদিও এত নগ্নতা ও অসভ্য কথা সত্ত্বেও Erotic লাগেনি। সমষ্টিগত নগ্নতা আসলে Erotic নয়। দ্বিতীয়ত চমকটা এত দ্রুত যে effect-টা হয় রীতিমতো comic, আর নগ্ন শরীরের আবেদন প্রখর আলোকে কেমন-যেন pathetic. বোধহয় নগ্ন শিশু দেখার অভ্যেস বলে ওদেরকে কেমন অসহায় লাগছিল। মোটকথা বাধানিষেধ ডিঙানোর যে একটা প্রবল বাসনা মানুষের মধ্যে থাকে তারই exploitation হল এই নাটক। Sex আর Violence প্রত্যেক মানুষের দ্বিতীয় সত্ত্বার ক্ষুধা। সে ক্ষুধার সামগ্রীই হল HAIR আর জেমস বণ্ডের ছবি। সে বিদ্রোহ ওদেশের যুবসমাজের মানসিকতাকে আজ প্রবল নাড়া দিয়েছে। তাই হিপির আন্দোলন সমস্ত প্রতিষ্ঠিত মূল্যায়নকে অস্বীকার করার নেতিবাচক দর্শনই হল পশ্চিমী যুবসমাজের দর্শন। দুঃখ, এই বিরাট শক্তির এটা বড় করুণ অপচয়। Negative force তো শুধু ভাঙন, অবক্ষয়। আর অবক্ষয় যদি মানবজাতির সভ্যতার ভবিষ্যৎ হয় তবে আগামী যুগ দাঁড়াবে কিসে?

সভ্যতা তো উর্বরতার ফসল, বর্বরতার ফসিল নয়। পথেঘাটে অজস্র হিপি, নৈতিকতার অভাব, সর্বত্র নগ্নতা ও যৌন স্বাধীনতা এসব ভেবে ভেবেও HAIR-এর সাফল্যে দুঃখ হয়েছে। HAIR-এর হতাশা থেকে কিছুটা মুক্তি দিয়েছে অন্য একটি চমৎকার নাটক—নাম Fiddler on the Roof. সুস্থ, সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী। যেমন ভালো লেগেছে জিঞ্জার রজারস্-এর MAME গীতিনাট্য। কিন্তু তেমনি আদিরসাত্মক কমেডীতে সেই সেক্স দেখলাম Not Not Now Darling-এ। অপূর্ব অভিনয়। অভিনয়-উজ্জ্বল আরেকটা নাটক দেখলাম BOY FROM THE BAND. বিষয়? বিষয় হল সমমৈথুন। ছবিরও ঐ এক জাত। 'I am Curious Blue' ও 'I am Curious Yellow' দেখলাম। উল্লেখযোগ্য দৃশ্য সুইডেনের রাজপ্রাসাদের সামনে রাস্তার পাঁচিলে বসে ওদের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে যৌনক্রীড়া! এরপর আর বলবার কিছু নেই। "Seredish Fanny Hill" ও তাই। "১৭" ও তাই। ভালো ছবি বলতে দেখেছি "The Graduate", "Lion In The Winter" আর ত্রুজোঁর "Stolen Kisses", বাকি একগাদা টিপিক্যাল মার্কিন ছবি দেখেছি যেমন—"Thomas Crown Affair", "The Itailin Job", "The Myerling, "Boston Strangler", "A Place For Lovers", "The Secret Ceremony" ও কুখ্যাত সেক্স কমেডী "Can Heironymus merkin ever forget Mercy Humppe and find true happiness". নামটা দেখেছেন? ওদের বিজ্ঞাপন থাকত Forget the name, See the movie. ছবি তো নয় উদোম ছেলেমেয়েদের গুদোম।

লণ্ডনে চেলসি অঞ্চলটা বড় ভালো লাগে আমার। বিশেষ করে ড্রাগ স্টোর রয়েছে একটা, যার সাজানো দেখে মাথা ঘুরে যায়। সোহো'র রাত্রির জীবনও দেখলাম। সবচেয়ে ভালো লণ্ডনের পাব্স। মদিরালয়গুলোর চরিত্র আছে। সেজন্য পাবক্রলিং করাও একটা মজার অভিজ্ঞতা। তাতে সত্যিকারের জনসাধারণের সঙ্গে মেশা যায়। জানা যায়। বৃটেনে এখন বেশ বর্ণবিদ্বেষ রয়েছে। জনৈক পাওয়েল সাহেব অবশ্য এখন বৃটেন থেকে এশিয়াবাসীদের তাড়াতে ব্যস্ত। তাঁর বক্তৃতা রীতিমতো মার্কিন কু ক্লুক্স ক্ল্যানের মতো। ওর মত হল কালোদের মাথাপিছু ১০০ পাউণ্ড (১৮০০ টাকা) দিয়ে তাড়াও। শ্বেতবর্ণ বৃটিশরা বেশির ভাগ তাই চায়। মুখ ফুটে বলে কম। অবশ্য লণ্ডন শহরে এই বিদ্বেষভাব বোঝা যায় না।

আমরা যেমন বিলেতে মেম খুঁজি স্বাদ বদলাতে, ওদেশের সাহেবরাও শাড়িপরা মেয়ে সম্বন্ধে পাগল। মুখ বদলাতে কে না চায়। ফলে যে কোন হোটেলে নীলা বউদি বা রমেশ-পত্নী গীতা সিপ্পিকে নাচবার আমন্ত্রণে আমন্ত্রণে জ্বালিয়ে মারে ওরা। শাড়ি হোক বা মিনি, ভেতরে তো বাপু একই এনাটমী, তা সত্ত্বেও ওদের শ্যামলী শাড়ি পরা মেয়ে দেখলেই চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। রাস্তায় একবার সোনী সিপ্পিকে একটা ছেলে গাড়ি থামিয়ে বলল,—এক কপ চ। এক কপ চ। প্যায়ার করেগা। বুঝুন ঠ্যালা। কোত্থেকে বেটাচ্ছেলে হিন্দী শিখেছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা। তাই তার মেয়েধরা ফাঁদ—এক কপ চ। কাপও নয়, চাও নয়। কপ আর চ! পেয়ার করেগা! ইল্লি আর কি।

একটা মজার জিনিস দেখলাম, ভারতীয় পুরুষরা যেমন মেমকে শয্যাসঙ্গিনী করা বিরাট কৃতিত্ব মনে করে ভারতীয় মেয়েরা কিন্তু সাহেবদের সঙ্গে শোবার জন্য পাগল নয়। যে কয়টি ভারতীয় মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছি তারা দেশী ছেলেই বেশি পছন্দ করে, বিদেশিদের সম্পর্কে উৎসাহ কম। কারণটা মনস্তত্ত্ববিদরা ভেবে দেখতে পারেন।

দেখতে দেখতে লণ্ডনের ৮ দিন কেটে গেল। শাম্মী কাপুর ও স্ত্রী রওনা হয়ে গেল বোম্বের উদ্দেশ্যে। নীলা বউদি বললেন,—ডোণ্ট বি নটি ইন দা কণ্টিনেণ্ট। বললাম,—কক্ষনো না।

এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেন উড়তেই ভাবলাম, না, নটি হবো না, ইওরোপ আমি এসেছি খাঁখি ভজন গাইতে? নটি হবো না তো হবো কি? শুধু খাবো দাবো আর ফ্যাটি হবো?

সুতরাং সে সন্ধ্যায় জুনকে ডেকে ছবি দেখতে গেলাম। ছবির নাম Baby Love, বেশ লাগল। না, ছবি নয়, জুন। আমি জুলাই-বর্ন। সুতরাং আমি হলাম জুলাই। স্বভাবতই জুনকে জুলাই না দেখিলে কে দেখিবে!

ওকে ভারতীয় মন্দির সম্পর্কে খুব জ্ঞান দেয়া গেল। বিশেষ করে কোনারক আর খাজুরাহো। আমার পাণ্ডিত্য ওকে মুগ্ধ করল। বক্তিমে বন্ধ করতেই বলল ও,—Do you know why I like you so much?

Why। প্রশ্ন করলাম।

Because you know how to stop talking. বলা বাহুল্য এরপর বাক্যস্ফূর্তি হয়নি আমার।

পরদিনই এস. এ. এস. ডি. সি. ৯ প্লেন যোগে সোজা চলে এলাম কোপেনহেগেন। ডেনমার্ক। এয়ারপোর্ট থেকে নেমেই প্রেমে পড়ে গেলাম। ডেনমার্কের নিজস্বতা আছে। পুরোন য়ুরোপের গন্ধ রয়েছে এর চেহারায়। কোপেনহেগেন আর স্টকহল্ম। মানে ডেনমার্ক আর সুইডেন। এ'দুটি দেশ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় খবর হল এরা যৌন স্বাধীনতার চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে! অশ্লীলতার ওপর কোন সেনসার নেই এ দুটো দেশে। পর্নোগ্রাফী এখানে ফ্রি। ডেনমার্কের বিখ্যাত পায়ে চলা পথের শপিং সেণ্টারের নাম স্ট্রয়া। দু'দিকে অজস্র রঙিন কামকেলীর রঙিন ছবির পত্রিকা ও বই। কোনারকের বা খাজুরাহের যাবতীয় পাথুরে কামভঙ্গীর জীবন্ত রূপ। সম্ভব অসম্ভব যৌনক্রীড়ার ছবির পৃথিবী। এ যেন নরনারীর মাংসের বাজার। স্বভাবতই টুরিস্টদের ভীড় সেখানে। সত্যি বলতে কি, আমার বমি বমি লাগছিল। ডি. এইচ. লরেন্স বলেছিলেন, God has terrific sense of homour—কেননা নরনারীর যৌনসঙ্গমের সময় যে উদ্ভট পজিসন হয় সেটা বড়ই শ্রীহীন ও কৌতুকজনক। এমনকি যৌনাঙ্গের স্থাননির্বাচনও ঈশ্বরের রসিক মনেরই পরিচয়। শরীরের অপচয় নিষ্কাশণ পথের সঙ্গে যৌনসুখের প্রত্যঙ্গ যুক্ত। এটা লরেন্সের মতে ঈশ্বরের প্রভুত্বের নিদর্শন। লরেন্স বলতে চান, ঈশ্বরের বড্ড corry sense of humour, ও'র মতে ঈশ্বর কিঞ্চিৎ sadist! স্ট্রয়ার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে

লরেন্সের মতের স্বপক্ষেই ভোট দেবার ইচ্ছে হল কিন্তু আমার। সার্কাস যেন এসব! সার্কাস অফ সেক্স!

ওখানে এক দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল। প্রফেসর পল জোরগেনসন ও তস্য পত্নী ইরীন। ভদ্রলোক কিন্তু যুক্তিতে আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক হিন্দুধর্মের বই প্রচুর পড়েছেন। আর ইরীন হল রীতিমতো সোনালী চুল সেক্সপট্। কমসে কম ৩৭" ২৩" ৩৮" হবে। কথা হচ্ছিল স্কেণ্ডিনেভিয়ান দেশের অশ্লীল সাহিত্য মুক্তির মূল্যায়ন সম্পর্কে।

ওঁদের যুক্তি হল এটা সভ্যতার পক্ষে মোটেই ক্ষতিকারক নয়। সুইডেন, ডেনমার্কে pornography-এর ওপর নিষেধ উঠে যাবার পর বলাৎকার-এর case কমে গেছে। crime rateও কমেছে। মানসিক রোগীর সংখ্যা কমেছে। বললেন, যৌনকর্মের চেয়ে ক্ষতিকারক যৌনচিন্তা! আর দাবিয়ে রাখা যৌনচিন্তা বিকারের রূপ নেয় তাতে সুস্থ energy খারাপ পথে চলে যায়। খুনী, ডাকাতি থেকে নেশা করা ও নানা মানসিক বৈকল্যের কারণ হয়। বললেন, ডেনমার্ক বা সুইডেন যে সব অগ্রগতির পথে ছিল তা তো হারিয়ে যায় নি? প্রফেসার, বৈজ্ঞানিক কি নেই, ইণ্ডাস্ট্রি কি বাড়ছে না? কোন বিষয়ে আমরা অন্যান্য ইয়োরোপীয় রক্ষণশীল দেশ থেকে পিছিয়ে আছি বলো? চুপ করে থাকলাম। কেননা সেদিনই কাগজে পড়েছি কমার্শিয়াল এভিয়েশন-এ প্রথম মহিলা পাইলট জেট প্লেন চালাচ্ছেন। সারা পৃথিবীতে একজনই। সে একটি ডেনিশ মেয়ে। পল সাহেব আরও বললেন,—তোমাদের দেশ কি করে এত রক্ষণশীল হলো বলো তো? সত্যি বলতে হিন্দুধর্মের মাইথোলজি হচ্ছে সবচেয়ে যৌনবিষয় আলোচিত চর্চিত সাহিত্য। লর্ড কৃষ্ণ গোপীদের কাপড় তুলে নিয়ে সেসব দিনেই strip tease করেছেন, দ্রৌপদী পাঁচ স্বামী নিয়েছেন, কুন্তীর সন্তান কর্ণ স্বামীর নয় সূর্যের সন্তান, আর মুনি ঋষিরা তোমাদের ধর্মে বিয়ে করেছে বা যৌনকর্ম করেছে তাতে ধর্মের কোন হানি হয়নি। এত জীবননির্ভর ধর্ম পৃথিবীতে দুটি নেই। কোনারক, খাজুরাহো থেকে বাৎস্যায়নে সুষ্ঠু কামকলা আর যৌনশিল্প হল যৌনবিজ্ঞান। তাহলে তোমরা কিছু শেখোনি। তোমরা রক্ষণশীল হয়েছ। অথচ যৌনসম্পর্কে সবচেয়ে কুফল তোমাদের দেশেই। সেটা Over population. জন সংখ্যার চাপে তোমাদের দেশ আগে বাড়ছে না। যৌনচিন্তা তোমাদের দেশে পাপ, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ানো বুঝি পুণ্য? ভদ্রলোক ক্ষেপে গিয়ে Nirad C. Chowdhury মশাইর একটা বই দিলেন। বললেন, পড়ো, Written by a Bengali only. বইটা সত্যি ভালো। এখানে ওঁর একটা উদ্ধৃতি দেয়া যাক—From the Rigveda down to the epics, especially the Mahabharata, one faces a consistent attitude towards sex life. It is based on a frank acceptance of the flesh, gusto in sexual pleasues, and is marked by a total absence of any kind of forced continence and, of course, sense of guilt. I shall give only one example of the frankness and that from our most venerated book, the Rigveda In it Indrani, the Queen Goddess, defies the vivility of her lord, Indra the kind God in these words. No sese yasya rambate'ntara Sakthya' Kaprit, Sedise yasya romasam niseduso viyrimbhate.

He achieves no—he whose penis hangs limp between the thighs;
Achieves he alone whose hairy thing swells up when he lies.
Rigveda : Mandala × Sukta : 86 Verse : 16

ইন্দ্রপত্নী শচীকে খুব সতীরূপ বলে মানা হয়। 'স্বর্গরাজপত্নী শচীর মতো স্ত্রী হও—' এ আশীর্বাদ দেওয়া হয়ে থাকে সুকন্যার বিবাহে। আবার দেখুন—In later

erotic literature the most aggressive posture in which a woman could offer herself to a man came to be called "Indrani"—poor goddess!

–Pages 225 + 226

"The Continent of Civa"

–Nirad C. Choudhury

তাহলেই দেখুন পল সাহেবের যুক্তি তথ্যনির্ভর। হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ভদ্রলোকের বিশ্লেষণ সত্যি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ওঁর মতে,—"এ যুগের প্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে গেলে রক্ষণশীলতা আর চলে না। জোর করলে লাভ হবে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সব আমেরিকার মতো হিপি বা ইপি হবে আর নানারকম নেশাভাঙ করবে। আমাদের দেশে সে অসুস্থ বিদ্রোহের সমস্যা কম।" সত্যি বলতে, সত্যিই কম। হয়তো নতুন যুগের বার্তাবাহক সুইডেন ও ডেনমার্কের এই মুক্ত আন্দোলন। অন্ততঃ চট করে ওদের নচ্ছার বলা যাবে না। ছিঃ ছিঃ এত্তো জঞ্জাল বলার আগে দু'বার ভাবতে হবে। হবে কি না বলুন। ৮ দিন বেশ উড়নচণ্ডীর মতো ঘুরে ও ওদের মুক্তজীবনের চিত্র দেখে ও কতিপয় ভালো বন্ধু বানিয়ে আমি চলে এলাম সুইজারল্যাণ্ড। জেনিভা। জেনিভা ছোট্ট শহর। লেক আর ঘড়ি আর ব্যাংক। তবে অন্যান্য হেক্কার মার্কা শহরের চেয়ে শান্ত। জীবন এখানে শ্লথ,—সত্যি বলতে অন্যান্য য়ুরোপী শহর থেকে অনেক কমবয়সী মনে হয় জেনিভাকে। বাকি শহরগুলো তো সোমত্ত বারবণিতা। কিন্তু জেনিভা কুমারী ষোড়শী যেন। লেকের ধারে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে আমি জেনিভায় Mario Puzo-এর লেখা বেস্টসেলার "The God Father" যোগ করেছি। একদিন অবশ্য ট্রেনে করে ইন্টারলকেন ঘুরে এলাম। অতঃপর জুরিক। জুরিক থেকে উড়লাম সোজা প্যারিস। সুইজারল্যাণ্ডে সত্যি বলছি নিরামিষ জীবন কাটিয়েছি। বিশ্রাম করেছি। সুইজারল্যাণ্ড দেশটাই জীবনকে আবেশে আলস্যে উপভোগ করার দেশ। সেজন্য সুইস্ ঘড়ি দেখেছি বেশী আর সুইস্ মেয়ে দেখেছি কম।

প্যারিস এয়ারপোর্টে নেমে প্রথম সমস্যা হল হোটেল। এবার এত টুরিস্ট যে হোটেল পাওয়া এক সমস্যা। তা মেয়েটা ফোনের পর ফোন করে গেল। ক্যালিফোর্ণিয়া হোটেল। রু দ্য ব্যারীতে হোটেল। প্রায় সাঁজালিজেঁর ওপরই। স্লিপটা হাতে নিয়ে এলাম ট্যাক্সী স্টপে। যেটা আমার বরাতে জুটল সেটার চালক মানে চালিকা একটি মেয়ে। বয়েস পঞ্চাশ হবে। বাকি মাপও এই পঞ্চাশ হবে। মানে ৫০" ৫০" ৫০"! কপাল আমার। প্রথম যে ফ্রেঞ্চ মেয়ের সান্নিধ্য হল সে মেয়ে নয় দিদিমা। তাও ইফেল টাওয়ারের বোন বোধহয় এই ফিমেল টাওয়ার। মেয়েরা ৩০ পেরোলেই প্যারিস শহর থেকে বার করে দেয়া দরকার। রোমাণ্টিক শহর প্যারিসে টুরিস্ট আসে রোমাণ্টিক সাথী খুঁজতে, জায়গাণ্টিক হাতী খুঁজতে নয়। যাকগে। হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে দেখলাম দুরন্ত বেগে গাড়ি চালিয়ে ভদ্রমহিলা আমাকে রু দ্য রিগল ধরে মার্কিন এমবেসীর পাশ দিয়ে সোজা সাঁজালিজেঁ নিয়ে এসেছেন। সামনে বিরাট গেট আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ। সেটা পৌঁছবার একটু আগে বাঁয়ে বেঁকে গেলাম—একটু যেতেই এসে গেল ক্যালিফোর্ণিয়া হোটেল। নেমেই চোখ জুড়োলো। না প্যারিস প্যারসই, রাবিশ নয়। ওই তো সামনে একটা মেয়ে। সোনালী চুল, নীলাভ চোখ, গোলাপী নয়, লালাভ ঠোঁট, সলাজ চাউনি, নিলাজ বসন। কে জানে নাম কি। লড ম্যাককুইনের কবিতা মনে হল।

Do not tell me your name
why you came to town
what you like to do on Sunday

your favourite poet
movie
comic strip
your age and next of kin in case
of accident
Say instead that I am warm
let your touch talk
let the motion in the darkness speak
then go away if you must
but not while I am looking.

বেশ কবিতাটি, না? মেয়েটাও তাই। বেশ। দেখেই বললো—বর্জু মঁসিয়ে। ইওর পাশপোর্ট প্লিজ। দিলাম। মেয়েটি রিসেপসনিস্ট। ও আমার হোটেল বুকিং করল ততক্ষণ আমি অবশ্য লুকিং করলাম। চাবিটা পেতেই চলে এলাম কামরায়। এসেই খুলে বসলাম। না, বসন নয়, ভিশন। মানে টেলিভিশন। কেননা সারা য়ুরোপ এখন টি. ভি.র সঙ্গে আঁটা। কারণ নীল আর্মস্ট্রংদের এপোলো ১১-এর চাঁদযাত্রা দেখা। সুতরাং দুত্তোর ফরাসী মেয়ে, বলে মার্কিন আকাশযাত্রীদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লেগে গেলাম। স্যাণ্ডইউচ আর লাগার আনিয়ে জুৎ করে বসলাম। প্যারিসে এসে টি. ভি.-র সুযোগে মুনল্যাণ্ডিং দেখব না এতো হতে পারে না। এখন যদি এলিজাবেথ টেলর বা তনুজা আমার কাছে এসে বিবসনা হয়ে উপাসনা করে তাহলেও আমি নড়ছি না। সত্যি, মুনল্যাণ্ডিং দেখাটা আমার জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতা। লিভ টেলিভিশনের কল্যাণে চোখের সামনে ওদের চাঁদের মাটিতে পা ফেলা, একবার তারে লেগে পড়তে পড়তে সামলে নেয়া (পড়লে ওঠা ভীষণ শক্ত। একে তো মাধ্যাকর্ষণ এত কম, দুই ঃ পোশাক এত উদ্ভট যে ব্যালেন্স হারালে মুশকিল।) ফ্ল্যাগ লাগানো, টি. ভি. ক্যামেরা সেট করা। সিসমোগ্রাফ রাখা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সাজানো সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। চাঁদের মাটি ছাই রঙের, তাতে এত মিহি ধুলো যে ওদের পায়ের ছাপে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল যে ছাপ লক্ষাধিক বৎসর এভাবে থাকবে যেহেতু চাঁদের উপর হাওয়া নেই, সেহেতু বিনাশ বা ক্ষয় নেই। চাঁদের উপর রোদে ওদের দুজনের সাদা পোশাকে বেশ গ্লেয়ার হচ্ছিল। আর চাঁদের গভীর গর্তগুলো অন্ধকার দেখাচ্ছিল আর সি অফ ট্রাংকুলিটির সমতলভূমি ঝকঝক করছিল। সত্যি, এ এক অভিজ্ঞতা। ওরা খানিকটা পাথর মাটি ব্যাগে ভরে নিল পৃথিবীতে আনবার জন্য। মজার ব্যাপার, নিউ ইয়র্কের এক জুয়েলার চাঁদের বালি বিরাট দামে কিনতে চেয়েছেন। কেন। মেয়েদের জন্য উনি মুনডাস্ট্ লকেট করবেন! উনি হীরের চাইতে বেশী দাম দিতে চাইছেন। যদিও স্পেশ কর্মপরিষদ অস্বীকার করেছেন বেচতে! আমেরিকা সত্যি পাগলে ভর্তি। হ্যাঁ, ভালো কথা, চাঁদে তাকে দেখতে পেলাম না। সেই যে বুড়ি বসে চরকা কাটে। না, তাকে দেখা গেল না। বুড়ি বোধহয় আর্মস্ট্রং আসার আগেই চরকা তুলো ইত্যাদি নিয়ে মঙ্গলগ্রহে চলে গেছেন।

যতক্ষণ না ওরা মোড়ুল চাঁদ থেকে উঠে মাদারশীপে জুড়ে চাঁদ ছেড়ে না বেরোল ততক্ষণ আমিও ঘর থেকে বিরুইনি।

সাফল্যমণ্ডিত যাত্রা শুরু দেখে আমি বেরোলাম। ভাবলাম বিদেশী খাবার খেয়ে খেয়ে পেটে তো জন্তুজানোয়ারের আখড়া বানিয়ে ফেলেছি, এবার একটু দেশী খাবার খেতে হয়। নিউইয়র্ক টাইমস—এর প্যারিস এডিশন খুলেই দেখলাম অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁর বিজ্ঞাপন। ভারতীয় ভোজনাগার। ঠিকানা—রু দ্য ব্যারি। ও হরি, এটা তো এই

হোটেলের রাস্তাতেই। কপাল ভালো। হোটেল থেকে এক মিনিট হাঁটতেই পেয়ে গেলাম "অন্নপূর্ণা।" ঢুকেই শান্তি পেলাম। যাই বলুন শাড়ির মতো পোশাক হয় না। যে সব মেয়েরা সার্ভ করছে তারা সবাই ভারতীয় নয় কিন্তু ফরাসী মেয়ে ক'টিও সুন্দর শাড়ি পড়েছে। এয়ার হোস্টেসের মতো এক রঙের শাড়ি ব্লাউজ। সত্যি মনটা জুড়িয়ে গেল। মিনি বা মাইক্রো হোক বা নিউডিস্ট হোক মেয়েরা বেশী কমনীয় ও রমণীয় দেখায় শাড়িতে। এমন কি অনেক বেশী sexy. কেননা অদৃশ্যের আকর্ষণ অনেক বেশী। পেট ভরে খেলাম। খাবার ভালো ছিল না, মেয়েগুলোর ব্যবহার ভালো ছিল বলতে পারব না। তবে পেট ভরল বেশ।

অতঃপর বেরুলাম প্যারিস ভ্রমণে। লুভার ল্যাফ্‌ট ব্যাংক বা মমার্ত গতবার দেখেছি, তাই এবার চলে গেলাম ভার্সাই, চলে গেলাম ফন্টেন ব্লু, চলে গেলাম স্যাম্পেন গ্রামে। সত্যি চেহারা আছে। ফ্রান্সের অতীত অপূর্ব। কয়েক সন্ধ্যা স্রেফ সিন নদীর ধারে বসে কাটিয়ে দিয়েছি। অবশ্য ক্রেজী জর্স সেলুন বা মূলা রুজ-এ যাইনি তা নয়। লিডোতেও। গিয়েছি কিন্তু স্ট্রিপটীজের আর এখন মূল্য বেশী নেই।

রাস্তাঘাটে এত স্বল্পবাস মেয়ে দেখা যায় যখন strip tease দেখতে খরচা করে নাইট ক্লাবে যাওয়ার মানে কি। সত্যি, ওদের ব্যবসা বেশ মন্দার দিকে। ইওরোপে যা মুড এখন তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে বিবাহ অফিস, চার্চ আর নাইট ক্লাব সব উঠে যাবে! প্যারিসে হিপি একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। ওদের সঙ্গে পুরোন একটা গাড়িতে (সিট্রন) করে চলে গেলাম কাপ্রি পর্যন্ত। দু'টি ফরাসী ছেলে আর একটি মার্কিন মেয়ে এই তিনজন। এণ্টন, লুই আর বারবারা। বারবারার ডাকনাম বাব্‌স্‌। যেহেতু আমি পয়সা খরচা করে ওদের খাওয়াতে রাজী, তাই আমাকে সঙ্গে নিল। সত্যি, অদ্ভুত জীবন। নাওয়া-টাওয়ার ব্যাপার নেই, পোশাক হল আমাদের দেশী ঢোলা পাঞ্জাবী আর জীন্‌স্‌। চুল দাড়ি কাটার বালাই নেই, বিয়ে-ফিয়ের ঝামেলা নেই, গলায় পুঁতির মালা আর গাঁজা টানার সখ। যেখানে সেখানে খাওয়া, নেশা করা, মলমূত্র ত্যাগ বা রতিক্রীড়া—যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব এরা। ফিলজফি? তাও আছে। Peace. Make Love Not War. Don't Fight ও অতঃপর ইংরেজী চার অক্ষরে সেই ফকারও কথাটা ইত্যাদি! বুদ্ধি যে কম তা নয়। কথাবার্তায়। মাঝে মাঝে হিউমারও পাওয়া যায়। বলে হিন্দুধর্মের কৃষ্ণ ভগবানের ভক্ত ওরা। ভক্ত না কচু, হরেকৃষ্ণ বলে নোংরা জীবনযাপন করলেই যেন হিন্দুধর্ম বোঝা যায়! বাব্‌স্‌-এর রসিক মনটা বেশ মজার। নমুনা দিই। একবার প্রশ্ন করলাম,—তুমি মেয়ে হয়ে ভবঘুরে জীবন যাপন করছ, অসুবিধা হয় না? বলল,—"না, অসুবিধা আর কি। এনাটমিক্যালি আলাদা এ ছাড়া পুরুষের সঙ্গে কি তফাৎ বলো। ওরা যা করে আমরাও তা করি। নেশা, ঘোরা, মন্ত্র পড়া আর establishment-এর বিরুদ্ধে Fight করা—সব করি। হিপিদের মেয়ে পুরুষ নেই, আমরা হিপি, এই আমাদের ধর্ম। তারপর হেসে বলল,—এক এক সময় কিন্তু মেয়ে হওয়ার জন্য কষ্ট হয়। সেটা হল শীতকালে। চারিদিকে বরফ, কনকনে ঠাণ্ডা। তখন হয়তো ব্লাডারে চাপ পড়ল, উপায় নেই, বায়লজিকেল ফাংশান তো বন্ধ রাখতে পারি না, টিংকল পেলে টিংকল করতেই হয়। তখন ছেলেদের উপর হিংসে হয়। ওদের আর কি একটু জিপ ফাসনার খুললেই কাজ সারা, আর আমাদের? পুরো জীন্‌স্‌ খুলতে হয়! আর সে বরফে বটম একদম জমে যায়! কি কষ্ট, মাই গড্‌! যদি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদাভাবে কথা বলতে পারত তাহলে নির্ঘাত আমার পাছার একদিক অন্যদিককে বলতো অনেক পাপ করেছিলাম বলেই মেয়ের পাছা হয়ে জন্মেছি। আর বলো কেন,—the other side of my ass must have replied,—আগের জন্মে কিছুতেই মেয়ের পাছা হয়ে জন্মাবো না। হয় পুরুষের পাছা হবো, হয়তো আই ডোণ্ট

ওয়াণ্ট টু বি বর্ন!—বলেই বারবারার কি হাসি। ওর ভরন্ত নিতম্বের কথোপকথন শুনে আমার মনে হল মেয়েটার সত্যি ব্রেন আছে। যদিও জনান্তিকে বলি, ওর নিতম্ব ওর ব্রেনের চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে। সত্যি চলার ধরন দেখে মনে হয় ভেরী ইনটেলিজেণ্ট বটম! যাকগে, ওদের হা পিত্যেস অবস্থা দেখে অনেক কষ্টের ফরেন এক্সচেঞ্জ থেকে ২০ ফ্রাংক দিয়ে দিলাম। ওরা তার বদলে জাবড়ে ধরে তিনজনেই আমার ঠোঁটে চকাস চকাস করে চুমু খেয়ে "পট" খাবার জন্য চলে গেল বাই বাই করে। আমি পরমুহূর্তে সাবান খুঁজে ভাল করে ঠোঁট ধুলাম। ওদের চার্মের চাইতে জার্মের ভয় অনেক বেশী আমার।

দেখতে দেখতে দেড় মাস হয়ে গেছে। সুতরাং ফিরে চলো দেশে। অনেক আনন্দ, চিন্তা, আশা, হতাশা নিয়ে অতঃপর আমি ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হলাম দেশে। হোম, সুইট হোম। এথেন্স, ডাজেরিন, করাচী, বোম্বে। বোম্বে যখন এলাম পূবের আকাশ তখন লাল হয়েছে। সূর্য ওঠেনি। সুতরাং এয়ারপোর্টে নেমেই সূর্যকে ডাকলাম। এই ওঠ, ওঠ। বিরাট এক আকাশ হাসি নিয়ে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। মিষ্টি সকাল। গাড়ি করে ফিরতে ফিরতে প্রণাম করলাম সূর্যকে। কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। সকল দেশের সেরা এই দেশ। শ্রেষ্ঠ এ জন্য যে এ দেশ আমার। আমার মা'র অনেক দোষ। সে গরীব, সে কুসংস্কারচ্ছন্ন, সে অশিক্ষিতা, কিন্তু সে তো আমারই মা। অন্য কারুর সঙ্গে তাকে তো আমি বিনিময় করতে যাবো না। ঠিক করলাম ঘোরবার জন্য বিদেশ ভালো, কিন্তু থাকবার জন্যে স্বদেশ। ইণ্ডিয়া, ভারতবর্ষ, হিন্দুস্থান।

॥ ব্যাকিং ॥

এ যুগের মূলমন্ত্র কি ? ব্যাকিং। ব্যাকিং ছাড়া চাকরী পাবেন না, ছুকড়ি পাবেন না, অলংকার পাবেন না, মোটর কার পাবেন না, বিদেশ যাবার পাসপোর্ট পাবেন না। স্বদেশে পরবার টিসার্ট পাবেন না, খাবারের জন্য চিনি পাবেন না, মারবার জন্য চীনে পাবেন না। এককথায় ব্যাকিং ছাড়া আপনি বাঁচতেই পারবেন না এ যুগে।

কি রে ইন্টারভ্যু হল ?—প্রশ্নের জবাব যখন শুনি তেমন দরকার নেই, কেননা ব্যাক করার জন্য ভোলামামা রয়েছে,—তখনই বুঝি ব্যাক করার লোক থাকলে বেকার অবস্থার অবসান অনিবার্য। সুতরাং Back সম্পর্কে আপনি অবহিত হোন। আমার এক বন্ধুর মতে backই হল এ যুগে front-এর চেয়ে শক্তিশালী। ওঁর মতে যে কোন মেয়ের back, front এর চাইতে বেশী আকর্ষণীয়ও। কেননা backএ মেয়েদের একটা সর্বজনীন ভাব আছে, ডিমোক্রেশী রয়েছে, ফ্রন্টে তা নেই, সেখানে সব মেয়েই আলাদা। বিশেষতঃ মেয়েদের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ মুখ রয়েছে ফ্রন্টে, খাবার খাবার আর বকুনী বকার এই যন্ত্র প্রেমের ব্যাপারে নিস্প্রয়োজন। ঠোঁটের প্রয়োজনীয়তা মুখ বন্ধ থাকলেই হয়, নইলে সর্বদা আন্দোলিত ঠোঁট তো টেলিপ্রিন্টারের খট্‌খটাখট্‌, সে আন্দোলন তো নাগা আন্দোলনের মতোই ভয়াবহ, বিষাক্ত নাগের সঙ্গে সে ভয়ের তুলনা চলে কিংবা নাগাসাকির সঙ্গে! পেছন দিকে থেকে ছোরা মারা অন্যায় হতে পারে, কিন্তু পেছন দিক থেকে ছুরি মারায় কোন দোষ নেই।

সত্যি ইনফ্লুয়েন্সের জয় সর্বত্র। ইনফ্লুয়েন্স সবার ওপর চলে এক বৌ ছাড়া। বৌর উপর কোন ইনফ্লুয়েন্সই চলে না কেননা প্রত্যেকে জানেন বৌ হল মূর্তিমতী ইনফ্লুয়েঞ্জা। বৌ জড়ানোর সখ থাকলে মনে রাখবেন বৌ শুধু জড়াবার জন্য নয়, বৌ হল জ্বর আনাবার জন্যে। আজ পর্যন্ত শুনিনি বৌ কোন স্বামীকে ব্যাক করে, বরং বেশীর ভাগ স্বামীকে বৌ বিলকুল ব্রেক করে ছাড়ে। আমার এক বন্ধুর মতে তাঁর জীবনের উন্নতির কারণ হল খারাপ খাবার ও ভালো আত্মীয়। কেননা এ বন্ধুটির মোটা হবার টেনডেন্সি ছিল। সে চাইত রোগা চেহারা আর মোটা আয়।

কি করে রোগা হলি ?

জবাব এল—আর্ট বুশওয়াল্ডের বই পড়ে। ওতে লিখেছে—খারাপ রেস্তোরাঁতে খাওয়ার মানে খাওয়ার অরুচি, ফল ক্ষুধার্ত থাকা, ফলে ফোর্সড ডায়েটিং হয়ে গেল। বুশওয়াল্ডের মতে খারাপ রেস্তোরাঁ যদি বরাতে না জোটে দুর্ভাগ্যবশতঃ, তবে খারাপ ওয়েটার পেলেও কাজ চলবে। খারাপ ওয়েটার খারাপ ভাবে খাবার সার্ভ করে

আপনাকে মেজাজ নষ্ট করে খাওয়ায় অরুচি ধরিয়ে দিতে পারবে অনায়াসে। বুশওয়াল্ড বলেছেন, প্রত্যেক সরকারের উচিত List of Worst restaurants বলে তালিকা ছেপে জনসাধারণে বিলোন। এতে মোটাদের বড় উপকার হবে। আচ্ছা, ফ্যাট পিপলস্ এসোসিয়েশন বানিয়ে WE WANT BAD FOOD OR BAD WAITER প্লাকার্ড লিখে পার্লামেণ্টে হাউসের সামনে ধর্ণা দিলে কেমন হয়! দেখুন এক বিষয়ে লিখতে গিয়ে অন্য বিষয়ে চলে গেছি। বলছিলাম ব্যাকিং-এর কথা। ব্যাকিং সম্পর্কে অনেক গুলবান পাবেন যাঁরা বলবেন—অমুক সে তো আমার বুজম্ ফ্রেণ্ড। এঁরা আসলে এক একজন ঘনাদা। একবার নেহরুজীর কথা হচ্ছিল। বলা বাহুল্য তখন উনি বেঁচে। বোম্বেতে আমাদের এক বন্ধু আছে যার নাম দীপ চোপড়া। সে বললে,—নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে চান, সোজা ওঁর বাড়ি চলে যাবেন আর বলবেন দীপ দা রোজম্যান পাঠিয়েছে। ব্যাস। দেখবেন আপনাকে কি খাতিরটাই করেন। দীপ দা রোজম্যান মানে?

এবার দীপ আসলে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মতো। বললে,—নেহরুর বাটনহোলে গোলাপ থাকে কিনা বলো?

বললাম, থাকে।

ওটা, বললে দীপ খুব deep স্বরে, আমারই প্রেজেণ্ট করা গাছের গোলাপ।

শুনে মনে হল এসব দীপচাঁদের গোলাপ সংবাদ নয়, 'প্রলাপ বাচন'।

দীপ তার ভাষণ জারী রাখল, জাপানে একদিন বেড়াতে বেড়াতে মিস সোনির সঙ্গে দেখা হল।

সোনি?

আরে ঐ যাদের সোনি রেডিও। (ভাগ্যিস বলেনি—"মিস পায়লটের সঙ্গে দেখা হল। ঐ যাদের পায়লট পেন!") খাতির করে বাড়িতে নিয়ে গেল। দেখলাম অপূর্ব এক গোলাপ ঝাড়। শুনলাম মিস সোনির বন্ধু রাজা হিরোহিতোর ছেলে ওকে প্রেজেণ্ট করেছে। দেখেই মনে হয় জওহরলালের কথা। বললাম, আমাদের প্রধানমন্ত্রী খুব গোলাপভক্ত। এই গাছের ঝাড় পাওয়া যাবে?

বলল, এই গাছটাই দিচ্ছি। তুমি চাইছ না বলতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে মিস সোনি গাছটা উপড়ে একটা ঝুড়িতে দিল। সেটাকে নিয়ে সোজা দিল্লীতে গিয়ে নেহরুর বাগানে পুঁতে দিয়েছি। নেহরু তো আনন্দে অস্থির। তারপর থেকে নেহরু যত ফুল বাটন হোলে লাগিয়েছে সব আমার সেই জাপানী গাছের কুঁড়ি। এরপর যতবার গেছি দেখা করতে সব সময়ই এক কথা হ্যালো রোজম্যান চোপড়া অথবা হ্যাল্লো দীপ দা রোজম্যান।

শুনলেন দীপ চোপড়ার গুলবস্তা। ফুলের তোড়াকে বলে গুলবস্তা কিন্তু এহেন গুলবাজের fool-এর বস্তাকে গুলবস্তা ছাড়া কি আর বলা যায় বলুন? এঁদের ব্যাকিং-এ বিশ্বাস করতে যাবেন না। কেননা এ ব্যাকিং নয়, আসলে এঁদের এসব হল স্রেফ বার্কিং—ক্ষমতা ওদের কিছু নেই। ওঁরা গুল মেরে আসরে হিরো হতে চান, কিন্তু আসলে এঁরা হলেন জিরো।

তবে বলে রাখি—সবচেয়ে বড় ব্যাকিং কিন্তু বন্ধু বা আত্মীয় নয়। বড় ব্যাকিং হল টাকা। টাকা থাকলে আসল সোনা, নকল ভোট, সুন্দরী ওয়াইফ, সুকণ্ঠী তাবাইফ (রক্ষিতা), ভালো সিমেণ্ট, নিজের প্রকাশিত বই বা ছবির উপর ভালো কমেণ্ট, ভালো

গাড়ি, দামী ফরেন শাড়ি প্রহিবিশন অঞ্চলে ভালো স্কটল্যাণ্ডের তাড়ি সব পাওয়া যায়। দেখলেন তো ব্যাকিং আসলে হল—টাকা।

সুতরাং এ যুগে বাস করতে হলে get Rich and reach everywhere. মধ্যম পন্থা আর নাই কিছু।

।। মুখ ।।

মুখ মানে Face নয়, মুখ মানে Mouth, সত্যি বলতে সারা পৃথিবীর কষ্টের কারণ হল মুখ। মুখের প্রধান দুটি কাজ হল ভক্ষণ ও বচন। খাওয়ার ঝামেলা না থাকলে দুঃখই কি থাকতো বলুন। সংগ্রহ থাকত না বলে স্বভাবতঃই বর্জনও থাকতো না। মিল আর মল দুই ধকল থেকে বেঁচে যেতাম আমরা। শুধু প্রেমে পড়লে না হয় চুমু খেতাম আর বিয়ে করলে খাবি খেয়ে কেটে যেতো। মাঠ ভর্তি ধানের বদলে ফুলের চাষ করা যেতো আর সে ফুল বাগানে ফুলো ফুলো মেয়ে তুলো তুলো ঠোঁট তুলে কিলো কিলো চুমু খেয়ে দিন কাটাতো আয়ন ফ্লেমিং-এর জেমস বণ্ডের মতো, সকাল বা সন্ধ্যায় ব্রুক বণ্ডের চায়ের জন্য মুখ চাতক হতো না। মুরগী বা পাঁঠার জন্য ঘাতক হতাম না আমরা, হুইস্কী ব্রাণ্ডী খেয়ে পাতক হতাম না। বিয়ে করতাম বৌর লচক দেখতে, বৌ পাচক হতো না।—জীবনটা হতো যেন একটা রসময় কবিতা, রসনাময় প্রবন্ধ হতো না। গড যদি সত্যি গুড হতেন তাহলে ফুডের ঝামেলাটা তুলে দিতেন। কিন্তু তিনি কি শুনলেন। আমাদের হেড মাস্টার হয়ে বসে আছেন উনি, যদি ফুড মিনিস্টার হতেন তবে টের পেতেন খাবার জিনিসটা কি সাংঘাতিক প্রবলেম। মুখের দ্বিতীয় কাজ হল কথা বলা। পাওয়ার অফ স্পিচ। বাবারে কি সাংঘাতিক বস্তু এই স্পিচ। এই স্পিচই গরম পীচের মতো আমাদের দেশনায়করা আমাদের মাথায় ঢালছেন আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন। এই স্পিচের পাওয়ার বড় সাংঘাতিক, এ ললিতা পাওয়ার নয় এ হল এল ডিনামাইটের সলিতা পাওয়ার! প্রেম থেকে যুদ্ধ সব প্রথমে কথা থেকে শুরু, অতঃপর প্রথম বস্তুটি কাঁথায় শেষ হয় ও দ্বিতীয় বস্তু কাঁদায়।

মজা হচ্ছে এই স্পিচ নিয়ে অনেকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। নমুনা শুনুন—

Hear much, speak little—Bias

Speech is silvery, silence is golden—Carlyle

Every man has a right to utter what he thinks truth, and every other man has a right to knock him down for it.

—Samuel Johnson

I disapprove of what you say but I will defend to the death your right to say it. —Voltaire

If your lips would keep from slips,
Five things observe with care ;
To whom you speak of whom you speak

And how, and where and where.

-W. E. Norris

He knew the precise psychological moment where to say nothing.

—Oscar Wilde

The true use of speech is not so much to express our wants as to conceal them. —Goldsmith

Speech is civilization itself. The word even the most contradictory word, preserves contact—it is silence which isolates. —Thomas Mann

দেখলেন তো মহৎ লোকদের বচনামৃত কি রকম পরস্পর বিরোধী? কেউ বলছে চুপ করো, কেউ বলছে বকে যাও।

আমার এক বন্ধু আছে তার নাম চোপরা। বেচারা যখন কোন কথা বলতে গেছে বিপদে পড়েছে। মনে হয় সবাই ওকে চোপ রও বলাতেই ওর পদবী হয়ে গেছে চোপরা। দেখুন না এই সেদিন স্কুলের একটা বাচ্চা ছেলের মাকে বলে বসল—আমার একটা বাচ্চার মা নন আপনি?

ভদ্রমহিলা তো ভ্যাবাচ্যাকা। বন্ধুবর নিজেকে শুধরে নিল—আমি এই স্কুলের মাস্টার যেখানে আপনার ছেলে পড়ে। স্কুলের সব বাচ্চাকে আমি আমার বাচ্চাই বলি। মহিলা অতি কষ্টে হাসলেন। পরক্ষণেই বন্ধুবর বললেন,—সত্যি বলতে আপনি এত ইয়ং যে আপনার বাচ্চা আছে মানতে রাজী আছি কিন্তু আপনি বিবাহিতা এ কথা কিছুতেই মেনে নেবো না। বুঝুন ঠ্যালা। ভদ্রমহিলা অতঃপর চোখে সর্ষেফুল দেখেছিলেন বলব না কেননা এরপর দু'সপ্তাহ উনি চোখে শুধু হলদে দেখেছিলেন আর ডাক্তারের ধারণা হয়েছিল এটা জণ্ডিস! চোপরার এটাই শুধু একমাত্র কীর্তি নয়। ওর সম্প্রতি বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে গেছে এক বন্ধুর সঙ্গে। ব্যাপারটা বলি। চোপরার সঙ্গে দেখা হল সখারামের। সখারাম আহ্লাদে ষোল আনা হয়ে বলল,—জানিস—এইমাত্র মেটার্নিটি হোম থেকে আসছি। আমার বৌ একটা ছেলের জন্ম দিয়েছে। চোপরা সখারামের কাঁধ চাপড়ে বলল,—গুড নিউজ। আমার হয়ে তোর স্ত্রীকে কংগ্রাচুলেট করে দিস। লাকি ফাদারটা কে হে? সঙ্গে সঙ্গে বলাবাহুল্য সখারাম চোপরার কলার চেপে ধরল,—হারামজাদা দাঁত ভেঙে দেবো।

চোপরা বলল,—আশ্চর্য, রেগে যাচ্ছিস কেন? বললেই পারিস ফাদারের নাম তুই জানিস না। ওর জন্যে মেজাজ খারাপ করে কি লাভ?

ফলাফল? সখারাম তার বক্তব্যকে অ্যাকশনে বর্ণনা করল। চোপরার সামনের দুটো দাঁত ভূপতিত হল। আজকাল চোপরা তাই নকল দাঁত লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সত্যি চোপরা মুখ খুলেছে কি আমরা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি। চোপরাকে সবচেয়ে ভালবাসি যখন ও ঘুমিয়ে থাকে। সত্যি শান্তি। আর কামনা করি আহা যদি চোপরা না হয়ে ও কুম্ভকর্ণ হতো তবে বড় ভালো হতো।

দেখলেন তো কথা ঠিক মতো না বলে কি বিপদ! খাওয়া ও বকা ছাড়াও মুখের আরও একটা বিরাট কাজ আছে। সেটা হল আমাদের সেক্স সংক্রান্ত। (এতক্ষণে অনেকে হয়তো ভাববেন এবার সঠিক ক্ষেত্রে বল এসেছে!) আমাদের গুরুজন মানে বাঁদর শ্রেণীর কথা বলছি। (পিতা পিতামহ গুরুজন যদি হয় তবে পিতামহের পিতামহের ঊর্ধতন বংশগুরু বাঁদরশ্রেণী তো আমাদের গুরুজনই হবেন। তাই না?) ওঁদের মুখের ঠোঁট আমাদের সঙ্গে অনেক প্রভেদ।

প্রথমতঃ যৌন ব্যাপারে ওদের ঠোঁটের কোন ব্যবহার নেই। প্রথমত যৌন মিলন ওদের মুখোমুখী নয় সুতরাং চুম্বন ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। যৌন উত্তেজনায় আমাদের

রক্তচাপ যে সব অঙ্গকে রক্তচাপে উষ্ণ ও আয়তন বৃদ্ধি করে তার মধ্যে ঠোঁট অন্যতম। কিন্তু শিম্পাঞ্জী ও বাঁদরদের এই পরিবর্তন হয়ই না। মানে সেক্স জোনে ওদের মুখের কোন স্থান নেই! আমাদের আছে। তাই চুম্বন আমাদের প্রেমের প্রথম পাঠ। সত্যি বলতে বিখ্যাত লেখক ডেজমণ্ড মরিস মনে করেন আমাদের ঠোঁটের প্রধান কাজই হল যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করা। ঠোঁটের গড়ন তাই আমাদের আলাদা। ঠোঁটজোড়া কিছুটা ডুপ্লিকেটও বটে। দেখুন উনি কি বলেন—Like earlobes and protruding nose, the lips of our species are a unique feature, not found elsewhere in the primates. Of course all primates have lips but not turne·l inside-out like ours. (The Naked Ape : Page 60)

ওদের ঠোঁট গুটোন কিন্তু আমাদের রীতিমতো আলাদা ভাবে কট। মুখের মানচিত্রে ঠোঁটের রঙও আলাদা। তার মানে ঠোঁটটাকে বিশেষভাবে আঁকা হয়েছে যেন। না কেন ডেজমণ্ড মরিস বলছেন,—ঠোঁট হল যৌন ব্যাপারে signalling device, ওঁর ভাষায়—We have already seen the sexual arousal produces a swelling and reddening of the lips, and the clear demarcation of this area obviously assisted in the refinement of these signals, making subtle changes in lip condition more easily recognisable. Thus drawong attention to the presence of tactile sexual structure. (page 61)

কি, ঘাবড়ে যাচ্ছেন নাকি? মরিস সাহেব বলেছেন ঠোঁটের এই রূপ এজন্য হয়েছে যে আমরা শৈশবে মায়ের দুধ চুষে থাকি এই যুক্তি টেঁকে না। কেননা বাঁদর শিম্পাঞ্জীও স্তন্যপায়ী কিন্তু এদের ঠোঁট তো আমাদের মতো নয়। মরিস সাহেব আরও বলছেন যে বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষার পর দেখেছেন অনেক জন্তু-জানোয়ার পেছন দিকের সেক্স জোনের রকমফের সামনেও রাখে। অবয়বে এই ডুপ্লিকেট থাকার মানে হল আকর্ষণ করার উপায়। এই ডুপ্লিকেশন বা self-mimicry আমাদেরও আছে। ওঁর মতে এককালে আমাদের পূর্বপুরুষরা জন্তুদের মতো rear approach-এ দেহমিলন করতেন। পরে আকর্ষণ করার জন্য মেয়েরা সামনের দিকে তারই ডুপ্লিকেট ব্যবস্থা করেছে। ওর ভাষায় ঃ If we look at the frontal regions of the females of our species, we see the ancient genital display of hemispherical buttocks and red lebra. The protuberant hemispherical breasts of the femal must surely be copies of the fleshy buttocks, the sharply defined lips around mouth must be copies of the red lebra. (You may recall that, during intense sexual arousal, both the lips of the mouth around genital lebra become swollen and deeper in colour, so that they not only look alike, but also charge in the same way in sexual excitement)

(P. 67)

মেয়েদের লিপস্টিক লাগানো আসলে সে আকর্ষণকে আরও বাড়ানোর জন্যই। সত্যি ডেজমণ্ড মরিসের বিখ্যাত গ্রন্থ "The Naked Ape" পড়বার পর মুখ সম্পর্কে নতুন সব তথ্য আবিষ্কার করা গেল। এ সব জানবার পর মেয়েদের পজিশন একটু লজ্জাকর লাগতে পারে তবে এটা ওদের বুদ্ধি বা বিদ্যার বাইরে। কেননা ফিজিওলজি ওদের হাতে নয়, সেটা নেহাৎই ঈশ্বরদত্ত। মেয়েরা মনে রাখবেন মুখ ওদের শুধু বাচালই করেনি বেশ বেচালও করেছে। সেজন্য আমার আবেদন হল যেহেতু মরিস সাহেব মুখকে লজ্জাকর স্থান বলে উল্লেখ করছেন সেজন্য মেয়েদের মুখ ঢাকবার ব্যবস্থা হোক। অপারেশনের ডাক্তারদের মতো ওঁরা এখন থেকে ছোট্ট মুখের

জাঙিয়া পরার অভ্যেস করুন। শুধু খাবারের সময় না হয় জিপ ফাসনার খুলে খাবেন আর বিবাহিতরা শোবার সময় খুলে শুতে পারবেন। কুমারীদের সর্বদা ধারণ করতে হবে। চেষ্টিটি বেল্টের মতো এর নামকরণ হোক চেষ্টিটি বল্ট। এতে পুরুষদের ষোল আনা লাভ। মেয়েদের মুখনাড়া থেকে বাঁচা চাট্টিখানি কথা নয় মশাই। সমজের শালীনতা রইল আর পুরুষদের রইল স্বাধীনতা। দেশের হর্তাকর্তারা আমার কথাটা ভেবে দেখবেন। জানি সারা পৃথিবীর নেতারা শান্তি চান। সবাই চেঁচাচ্ছেন We want peace। এর সমাধান একটাই। যদি পিস চান তবে মেয়েদের মাউথপিস বন্ধ করুন। যদি সারা পৃথিবী ভাই ভাই হতে চান, যদি চান We must be close together, তাহলে close woman's mouth altogether! ওদের লিপ্‌স্‌ ক্লোজ হলেই আমাদের লিপ ফরোয়ার্ড হবে।

মুখ সম্পর্কে প্রবন্ধ এখানেই শেষ করতে হল। কেননা পাশে একটি মেয়ে এক্ষুনি লিপষ্টিক লাগিয়ে ঠোঁট লাল করে তুলেছে। ওর মুখাগ্নি এখন নির্বাপিত না করলে দাবানল লেগে যেতে পারে। আপনাদের জন্য মুখ নিয়ে মুখর হতে পারি, তাই বলে আপনাদের জন্য আমি মূর্খ হতে যাবো কেন? সত্যি বলতে এখন আমার মুখান্বেষী হওয়ার সময়, মানে মুখান্বেষী হবার সময়। ইতি।

।। বিয়ে করবেন না ।।

অনেকদিন কম্বে টেনে বুঁদ হয়ে ছিলাম। চোখ খুলতেই বিদ্যুতের মতো মাথায় এলো—আপনাদের উপকার করতে হবে। কি করে? আমি বচন ফকির, সুতরাং বচনই আমার একমাত্র অস্ত্র। তাই দিয়েই করা যাক। উপকার করবো তো, কিন্তু ঠিক কাদের? ভাবনা হ'ল। পরমুহূর্তে মনে হ'ল যারা সবচেয়ে দুঃস্থ, তাদের উপকার করা উচিত। আর, কে না জানে, পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃস্থ হচ্ছে ছেলেরা অর্থাৎ পুরুষমানুষ। তাই এ প্রবন্ধ আমার পুরুষদের জন্য লেখা।

হ্যাঁ স্যার বিয়ে করবেন না। শুনতে পাননি কি বললাম? বলছি বিয়ে করবেন না। করেছেন কি মরেছেন। বিয়ে না করায় কি লাভ ভাবছেন, তাই না? ধরুন আমার বাবুমশাই, (যিনি শুনেছি ক'নে দেখতে এক গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে জলতেষ্টা পায়! • কাছের একটি বাড়িতে ঢুকে জল চাইলেন। একটি তেরো বছরের কিশোরী জলে এনে দিল। ব্যাস, বাবা লাট্টু। ক'নে দেখতে না গিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে আসেন। সেই মেয়েটিই, বলা বাহুল্য আমার মা।) যদি বিয়ে না করতেন তবে আমি হতাম না, আর আমি না হলে আপনাদের কি এত বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করতে হত? চুপি চুপি বলছি, আমার বদ্ধমূল ধারণা, সাম্প্রতিক ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণ আর কিছু না, আমি। চমকাবেন না, ডাহা সত্য কথা বলছি। আমার লেখা পড়ে অনেক জানোয়ার ব্যাক্তি (খেলা যে ভালো জানে সে যদি খেলোয়াড় হয় তবে যে অনেক জানেশোনে সে জানোয়ার ছাড়া কি) বলছেন আমার লেখায় নাকি জার্ম আছে। আপনারা জানেন সব রোগের মূল জার্ম। সন্দেহ কি, এই জার্মই আমার লেখা মারফৎ আপনাদের ঘায়েল করেছে। আপনারা জ্বরে কেঁপেছেন আর ডাক্তাররা এই নতুন জার্ম, যার হদিস পাচ্ছিলেন না নাম দিয়েছেন ভাইরাস-এ।

ডাক্তাররা কি করে টের পাবেন, ওঁরা তো আর আমার লেখা পড়েন না। সুতরাং এবার বুঝতে পারছেন বর্তমানে ইনফ্লুএঞ্জার উৎস কোথায়। মনে হয় আমার 'এই জার্মরাই হঠাৎ জার্মান সৈনের মতো আমার মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সম্প্রতি আমাকে মারবার চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যিস আমি শুয়ে শুয়ে খুব রবীন্দ্রনাথ পড়েছি তাই বেঁচে গেছি। সবাই জানেন রবীন্দ্রনাথের মতো এণ্টিবাওটিক্স আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।

যা বলছিলাম, বিয়ে করবেন না। মনে রাখবেন বিয়ের সাধু কথা হচ্ছে বিবাহ বন্ধন যার সঙ্গে উদ্বন্ধনের কোন তফাত নেই। চলন্তিকা যাই বলুক দুটোর মানে আসলে একই। আপনাদের দোষ হচ্ছে বিয়ের নামে আপনারা নেশাগ্রস্ত হয়ে যান, চোখ ঢুলঢুল করে স্বপ্ন দেখেন বিছানায়! কিন্তু জানেন না, বিয়ের পর বিছানা থেকে 'বি' কেটে যায়। থাকে ছানা ছানাপোনার দল। তার কিছুদিন বাদে ছানা থেকে 'ছা' কেটে যায়,

থাকে শুধু—না। হ্যাঁ, তখন আপনার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্দীপনার জবাব শুধু 'না'। 'না'কেই বলে নেতি। যে কোন বিবাহিত লোক দেখলেই বোঝা যায় তাদের জীবনে নেতি ছাড়া কিছুই নেই, তারা নেতিয়েই থাকেন সারা জীবন। বিয়ের অনেক বিপদ! সেইজন্যই বোধহয় হিন্দীতে বৌকে বলে বহু। ওরা জানে বৌ এক নয়, সে বহু। আপনারা ঘরে বৌ আনেন যেন খুব ডেলিকেট্ একটি মিষ্টি যন্ত্র আনছেন ঘরে, বুঝতে পারছেন না সে আসলে একটি যন্ত্র নয়, বহু যন্ত্রণা। হিন্দি ভাষার এমন বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দেখে শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে আমার। কত দূরদৃষ্টি থাকলে ওরা বৌকে বহু আখ্যা দিতে পারে ভেবে অবাক হতে হয়।

বিয়ে সম্পর্কে একটি চীনে প্রবাদ হচ্ছে, "যদি একদিনের জন্য সুখ পেতে চাও পিকনিক করো, যদি এক মাসের জন্য সুখী হতে চাও ভ্রমণ করো, যদি এক বছরের জন্য সুখী হতে চাও বিয়ে করো, যদি সারাজীবন সুখী হতে চাও ফুলের বাগান করো।"

একমত নই। চীনে স্ত্রীদের নিয়ে হয়ত এক বছর ঘর করা যায়, কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রী নিয়ে এক মিনিটও পারা যায় না। উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি সিল্কের পাঞ্জাবীর সোনার বোতাম ঘোরাতে ঘোরাত বাসর ঘরে এলেন। সঙ্গে আপনার বাসনার সোনা স্বপ্নমানসী বৌ, আর এক দঙ্গল পায়রার মতো মেয়ের দল! তারা আপনাকে চেপে ধরলো,—গান গাইতে হবে। আপনি স্পোর্টিং ছেলে, গান ভালো না জানলেও বাসর ঘরে বেশ গ্যালেন্ট মুডে হারমোনিয়াম টেনে আপনার ২২ বার দেখা ছবি "নাগিন"-এর গান ধরলেন। "মেরা দিল এ পুকারে আযা"। কল্পনায় দেখছেন আপনার বৌ বৈজন্তীমালা হয়ে গেছে। আপনার দিলের পুকার গগনভেদী হ'ল। গান শেষে সবাই বিদায় নিতেই আপনি মুগ্ধ চোখে তাকালেন বৌ-র দিকে। কিন্তু তাকাতেই দেখলেন স্ফুলিঙ্গ। বৌ দু'চোখে চিঙ্গারী জ্বালিয়ে বলল—ছিঃ ছিঃ কি টেস্ট তোমার। গাইতে জানো না বললেই হত। ঐ গলা ফাটিয়ে এই রকম একটা চীপ্ গান গাইতে পারলে তুমি? ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছ।

তারপর সারাজীবন ঐ হেঁট মাথা থেকে আপনি যা পাবেন তা হচ্ছে হেট্রেড। এর উল্টোও আছে। অর্থাৎ আপনি বিনীতভাবে গান গাইতে জানেন না বলে ওদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। মেয়েরা বিদায় নিতেই গর্জন শুনতে পেলেন। বৌ বলছে—যত সব ঢং! এত করে বলল, গাইলে কি হত? বাসর ঘরে বরেরাই গায়, জানা না জানার কি আছে। তোমাকে কি রেকর্ড করতে বলেছে! ন্যাকামো দেখে গা জ্বালা করে।

বলা বাহুল্য, সারা জীবন আপনাকে সেই জ্বলন্ত জ্বালার তাপে পুড়তে হবে, উপায় নেই।

শুধু কি এই? প্রতি পদে আপনাকে হোঁচট নয়, চিৎপটাং হতে হবে। ধরুন, আপনি খুব সন্তান ভালবাসেন। বিয়ের কিছুদিন বাদে খুব লজ্জা আর আনন্দ মিশিয়ে বললেন বৌকে,—আমি ভেবেছি, পুলক, চম্পক, পূজন নয়তো কস্তুরী নীলাঞ্জনা অবন্তী। বৌ অবাক। গম্ভীর মুখ। শুধোল,—

কি বলছ?

নাম।

নাম কি?

না, মানে, আমাদের ছেলে-মেয়ে হবে তো, তাদের জন্যে নাম ভেবেছি। তোমার কোনটা পছন্দ? বলে আপনি মধুর করে হাসলেন রক হাড্সনের হতো। বৌ-র মুখ কঠোর হ'ল। বলল,—দেখো, কতগুলো কথা তোমাকে ফ্র্যাংক্লি বলতে চাই। আমি অনেক এক্সারসাইজ আর ডাএটিং করে ফিগার তৈরী করেছি। বাচ্চাকাচ্চা করে এ

ফিগার আমি খারাপ করতে পারব না। অত ট্যা-ফ্যাঁর সখ ছিল তো গাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করলেই পারতে, আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?

আপনার মুখ হাঁ। একটা মাছি অনায়াসে সেখানে চারবার চক্কর দিয়ে ফিরে আসতে পারে।

উল্টোটা শুনুন। আপনি কেরানী। আধুনিক শিক্ষিত। একদিন বৌকে বললেন,—দেখো তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমার এখন যা রোজগার তাতে আমাদের দু'জনের বেশ চলে যাবে। মানে এখন ছেলেপুলে হলে বিপদে পড়ব। এছাড়া এবছরের শেষে যদি বোনাসটা পাই, ভেবেছি দুইজনে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করব। অজন্তা ইলোরা, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, মাদ্রাজ এসব দেখার অনেক দিনের সখ আমার। দু'জনে দেখতে ভারি ভালো লাগবে। বাচ্চাটাচ্চা হলে ঘোরাটোরা তোমার তো হবেই না, আমারও হবে না। তোমার কি মত?

কিন্তু মত দেবে কে। বৌ বালিসে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। অনেক কষ্টে জানতে পারলেন কারণ। বৌ বলল—মা মৃত্যুশয্যায়। তার একমাত্র সখ তার একমাত্র মেয়ের ঘরে নাতি দেখে যান। সেজন্যেই এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেয়া। এসব যদি তুমি না বোঝ, মার আত্মার শান্তির কথা না ভেবে যদি অজন্তা ইলোরাই তোমার কাছে বড় হয়, তার সাধ আহ্লাদে যদি তোমার এত অবহেলা, তবে এমন স্বামীর ঘরে করতে চাই না আমি। আমাকে আজই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

আপনার চোখের সামনে সিনেমাস্কোপের পর্দা, আর তাতে খালি সর্ষে ফুল।

অবিশ্যি বিয়ের ব্যাপারে ছেলেদেরই সব দোষ তা নয়। আক্রমণটা আসে মেয়েদের তরফ থেকে। আমরা যাকে প্রেমে পড়া বলি, আসলে সেটা ফাঁদে পড়া। মেয়েদের চোখে মুখে দেহের সর্বত্র শক্তিশেল। লেকের ধারে বাতাস যখন মেরিলিন মানরোর মতো 'হাস্কি' স্বরে ফিসফিস করে, সূর্য আকাশের চিবুকে ঠোঁট রেখে রক্তিম করে বিদায়ী হয়, ছোট ছোট ঢেউ রোদের মুকুট পরে হাসে, তখন মেয়েটি আপনার হাতে হাত রেখে হাসল। নাটকে ঠিক কোন জায়গায় কোন্ 'কিউ' দিয়ে প্রবেশ করে অভিনয় করতে হয় মেয়েরা তা ভালোভাবেই জানে। তাই লেকের জল, দিগন্তের সোনা, সুচতুর হাওয়া এরা সবাই মিলে যখন মেয়েটিকে প্রম্পট্ করল, ঠিক তখনি কুশলী নায়িকা আপনার হাতে হাত রেখে হাসল। ফল—আপনার মাথায় শর্ট সার্কিট হয়ে বুদ্ধির বাল্বটি গেল ফিউজ হয়ে। স্বভাবতই আপনি তখন বুদ্ধু। আর বুদ্ধুদের পক্ষে সব সম্ভব, এমনকি বিয়ের প্রস্তাবের মতো মারাত্মক আত্মহত্যার প্রস্তাব করা পর্যন্ত। এজন্যেই লোকে বলে প্রেমে পড়লে ছেলেরা কেমন বোকা বোকা হয়ে যায়। তারপর বিয়ে করলে বোবা। প্রেমে পড়ে বোকারামরা কিরকম যে কথা বলে, রাম রাম শুনলেই হাসি পায়। বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য ভাষাটা অলঙ্কার বহুল। এ অলঙ্কার ছেলেরা মুখভরে মেয়েদের দিয়ে থাকে। কিন্তু বোকচন্দররা জানে না, এ অলঙ্কার মেয়েরা ভালোবাসে না। এ অলঙ্কার দরকার হলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজশেখর বসুর কাছে ঢের পাওয়া যায়। মেয়েরা চায় যে অলঙ্কার তা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে এম বি সরকারের কাছে। ছেলেদের প্রপোজালের নমুনা শুনুন ঃ ছেলেটি কেরানী। কিন্তু সে বলছে,—রাণী, তুমি আমার হবে? তোমাকে না পেলে আমি আত্মহত্যা করব। (পেলেই যে আত্মহত্যা সে কি তখন বুঝছে!) তুমি আমার মধুবালা, আমার সুচিত্রা সেন, আমার নূতন। আমার মনবনের হরিণী তুমি, আমার জীবনের মুভি, আমার হৃদয়ের টি, ভি,। (আসলে হৃদয়ের টি, বি)। তোমাকে না পেলে আমার জীবন সাহারা। কথা দাও, তুমি আমার হবে।

আমার ছাড়া কাউকে ভালোবাসবে না?

নায়িকা হাসবে সুন্দরবনের বাঘিনীর মতো। বলবে,—মুখে না বললেও বুঝি বুঝতে পারো না হাঁদারাম। তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসি না। অবিশ্যি উত্তমকুমার ছাড়া। কিন্তু তাঁকে পাওয়ার মতো কি আর পুণ্যি করেছি!—দীর্ঘশ্বাস,—কিন্তু তার পরই কাউকে যদি মালা দিই, সে তোমাকে। তাতেই ছেলেটি গদগদ। কাঁধে ধরে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিল, কিন্তু গুণ্ডা আইনের ভয়ে বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারলো না বেচারী, স্বাধীন সুন্দর একটা ছেলের ভবিষ্যত লেকের ধারে জমে ওঠা রাত্তির মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল। বিয়ের দেবতা নাকি প্রজাপতি। প্রজাপতিতেই কিন্তু বিয়ের অর্থ পরিষ্কার লুকোন আছে। প্রজাপতিকে উল্টে দিন, কি হয়? পতি প্রজা। হ্যাঁ, বিয়ের মানে তাই, স্ত্রীর কাছে পতি প্রজায় রূপান্তরিত হয় এ অনুষ্ঠানে। সারাজীবনে সে পরাধীনতা ঘোচে না।

বিয়ের পর বৌকে বাগে রাখতে পেরেছে এমন পুরুষসিংহ কেউ আছেন বলে আমি জানতাম না। সৈয়দ মুজতবা আলী একজনের কথা জানিয়েছেন। তিনি পারস্যদেশীয়। সে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিটি এমন অঘটন ঘটিয়েছিলেন বিয়ের প্রথম রাতেই বেড়াল বধ করে। সে গল্প আপনারা জানেন আশা করি। আরেকজনের খবর পেলাম সম্প্রতি। সে একজন মার্কিন দেশীয় চাষা। তার কাণ্ড শুনে মনে হয় সে বৌকে নিয়ে বেশ সুখেই আছে। আমার এ ধরণের অনুমান কেন হ'ল গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবেন।

মার্কিন চাষীটি বেশ পয়সাকড়ি করার পর দেখল সোনালি গমের শীষের মতো তার জীবনটা মধুর নয়, বরং শুকনো চাষহীন ক্ষেতের মতো বন্ধুর। কারণ ভেবে দেখল ঘরে তার সব আছে, কিন্তু স্কার্ট নেই, পেটিকোট নেই, নেই লিপস্টিক। যেই ভাবা অমনি কাজ। ঘোড়ার গাড়ি চেপে সেদিনই চলে এলো শহরে। মেয়ে পছন্দ করল, বিয়ে করল। বৌ নিয়ে খুশী মনে ঘোড়ার গাড়ি চেপে গাঁয়ে ফিরছে চাষী, হঠাৎ ঘোড়াটা জোরে একটা হোঁচট খেল।

চাষীটি বলল,—একবার।

খানিক দূর গিয়ে ঘোড়াটা ফের হোঁচট খেল। চাষীর মুখ কঠিন। সে বলল,—দু'বার।

অল্প দূরে গিয়েই ঘোড়া আরেকবার হোঁচট খেল। চাষাটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল,—এই তিনবার। পর মুহূর্তে পকেট থেকে রিভলবার বার করে দুম করে গুলি করে মেরে ফেলল ঘোড়াটাকে। চাষীর কাণ্ড দেখে বৌ রেগে আগুন। চেঁচিয়ে উঠল সে,—ঘোড়াটাকে মেরে ফেললে তুমি? নিষ্ঠুর, বদমাস,—বলেই বৌ এক চড় কষালো চাষীর গালে।

চাষীটি চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বৌএর দিকে। তারপর আস্তে করে বলল,—একবার।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কেন ভেবেছি এই চাষীটি বৌকে নিয়ে সুখে আছে। না বুঝে থাকলে গল্পটা আবার পড়ুন। তাতেও না বুঝে থাকলে বুঝতে হবে আপনি একটি বোকা, অর্থাৎ আপনি প্রেমে পড়েছেন—অর্থাৎ আপনার বুদ্ধির বাল্বটি ফিউজ হয়ে গেছে।

এছাড়া বয়েস মেয়েদের দারুন ধোঁকাবাজ। বিয়ের আগে যাকে মনে হ'ল পঞ্চদশী, পরে ক্রমে টের পাওয়া যায় সে ত্রিশটি শীত পেরিয়ে এসেছে। বনফুল একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

"বাসে চড়ে বীণা রায়।
চলেছেন বেহালায়।
ঝুমকো দুলাইয়া দুটি কর্ণে।

সঙ্গে গোবর্ধন মিত্র।"

এই গোবর্ধন মিত্র বাস চাপা না পড়ে প্রেমে পড়ল। কেননা "নয়নের কিনারায় এলো যবে বীণা রায় তাতিল গোবর্ধন মিত্র।"

তেতেটেতে আমাদের গোবর্ধন অসুস্থ বীণা রায়কে মেডিক্যাল কলেজে রীতিমত দেখা করে-টরে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল। কিন্তু পরে সে জানতে পারল—

"১৯০৫ সনে
সে আমার বাবার সনে
করেছিল এণ্ট্রান্স পাস।"

বুঝুন বীণা রায়ের কাণ্ড (বোম্বের নায়িকা ভাববেন না যেন)। গোবর্ধন মিত্রের সঙ্গে মিত্রতা নয় শত্রুতাই করেছে সে। আর কে না জানে মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের সম্পর্ক শত্রুতারই। চিরদিনই ছিল, আজো আছে।

বিয়ের আরো বিপদ শুনুন। সে হচ্ছে আপনি যদি আমার মতো সুন্দর হন আর বৌ যদি সুন্দরী হয় সুচিত্রা সেনের মতো, তাহলে সারাজীবন আপনাকে আতঙ্কে কাটাতে হবে। আপনার সবচেয়ে গোবেচারা বন্ধুটিই হয়তো একদিন "আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থি" বলে আপনার বৌকে নিয়ে চলতি হাওয়ার মতো হাওয়া হয়ে গেল। আপনার তখন বুড়ো আঙুলটি ম্যাগ্নোলিয়া আইসক্রিম বানানো ছাড়া উপায় নেই। আর যদি আপনি দেবআনন্দ্ হন আর বৌ হয় ইয়ে, মানে অশোক বনে সীতার সঙ্গিনীদের একজন, তাহলেও আপনার জীবন হেল্। আমরা যতই ইচ্ছে থাক এতটুকু হেল্প্ করতে পারব না। রাস্তায় কোন মেয়ের দিকে তাকাতে পারবেন না, স্বপ্ন দেখেও হাসতে পারবেন না, (নিশ্চয়ই কলেজের কোন ছুকরীর কথা বা ফিলিমের কোন বেবুস্যের কথা ভেবে হাসছেন আপনি, এ অভিযোগ করে বৌ আপনাকে তাঁর অভিসম্পাতের সঙ্গে আর যে সব কথা যোগ করবে তা ছাপার যোগ্য নয়।) বাড়িতে মেয়ের কোন ছবি রাখতে দেবে না। এমনকি খবরের কাগজে লাক্সের বিজ্ঞাপন কেটে পড়তে দেয়া হবে আপনাকে, পাছে লাক্স সুন্দরীকে দেখে আপনি চোখের ব্রহ্মচর্য নষ্ট করেন।

অল্পবিদ্যার চেহারার তুলনায় সে কিছু নয়। সম্প্রতি আমার এক বন্ধু বিয়ে করে বৌকে নিয়ে এসেছে বঙ্গে। বঙ্গের আভিজাত্যের চেহারা দেখে বৌ-এর নিজেকে স্মার্ট করবার চেষ্টা করার পরিণতি শুনুন। চায়ের পেয়ালায় বিকেলে বন্ধু-স্ত্রী মুখরা হলেন,—আপনাকে দেখে বাচ্চা মনে হয় কিন্তু এমন মর্বিড গল্প কি করে লেখেন? আপনি অচিন্ত্যের মতো ফর্মালিস্ট, মাঝে মাঝে সার্ত্রের একজিস্টেন্সিএলিজম্-এর ঝোঁকও থাকে লেখায়।

কথা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, কোন্ কোন্ বাংলা লেখক ও বাংলা বই তাঁর পছন্দ। বললেন,—সন্তোষ ঘোষের 'জতুগৃহ,' সুবোধ ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' ; বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক,' অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' তাঁর খুব পছন্দ।

এরপর আমার মুখ বন্ধ। কোন ঝাঁঝা। উনি অবিশ্যি বকেই গেলেন। একসময় বলছেন শুনলাম,—আমার মা কস্টফোবিআয় ভুগত, (ক্লটোফোবিআ হবে), বড়দি ছিলেন নিম্ফোমেনিআক, দাদা নিউরেটিক, ছোট ভাইটা ক্লিপ্টোমেনিআক। স্বামীটিকে মাঝে মাঝে মনে হয় স্টাটাআরিস্ট, জনান্তিকে বলছি আমারও কিছু পিক্যুলিআর মেণ্টাল পারভারসান আছে। ভাবছি সাইকিআট্রিস্ট দেখাবো।

ঠাণ্ডা চা কুইনীনের মতো গিলে পালিয়ে এসেছিলাম। এরপর বন্ধুটির মুখ দেখলেই কষ্ট হয়। স্মার্ট সোস্যাল বৌর জ্বালায় বেচারার প্রাণ কণ্ঠাগত। হবে না, সারাদিন রাজ্যের ইজম্ যথা ক্যাপিট্যালিজম, সোস্যালিজম্, কমিউনিজম্, ফর্মালিজম্, সুররিআলিজম নিউ-রিআলিজম ইত্যাদি আর যত রাজ্যের মেনিআ যথা নিম্ফোমেনিআ,

ক্লিপ্টোমেনিয়া, সেক্সমেনিআ আর ক্লটোফোবিআ, হাইপোকান্ড্রিআ, নিউরিসিস, মর্বিডিটি, স্যাটায়ারিস্ট পারভারসান ইত্যাদি শুনে যে কোন সুস্থ লোক পাগল হয়ে যাবে।

আর কতো বলব? এরপরও যদি আপনি বিয়ে করতে চান তবে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। মেয়েদের বলা হয় নারী, পুরুষদের নাড়ি ছাড়ানোই যাদের কাজ। দয়া করে তাঁদের আওতায় পড়বেন না। ইংরেজীতে মেয়েদের বলে women অর্থাৎ men দের যাঁরা চিরদিন wee-এর কারণ। এমন কি lassদের কথাটা শুনলেই মনে হয় ইংরেজী কতো যুক্তিপূর্ণ ভাষা। lassদের একমাত্র কাজ পুরুষদের মেরে লাস বানানো।

এত বলেও যদি বিশ্বাস না হয় তবে আপনি মরুনগে যান। পরে দোষ দেবেন না, বন্ধু হিসেবে আমি আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করিনি।

পুনশ্চঃ শিগ্‌গিরই আমি বিয়ে করছি। বলা বাহুল্য আপনাদের বিয়ের কুফল সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানাবার জন্যই আমার এই স্যাক্রিফাইস। যথাসময়ে যদি নিজে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে নেমতন্ন করতে না পারি তবে আশা করি পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণজনিত ত্রুটি আপনারা মার্জনা করবেন। চুপি চুপি বলছি, মেয়েটি খাসা।

।। নাক ।।

নাক আমাদের সকলেরই আছে, এমনকি মেয়েদেরও। ইউনাকদেরও দেখেছি, নাক ঠিক থাকে। আমরা স্বনামধন্য হয়তো সবাই নই, তবে স্বনাকধন্য সবাই। জানি না কেন নাকের মতো বড় একটা বিষয়বস্তুকে সাহিত্যিক শিল্পীরা বিশেষ কদর দেননি। নাককে নেকনজরে কেউই দেখেননি। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলার জন্য কেঁদেছেন কিন্তু নাক সম্পর্কে কোথাও বিশেষ উচ্চবাচ্য করেছেন বলে জানি না। নাকের এই অবমাননা দূর করার জন্যই শচীন্দ্রনাথ আজ এই কলম ধরেছে। আমার বিষয়বস্তু সাহিত্য-শিল্প-কাব্যে উপেক্ষিতা—নাসিকা।

নাক মোটেই হেলাফেলা করার জিনিস নয়। নাক আছে বলেই আমরা আছি। ভেবে দেখুন, নাক না হলে 'রামায়ণ' কোন কালে লেখা যেত না। কেন না শূর্পণখার নাক না থাকলে কি আর কাটা হত? আর শূর্পণখার নাক কাটা না হলে রাবণ খ্যাপচুরিয়াস কি করে হতেন? সুতরাং নাক ছিল বলেই রামের নাক বা নাম আজ আমাদের কাছে এত উঁচু হতে পেরেছে।

নাক আছে বলেই নাকে খত্ দেওয়া আছে। বিয়ের পর যা প্রত্যেক পুরুষ মানুষ দিয়ে থাকেন। নাকে নথ পরে যিনি আসেন তাঁর প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে স্বামীকে নাকে খত্ দেওয়ানো।

নাক আছে বলেই গন্ধ আছে। আর দুর্গন্ধ আছে বলেই সুকুমার রায়ের কাতরোক্তিতে সমবেদনা সবাইর আছে। সেই যে—

"মারতে চাও ডাকাও নাকো জল্লাদ।
গন্ধ শুঁকে মরতে হবে সে আবার কি আহ্লাদ।"

গন্ধ শুঁকে মরতে আপত্তি থাকা একান্ত স্বাভাবিক। গন্ধ শোঁকার যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কিন্তু শুঁকে মরা ছাড়াও অনেক কাজ করা চলে যেমন সনাক্ত। হ্যাঁ, স্বনাকে সনাক্ত সম্ভব। চোর বা মেয়েমানুষ দুইই গন্ধ শুঁকে ধরা যায়। এক ধরনের বিশেষ চুরুট খেত এক ডাকাত। তাকে সেই চুরুটের গন্ধেই ডিটেকটিভরা ধরেছিল। এ ধরনের গন্ধরাজ ডাকাত ধরা সম্ভব কিনা আপনারা জরাসন্ধকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আর নাক দিয়ে মেয়ে ধরার উপায় আপনারা বচন ফকিরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ও হরি, আমিই যে বচন ফক্কড়, আই মিন বচনফকির। তাহলে আমার কাছেই শুনুন। মেয়ে ধরা খুব সোজা। চোখ আর হাত থাকলেই হয়। কিন্তু ধরুন আপনার চোখ বন্ধ, হাত বন্ধ, শুধু নাক খোলা: এইবার কি করে বুঝবেন কোন্ মেয়ে কোন্ শ্রেণীর। সোজা। আপনার নাকে যদি অগুরুর গন্ধ আসে সে মেয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। যদি ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ আসে মধ্যবিত্ত ঘরের, আর যদি শ্যানেল নাম্বার ফাইভের গন্ধ আসে তবে

উচ্চবিত্ত ঘরের। আর উগ্র কোন সস্তা আতরের গা গুলোন গন্ধ হলে বুঝবেন এ মেয়ে এ পাড়ার নয়, ও পাড়ার নয়, একেবারে বেপাড়ার।

নাক আছে বলেই ফুলের এত কদর, সেন্টের এত দর। নাক না থাকলে আমরা বুঝতেই পারতাম না গোলাপ আর বোকা পাঁঠার কি তফাৎ। বুঝতেই পারতাম না কোন্‌টা শেফালী আর কোন্‌টা কাবুলীর গন্ধ। বুঝতেই পারতাম না কোন্‌টা আমের গন্ধ, কোন্‌টা Rum-এর গন্ধ, কোন্‌টা Palm-এর গন্ধ আর কোন্‌টা ঘামের গন্ধ! কি বিপদ হতো বলুন তো।

বাৎস্যায়ন তাঁর কামশাস্ত্রে নাককে পাত্তা দেননি। নাসিকা চুম্বনকে উনি 'মৃদু চুম্বন' বলে অন্যান্য গুরুতর বিষয় নিয়ে গুড়গুড় করেছেন। প্রচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও শিল্পে নাক নিয়ে ওঁরা নেচেছেন কম, বুক নিয়ে বকেছেন প্রচুর। বিদ্যাপতির মতে রাধার বেস্ট পোরসন ব্রেস্ট পোরসন। উনি রাধার বর্ণনায় নাককে তিল ফুলের সঙ্গে ও গরুড়ের ঠোঁটের সঙ্গে তুলনা করেছেন শুধু। অথচ রাধার বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে রীতিমতো পোস্টমর্টেম করেছেন। বিদ্যাপতি রাধার রূপবর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"জিনি করিবর রাজহংস গতিগামিনী
চললিহ সংকেতগেহা।
অমল তড়িতদণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দরদেহা।।
জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবাল।
ভৌহ মদন-ধনু ভ্রমরভুজঙ্গিনী জিনি
আধ বিধুবর ভালে।।
নলিনী চকোর সফরি সব মধুকর
মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণে বিশেখি।।
কনকমুকুর শশী কমল জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর পবারে।
দশন মুকুতা পাঁতি কুন্দ করগবীজ
জিনি কম্বুকণ্ঠ অকারে।।
বেল তাল যুগ হেমকলস গিরি
কটোরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাশ বল্লরী জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা।।
লোমলতাবলী শৈবাল কজ্জল
ত্রিবলী তরঙ্গিনী রঙ্গা।
নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিয় গজকুম্ভা।।
উরুযুগ কদলী করিবর কর জিনি
থলপঙ্কলজ পদপাণি।
নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি
পিক অমিয়া জিনি বাণী।।

ভণই বিদ্যাপতি অপরূপ মুরতি
রাধারূপ অপয়া।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা।।"

বিশেষণের বাহার দেখলেন? রাধার দেহ—তড়িত দণ্ড ও হেমমঞ্জরী। কুন্তল—তিমির জলধর ও চামর। অলকা—ভৃঙ্গ ও শৈবাল। ভ্রুলতা—ভ্রমর ও ভুজঙ্গিনী, ভাল—আধবিধু। আঁখি—নলিনী, চকোর. সফরী ভ্রমর, মৃগী ও খঞ্জন। নাসা—তিলফুল ও গরুড়-চঞ্চু। শ্রবণ—গৃধিনী। মুখ—কনকমুকুর, শশী ও কমল। অধর—বিম্ব ও প্রবাল। দাঁত—কুন্দ ও করগবীজ। কণ্ঠ—কম্বু। কুচ—বেল,তাল, হেমকলস, গিরি ও কটোরা। বাহু—মৃণালপাশ ও বল্লরী। মধ্যদেশ—ডমরু ও সিংহ। লোমলতাবলী—শৈবাল ও কজ্জল। ত্রিবলী—তরঙ্গিনী-রঙ্গ। নাভি—সরোবর ও সরোরুহ দল। নিতম্ব—গজকুম্ভ। ঊরু—কদলী ও হস্তীশুণ্ড। পদ ও করতল—স্থলপদ্ম। নখ—দাড়িম্ববীজ, চন্দ্র, রত্ন ও বাণী—পিক কূজন।

নাক সম্পর্কে শুধু বলেছেন তিলফুল আর গরুড় চঞ্চু, ব্যাস। সবচেয়ে বেশি বলেছেন চোখ ও বুক সম্পর্কে। বিদ্যাপতি থেকে সুরু করে যে কোন পতি নায়িকাদের নাক সম্পর্কে স্বল্পবাক। স্বল্পবাক ভুল, একেবারি মিতবাক্‌। আর এসব দেখে আমি হতবাক।

একবারও কি ভেবে দেখেছেন নাক যদি আমাদের এ ধরনের নির্দয়তা দেখে আধ ঘণ্টার জন্য ধর্মঘট করে বসে তাহলে কি কাণ্ড হবে? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে ভাবতেই তো নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। নয় কি?

তাই বলি নাক থাকতে নাকের মর্যাদা দিতে শিখুন। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না দিলেও ক্ষতি নেই। দন্তহীন হয়েও বেঁচে থাকা যায় কিন্তু নাকহীন হওয়া মানে প্রাণহীন হওয়া। আর প্রাণ না থাকলে আপনি বাঁচবেন না। জেনে রাখা ভালো প্রাণ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না—একমাত্র হিন্দী ছবি ছাড়া। প্রাণহীন হিন্দী ছবি অনেক হয়েছে, বেঁচেছে। কেননা প্রাণ না থাকলেও কে. এন. সিং আছে। কিন্তু আমাদের প্রাণ না থাকলে কেউ নেই। অর্থাৎ আমাদের নাক না থাকলে কেউ নেই।

নাককে সবাই হেলা করেছে বলা ভুল। পাসক্যাল বলেছেন,—If the nose of Cleopetra had been little shorter the whole face of the world would have been changed.

দেখলেন তো? নাকের জন্যই ক্লিয়োপেট্রার রূপের এত নাম-ডাক।

নাক অনেক রকম হয়ে থাকে। বড়, ছোট, মাঝারি। শকুনের ঠোঁটের মতো, প্যাঁচার মতো, বুলডগের মতো, টিয়ের ঠোঁটের মতো, সিঙ্গাড়ার মতো, ব্যাঙের মতো, কামানের মতো আরও হরেক রকমের! দীর্ঘ নাকের স্বপক্ষে অনেক উকীল। বব হোপ, সিরানো ডি বার্জারেক, নোপোলিয়ন। নোপোলিয়নের মতে দীর্ঘ নাক বুদ্ধিমান লোকের চিহ্ন।

বব হোপ বলেছেন নাকের জন্যই উনি চিত্রজগতে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। দীর্ঘ নাসিকা নিয়ে সাহিত্যের পুরোহিত মহলে বিভীষিকা নিযে দেখা দিয়েছিলেন আরেকজন যিনি একাই এক শ'। তিনি হলেন শ। বার্ণাডশ। নাক মহলে উনিই হলেন কুলীন নাক। বিশ্বসাহিত্যে চাঞ্চল্যকর প্রতিভা এই নাক প্রচুর নাম ডাক আর হাঁক-ডাক নিয়ে বেঁচে ছিলেন, বেঁচে থাকবেন।

তবু লম্বা নাকের মস্তো দোষ সর্বক্ষেত্রে গলানো। আমার বিশ্বাস দীর্ঘ নাক হলে সে অন্যক্ষেত্রে নাক গলাবেই গলাবে। অদ্য হোক, কল্য হোক গলাতে সে বাধ্য। অদ্যকার

সদ্য দৃষ্টান্ত হল দ্য গল। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী দ্য গলের নাক এলজিরিয়ার অসহায় স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের ওপর কি অত্যাচারই না করেছেন। শূর্পণখা না হওয়া পর্যন্ত উনি থামবেন না মনে হচ্ছে। একদিন নিজের নাক কেটেই ওঁকে মুক্তিপ্রিয় জনতার (যাত্রাভঙ্গ নয়) যাত্রা শুরু করাতে হবে। সেদিনের দেরিও নেই।

অবিশ্যি নাক থাকলেই সে শুধু লোকে নাক গলায় তা সর্বক্ষেত্রে সত্যি নয়। নাক না থাকলেও নাক গলায়। যেমন চীনেরা ভারতবর্ষের সীমান্তে গলাচ্ছে। ওদের নাক নেই, তবু নাকাবেই নাকাবে. নাকানোর ফলে চীনেরা আজকাল রীতিমতো নাকাল, বলাই বাহুল্য। আমাদের বক্তব্য,—ওহে চায়না, তোমাদের হায়েনার মতো বায়না খুব হয়েছে। এবার হলদে নাকাল, জলদি নিকাল।

পরের ব্যাপারে, নাক না গলাবার সদুপদেশ দিয়ে আমেরিকার মাইক পিটার বলে একটি ন'বছরের ছেলে স্কুলে একটা Essay লিখেছিল। নানান ভুল সত্ত্বেও প্রবন্ধটি সহজেই বোধগম্য। প্রবন্ধটি আমি বিশ্বের আক্রমণকারী নাকগর্বীদের সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে নিচে দিলাম। মনে রাখবেন লেখকের বয়েস মাত্র ন'বছর। মাইক লিখেছে—

A MAN WITH A BIG NOSE

Once upon a time there lived a man. And he had a big nose. He was always stiking in into other peoples binisits. One time hes stuck his nose into a gints binsites, the gint said if he did not get out of his land he would knong the big nose of his face. And he would have a little nose. One day the man went back to the ginst custed the gint nocket his nose so little that you gould not see it. So that teaches you a leassen not to stick your nose into other peoples business.

THE END

("Don't Get Perconel with
a chicked" বই থেকে)

অজস্র ভুল। কিন্তু বক্তব্যের সততায় ন'বছরের ছেলের মাথায় নব্বুই বছরের বুদ্ধি। তবু এই ন'বছরের ছেলের কথা শোনেননি মার্কিন রাষ্ট্রনেতা। খামোকা 'gint' এর রাজ্যে নাক গলাতে গেছেন। আর 'gint' ও কচাৎ করে দিয়েছে তাঁর নাক কেটে। রাষ্ট্রনেতার নাম আইসেনহাওয়ার। জায়ান্টের নাম ক্রুশ্চেভ। আর নাকের নাম U—২. আমেরিকার এই রক্তাক্ত নাকের ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন।

নাক সম্পর্কে শুধু ন'বছরের মাইক পিটারই লিখেছে ভাববেন না। বিখ্যাত সাহিত্যিক উইলিয়ম সরোয়ান তাঁর 'The Human Comedy' বইতে লিখেছেন নাক নিয়ে। এতে হোমার বলে শিশুনায়ক নাক সম্পর্কে রীতিমতো একটা লেকচার ঝেড়েছে। ও বলেছে—'The nose is probably the funniest part of the human face. It has always been a cause of trouble, and one ancient people probably fought with everybody else because of his nose.'

হোমার আরও বলেছে যে, অনেক মানুষ নাক দিয়ে কথা বলে, অনেকে নাক দিয়ে গান গায় আর অনেককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হয়। অনেকের নাক কুকুরে কেটে থাকে আর ফিল্মে অনেক সময় নায়িকারা নায়কের বা নায়ক নায়িকার নাক কেটে থাকে। নাক হাতের মতো চলতে পারে না, গাছের মতো স্থির। তাই বেচারাকে মাথার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে ঘুরতে হয়। যদিও পা শুধু দৌড়তে পারে তবুও সর্দি হলে বলা হয় nose runs. হোমার অবাক,—কেন বলা হবে যে nose runs, যখন নাক জীবনেও দৌড়ুতে পারে না!

সত্যিই তো হোমার জব্বর একটা বিপদে পড়েছে। ইংরেজী ভাষার এই গোলক-ধাঁধায় হোমারকে রেখে এগোন যাক!

দীর্ঘ নাকের ট্র্যাজেডি জানেন তো? জানেন না? "সাইরানো ডি বার্জেরাক পড়েন নি। কুৎসিত নাকের জন্য যে নায়িকা রোক্সেনাকে কোনদিন প্রেম নিবেদন করতে পারেনি। যে রোক্সেনার প্রেমিক ছেলেটির চিঠি লিখে দিত অপূর্ব কাব্যমাধুর্যে ভরিয়ে। যে পেছন থেকে ছেলেটির কণ্ঠ নকল করে প্রেম নিবেদন করতো। নেপথ্য থেকে ওর কণ্ঠ শুনে মেয়েটি ভাবত এ বুঝি ওর প্রেমিকেরই গলা। শুধু সাইরানোর মৃত্যুর সময় রোক্সেনা জানতে পেরেছিল ঐ সব চিঠি সাইরানোর লেখা, ঐ সব আবেদন নিবেদন সাইরানোরই কণ্ঠ নিঃসৃত। প্রেমিক ছেলেটি শুধু সামনে থেকে হাত মুখ নাড়ত। যখন সাইরানোর প্রেমকে চিনল রোক্সেনা, সাইরানো তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। এত বড় ট্র্যাজেডির কারণ কি? নাক। যার সম্পর্কে সাইরানো বলেছে—"

"Think a moment. Think of me—
Me, whom the plainest woman would despise—
Before me by a quarter of an hour!"......."

সাইরানো ক্লান্ত করুণকণ্ঠে আরও বলেছেন ঃ

"My old friend—lock at me,
and tell me how much hope remains for me
With this protuberance! Oh I nave no more
Illusions! Now and then—bah! I may grow
Tender, walking alone in the blue cool
Of evening through some garden fresh with flowers
After the benediction of the rain ;
My poor big devil of a nose inhales
April.......and so I follow with my eyes
Where some boy, with a girl upon his arm,
Passes a patch of silver........and I feel
Some how, I had a wowam too,
Walking with little steps under the moon,
And holding my arms so, and smiling. Then
I drem—and I forget........
And then I see
The shadow of my profile on the wall!"

কি করুণ! কুৎসিত নাক যার সেও তো স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে কোমলতনু নারীর। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে যায় কঠিন আঘাতে যখন হঠাৎ দেয়ালে ছায়া পড়ে। চোখে পড়ে তাঁর ন্যক্কারজনক নাক। কঠিন সত্য দেখে স্বপ্ন দূর হয়ে যায়। হৃদয়হীন একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো নাকের ছায়া দেয়ালে শীতল চোখে তাকিয়ে থাকে সাইরানোর দিকে। তাই রোক্সেনার কাছ থেকে চুম্বন চায় যে অপূর্ব কাব্যলহরীতে, সে চুম্বন সে পায় না! তাঁর বর্ণনা—

"A kiss, the word is sweet—
What will the deed be? Are your lips afraid
Even of its burning name?......

......What is a kiss, when all is done ?
A Promise given under a seal—a vow
Taken before the shrine of memory—
A signature acknowledged—a rosy dot
Over the i of Loving—a secret whispered
To listening lips apart—a moment made
Immortal, with a rush of wings unseen—
A sacrament of blossoms, a new song
Sung by two hearts to an old simple ture
The ring of one horizon around two soul.
Together, all alone.....

এত অপরূপ সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত কেউ হয়তো দেয় নি। কিন্তু এমন কাব্যেও কার্য হল না। কেন না সিরানো ডি বার্জারেকের হৃদয়ই সুন্দর ছিল কিন্তু নাক সুন্দর ছিল না। তাই রোক্সেনার চুম্বন যখন ভাগ্যে জুটল তখন সিরানোর ঠোঁট মৃত—শীতল শবের ঠোঁট।

দীর্ঘ নাকের এটাই বোধ করি সবচেয়ে দীর্ঘ ও দুঃখের পাঁচালী। দীর্ঘ নাকের এ দুঃখ আজকের দিনেও অনেকের ভুগতে হত যদি প্লাস্টিক সাজরী আবিষ্কৃত না হতো। আজকাল নাককে বাগে আনতে বেগ পেতে হয় না। গায়ক জল অংকা সেদিন নাক কাটিয়ে চমৎকার শেপ করেছেন। আমাদের প্রেমনাথ নাক বদলেছেন। অদূর ভবিষ্যতে অভিনেতা জয় মুখার্জীও নাক বদলাতে যাবেন বলে শোনা যাচ্ছে। হলিউডের এণ্টনি কুইনকে স্টুডিও মালিকরা প্লাস্টিক সাজরী করে নাক কাটাতে বলেছিলেন। কুইন তার নাককে নিজের কুকুরের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। তাই বীরের মতো বলেছেন—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র নাসিকা। শেষ পর্যন্ত স্টুডিও মালিকরা মেনে নিয়েছেন তাঁর উদগ্র নাক। আর আপনারা জানেন সে নাক নিয়েই "লাস্ট ফর লাইফে" পল গগাঁর চরিত্র করে অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন।

নাক দিয়ে ডাকা যায় আর মজা হচ্ছে যে ডাকছে সে শুনতে পায় না। বেশ মজার না? আমিই ডাকছি অথচ আমিই শুনছি না। এক্ষেত্রে কান অসহযোগিতা করল। অর্থাৎ নাকের ডাকে কান কর্ণপাত করল না। শরীরের সব প্রত্যঙ্গ এমন অবাধ্য নয় কিন্তু। ধরুন পা। পা মাঝে মাঝে নাকের নির্দেশ মানে। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, আপনি পা-কে চলতে বলুন। এবার দেখতে চান নাক কি করে পা-কে বন্ধ করবে? হাঁচি। নাক হাঁচ্চো করে একটা হাঁচি দেবে সঙ্গে পা পাথর হবে, আপনাকে একটুক্ষণ বসে যেতেই হবে। দেখলেন তো নাকের ক্ষমতা।

নাকের নেহেরুপ্রীতে আছে একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। নেহেরু বলেছেন—'আমার হারাম হ্যায়।' এ কথা শরীরের যে প্রত্যঙ্গ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে তার নাম শ্রীমতী নাসিকা। বিশ্রামহীনভাবে সে তার কাজ (নিশ্বাস নেওয়া আর নিশ্বাস ছাড়া) চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের পেশা সম্পর্কে এ রকম সজাগ সবাই যদি থাকত তবে ভারতবর্ষের আজ এ চেহারা হতো না। নাকের পেশার কথা যখন বললাম তখন নেশার কথাও বলা উচিত। নাকের নেশা নস্যি।

অনেকে বলবেন এটা সব নাকের নেশা নয়। বিশেষত মেয়েদের নেশা তো নয়ই। তা ঠিক। মেয়েদের নেশা নস্যি নয়, পুরুষমানুষ। পুরুষমানুষের গন্ধই হল ওদের নেশা। এ নেশা এ নেশানের প্রতিটি মেয়ের মধ্যে পাবেন। তাই মেয়েদের বীজমন্ত্র

হল—

হাঁউ মাঁউ কাঁউ
পুরুষের গন্ধ পাঁউ।

মেয়েরা একবার পুরুষদের গন্ধ পেলে ছেলেদের আর গতি নেই। তৎক্ষণাৎ কবন্ধ করে ছাড়বে। কে না জানে কবন্ধকে শুদ্ধ বাংলায় বলে স্বামী। কোন অভিধানে এ তথ্য পাবেন না, কেননা এ সত্য নিশ্চয়ই জানেন যে, বেশির ভাগ অভিধানে স্বামীদেরই লেখা। আর স্ত্রী যেখানে ভীষণ স্বামীদের সেখানে বিভীষণ হবার জো কি!

শুনেছি এস্কিমোরা নাকে নাক ঘষে প্রেম জমায়। এরকম বুদ্ধি না হলে এস্কিমো! নাকের সুশীতল ছায়ায় গোলাপ ঠোঁটের দিকে নজর নেই, বেটাঃ' নাক নিয়ে ন্যাকামিতে মত্ত।

আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি নাকে নাক ঘষতে যাবেন না। ওতে প্রেম আসে না, হাঁচি আসে। আমি একটা মেয়ের নাকে নাক ঘষে দেখেছি তাতে কোন চার্ম নেই, বরং জার্ম আছে। আমাকে তিনদিন সর্দিতে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল।

সবাই জানেন হাঁচি আমাদের মতে অপয়া। এরিস্টটলও বলতেন হাঁচি অপয়া। কিন্তু খ্রীষ্টানদের মতে অপয়া-টপয়া নয়। ওঁরা অন্য এক কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন। ওঁদের ধারণা হাঁচির সঙ্গে আত্মা বেরিয়ে যেতে পারে। সে জন্য কেউ হাঁচলে ওঁরা বলে থাকেন –God Bless you! গ্রীকরা পুরোন সময়ে হাঁচলে বলতো 'Zeus preserve thee!' তার মানে হাঁচিতে আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার সম্ভাবনা ওরাও বিশ্বাস করত।

আচ্ছা, নাক কাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বলুন তো? বক্সারদের কাছে। প্রতিপক্ষের হৃষ্টপুষ্ট নাক দেখলেই খালি হাত নিশপিশ করে ওদের। নাক আউট করে নক আউট করতেই পছন্দ করে বক্সাররা। বক্সারের প্রার্থনা—ঈশ্বর, আমার প্রতিপক্ষের একটা টসটসে সোমত্ত নাক দাও। যে নাককে এক ঘুষিতে নিচু করে নিজের নামকে উঁচু করতে পারি।

আপনারা জানেন কুকুরের চরিত্র আর মানুষের চরিত্র অনেক তফাৎ। কুকুরের নাকের চরিত্রও ভগবান একেবারে উল্টো ধাঁচে তৈরি করেছেন। আমাদের শুকনো নাক মানে সুস্থ শরীর। কুকুরের উল্টো। কুকুরের শুকনো নাক মানে অসুস্থতা। ভেজা নাকই হল কুকুরের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আজব দুনিয়া। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন দেখেন আপনার নাক ভেজা অথচ শরীর ভালো তাহলে ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিশ্চয় করে নেবেন আপনি মানুষ, না কুকুর!

বাঁশীর মতো নাক বলে কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমাকে কেউ বুঝিয়ে দেবেন বাঁশীর সঙ্গে নাকের কি করে তুলনা হয়েছে? খাসির মতো নাক হলে না হয় বুঝতাম কিন্তু কোথায় বাঁশী আর কোথায় নাক। এরপর হয়তো শুনবো গীটারের মতো পা, সেতারের মতো কান, ট্রাম্পেটের মতো দাঁত, হার্মোনিয়ামের মতো হাটু।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল মেয়েদের নাক (slight uptuned nose ছিল সুন্দরীর লক্ষণ। নমুনা—কে কেণ্ডাল।) নিয়ে মোটেই মাতামাতি নেই। নাক দূরের কথা মুখকেও আজকাল ওরা মুখ্য মনে করে না। ওদের বর্ণনা শুধু কলার বোন্ থেকে এংকল বোন্ পর্যন্ত। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হয় মেয়েদের মাথাকে ওরা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। মেয়েদের কাছ থেকে ওরা সেক্সপীয়র আশা করে না, শুধু সেক্স আশা করে। সেজন্য মেয়েদের বিদ্যার মাপে ওরা মেয়ে যাচাই করে না, শরীরের মাপে করে। মেয়ে মানে ওদেশে ৩৬" ২১" ৩৬" বা ৪০" ২০" ৩৮"। ওরা নাক সম্পর্কে নির্বাকই বলা চলে। ফিগার ভালো হলে ওদের নিগারেও (nigger) আপত্তি নেই। ওদের দেশে এত বাড়াবাড়ি যে, যে মেয়ের চেসিস্ ভালো তার চেস্টিটি ভালো না হলেও ওরা পরোয়া করে না। আমি অবশ্য ওদের মতো নই! যখন থেকে নাক-সচেতন হয়েছি তখন থেকে

মেয়েদের দিকে তাকালে প্রথমেই নাক দেখি। নাকের পর বাদবাকি। সেদিন একটা মেয়ের নাক সম্পর্কে এত প্রশংসা করলাম যে, মেয়েটির নাক লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। পরের দিন ভয় হচ্ছিল মেয়েটি না তার নাক কেটে আমাকে ভ্যান গগের মতো (একটি মেয়ে ভ্যান গগের কানের প্রশংসা করায় কান কেটে ভ্যান গগ তাকে পাঠিয়েছিল) উপহার পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু না, মেয়েটি পরের দিন অসুস্থ হয়েছিল। আমার প্রশংসার আক্রমণে ওর নাকে ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। প্রেমে জ্বর আসে না যারা বলে তারা ভুল বলে। মেয়েটির সে কি জ্বর, সে কি ফোঁসফোঁসানি নাকের। গর্বে বুক ভরে গেল এই ভেবে যে, আমার প্রেমের ঝড়ই ওর নাকে সর্দির ঝড় এনেছিল!

ডাক্তারদের বড় বিপদ যেখানে সেখানে অসুখবাতিকগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের আক্রমণ। এ ব্যাপারে যে মেয়েরা বেশি জ্বালাতন করে। এক ডাক্তার এর থেকে বাঁচবার চমৎকার উপায় বার করেছিলেন। এক পার্টিতে উনি গেছেন। হঠাৎ এক সুবেশা সুন্দরী এসে ধরল, ডাক্তারবাবু, ভালোই হয়েছে আপনি এসেছেন। কাল থেকে নাক আমার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কি করে খুলবে বলুন তো?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে পকেট থেকে স্টিথিস্কোপ খুলে কানে লাগালেন, তারপর নির্বিকার ভাবে বললেন, জামাটা খুলুন।

মেয়েটির চোখ ছানাবড়া। লজ্জায় আতংকিত কণ্ঠে বলল সে, কি বলছেন ডাক্তারবাবু। জামা খুলব কেন, আপনি নাক দেখবেন তো।

না, ডাক্তার বললেন, আমি root থেকে দেখি আলতু ফালতু ডাক্তার নই যে, নাকের অসুখ তো শুধু নাকই দেখব। তাড়াতাড়ি করুন, জামাটা খুলুন। চটপট খুলে ফেলুন।

ইতিমধ্যে পার্টির বেশ লোক জড়ো হয়ে গেছে মজা দেখবার জন্য। মেয়েটির মাথা কাটা যাচ্ছে। সে বলল, কি বলছেন ডক্তারবাবু, এখানে পার্টিতে এত লোকের মাঝে জামা খোলা যায়? আপনি পাগল হয়ে গেছেন নাকি? কি বলছেন তার ঠিক নেই।

ডাক্তার : কেন ঠিক থাকবে না। আপনি যদি আমার চেম্বারে না এসে পার্টিতে অসুখ দেখাতে চান তবে আমাকে এখানেই পরীক্ষা করতে হবে বৈকি।

ফলাফল হল মেয়েটির লজ্জায় তৎক্ষণাৎ পলায়ন, আর সে পার্টিতে বাকি যারা ডাক্তারকে দেখে কোন মতামত নেবে ভেবেছিল তারা সব একেবারে হিমাদ্রি-নীরব।

সুতরাং সাবধান! ডাক্তারদের সামাজিক জীবন নিজের অসুখ নিয়ে জ্বালাবেন না। কেননা ওঁরাও আপনার লজ্জায় ঘোমটা জ্বালিয়ে দিতে পারেন।

মেয়েদের নাকের জন্য পুরুষমানুষরা কোনদিনই বেশি ঝামেলা করে না। ওদের ভয় মেয়েদের নাক নয়, মুখে। মেয়েদের মুখ খোলা মানে বাঁধ খোলা। মুখনাড়াকে যে পুরুষদের কত ভয় তার দৃষ্টান্ত আমাদের পুরোন ছড়াতেও আছে। নমুনা—

"দাদাভাই চালভাজা খাই
ময়না মাছের মুড়ো,
হাজার টাকার বউ এনেছি
খাঁদা নাকের চুড়ো।
খাঁদা হোক বোঁচা হোক
সব সইতে পারি
ঝাপটা-কাটা মুখ-নাড়াটা
ঐ জ্বালাতে মরি।"

দেখলেন তো খাঁদা বা বোঁচা নাকে আপত্তি নেই ছেলের, কিন্তু মুখ নাড়ায় ঘোর আপত্তি।

ছড়া রচয়িতা বোঁচা নাকের মেয়েকে রেহাই দিলেও ছিঁচকাদুনে ছেলেকে রেহাই

দেননি। তার নাক কেটে নেবার ধমক দিয়েছেন। যথা—

"কানকাটার মা বুড়ি
বেড়ায় গুড়ি গুড়ি
এক হাতে নুনের ভাঁড়
আর এক হাতে ছুরি।
যে ছেলেটা কাঁদে—
তার নাকটি কেটে
কানটি কেটে
দেয় গড়াগড়ি।।"

সুতরাং নাকী কান্না মেয়ে সওয়া যায় সে যদি বাচাল না হয়, কিন্তু নাকী কান্নার ছেলেকে সওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে সে ছেলের নাক কাটাই উচিত। অতঃপর তাতে নুন প্রয়োগ বিধেয়। অন্তত এ কথাটা ছড়ার ডাক্তার বলেন। সত্যি তাই। পুরুষ মানুষের কান্না সবচেয়ে দৃষ্টিকটু। আর নাকী কান্না তো মেয়েদের মুখে বাথরুম আলোচনার মতোই অশ্রাব্য।

নাক সম্পর্কে অনেক বললাম। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনাদের নাক জ্বালা করছে। না, আর জ্বালাবো না, শুধু মনে রাখবেন নাককে অবহেলা করতে নেই। নাক মানে প্রাণ, নাক মানে সম্মান। নাকের আমি, নাকের তুমি নাক দিয়ে যায় চেনা। নাকের মতো সাম্যবাদী কেউ নয়। নাক রাজার আছে, প্রজারও আছে। রাজকন্যার আছে, অচ্ছুৎকন্যারও আছে। নাক সবার আছে। আপনার উন্নতির জন্য নামের প্রয়োজন কথাটা ভুল, প্রয়োজন নাকের। আমার শ্লোগান, বিশ্বের সমস্ত নাক এক হোক। প্রতিজ্ঞা নিক—যার যার নাক যথাস্থানে রাখবে, অন্যত্র গলাবে না। কিউবা, ফরমোসা, জাপান থেকে নাক সরিয়ে নিক আমেরিকা, এলজিরিয়া থেকে ফ্রান্স, আফ্রিকা থেকে বৃটেন, গোয়া থেকে পুর্তুগীজ, কাশ্মীর থেকে পাকিস্তান আর ভারত সীমান্ত থেকে চায়না। না সরালে শূর্পণখার মতো নাক যাবে আর শুরু হয়ে যাবে আরেক লংকাকাণ্ড।

পৃথিবী আর লংকাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত নয়। শেষে আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ উনোর সভাপতিকে। সেটা হলো ইউনাইটেড্ নেশন্স অর্গানাইজেশনের নামটা বদলে দেওয়া হোক। সংক্ষেপে ইউ. এন. ও-ই থাকুক, কিন্তু পরে পুরো নাম হোক ইউনাইটেড্ নোজেস্ অর্গানাইজেশন। আশা করি, বিশ্ব নাক সংস্থার কর্তা আমার অনুরোধে কর্ণপাত করবেন। আর নেহেরুজীকে অনুরোধ নাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্য ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি থেকে সরিয়ে নাসিকে আনা হোক। আর আপনাদের একটি অনুরোধ আপনারা ঘরের দেয়ালে নিচের ইংরেজী লাইনটা লিখে বাঁধিয়ে রাখুন। এটাই হল গিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের শেষ কথা—"HE WHO KNOWS HIS NOSE REALLY KNOWS WHAT HE THINKS HE KNOWS."

এখানেই আমার নাকামির পাকামির ইতি।।

।। হাত ।।

হাত আমি ভালোবাসি। পুরুষের হাত ভালোবাসি অবশ্য একজনেরই। সেটা আমার নিজের। মেয়েদের কিন্তু হাতমাত্রই আমার প্রিয়। জাতির জন্য যদি কোনদিন প্রাণ দিই সেটা হবে নারীজাতির জন্য। ও' জাতটাকে বড্ড ভালবাসি বলে ও জাতটার হাতকেও ভালবাসি। আমার জনৈক ডাক্তারবাবু আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে হাতটা মেয়েদের শরীরের সঙ্গে যুক্ত। ওদের বসন ভূষণ-ফ্যাশানের মতো আলাদা বস্তু নয়। তাই ভরসা করি, মেয়েদের হাত যদি একবার হাতে আনি তবে ওদের হাতানো আর শক্ত নয়। হাত ধরলেই মেয়ে ধরা হল। আর মেয়ে ধরতে কার না ভালো লাগে? এ-ব্যাপারে সব পুরুষের এক রা। আমাদের দেশ আলাদা, ধর্ম আলাদা, চর্ম আলাদা, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা এক। ফলে আমাদের কেচ্ছাও এক।

হাতের মহিমা অনেক। হাতে হাত লাগলে নমস্কার, (সেক্ষেত্রে অবশ্য সেমসাইড গোল। অর্থাৎ বাঁ হাত আর ডান হাত জোড়া লাগানো) আবার হাতে হাত লাগলে হাতাহাতি (মোহন বাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের পদকীর্তির প্রতিবাদে হামেশাই মাঠে যা দেখতে পাওয়া যায়) আবার হাতে হাত লাগলে বিদ্যুৎ (হৃদয়ের মতো বড় বড় চোখের এক কিশোরীর কম্পিত হাত থেকে জলের গ্লাস নিতে যে-টুকু ছোঁয়াছুঁয়ি হয়, তাতে যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, বিশ্বাস করুন, তা দিয়ে কোলকাতা শহরকে এক বৎসরের জন্য আলোকিত করে রাখা যায়। কোলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি এ-ব্যাপারে ভেবে দেখতে পারেন।)

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় কিনা জানি না কিন্তু হাতের ধাক্কায় মূর্ছা খেতে আমি অনেকবার দেখেছি। পার্বতীর এক ধাক্কায় দেবদাস দারুদাস হয়ে গিয়েছিলেন। 'শেষের কবিতা'র শোভনলাল "যৌবনে একবার কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা" খেয়েছিলেন। তার ফলাফলের খবর আপনারা রাখেন। সুতরাং চুড়ি-পরা হাতকে অবহেলা করবেন না, কেননা চুড়ি-পরা হাত আসলে ছুরি-ধরা হাত। অবলার হাতেই অনেক পুরুষের কারবালা লেখা থাকে। তাই বলি নারীবিদ্বেষী যতোই হোন নারীর হাতকে খাতির করবেন। কেননা চাঁপার কলির মতো ওই আঙুল যখন আপনার আঙুলগুলো চেপে ধরবে অক্টোপাসের মতো, যখন অন্ধকার সিনেমা হলে সে-হাত ঘামবে আপনার মুঠোর জঠরে, যখন মৃদু চাপ দিয়ে আপনার অন্যহাতের সাবমেরিন-দ্রুততাকে কপট অভিমানে শ্লথ করবে তখন বুঝবেন মেয়েদের হাতেই আপনার সুখের বরাত লেখা। বুঝবেন ওদের হস্তেই আপনার আনন্দ ন্যস্ত, বুঝবেন ওদের মুঠোকরা হাতেই আপনার মিঠেকড়া স্বপ্ন লুক্কায়িত। হাতের চাপের মানে অনেক। কোন চাপের অর্থ আপনার হাত ধরাতেই আটকে থাকুক। অর্থাৎ হাতে আপনার শুরু নয়, শেষ। আবার কোন চাপের মানে

আপনার শুরু। না বুঝে কদর্থ করলে হাত ধরা থেকে পা ধরতে হতে পারে। সুতরাং চাপবিজ্ঞান সম্পর্কে রীতিমতো ওয়াকিবহাল হয়েই হাত ধরতে যাওয়া উচিত। না জেনে নরম মুঠির দিকে হাত বাড়ানো মানে গরম বিছুটির দিকে হাত বাড়ানো।

আমি একবার চাপবিচারে ভুল করে আনাড়ি প্রমাণিত করে ফেলেছিলাম নিজেকে। আর আনাড়ি নারীমাত্রেই অপছন্দ। মেয়েরা যোগ্য প্রেমিক চায়, অজ্ঞ প্রেমিক নয়। ব্যাপারটা বলি। বোকা বোকা আকাশে ছিল ন্যাকা ন্যাকা চাঁদ। সমুদ্র ছিল বাচাল আর হাওয়া বেচাল। এ-হেন পরিবেশে জুহুর সমুদ্রতীরে আমি ছিলাম, বালি ছিল, আর ছিল আমার এক বন্ধুর শালী। নাম তার রচনা। রচনা ছিল সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা। দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে আমার ভালো লাগে। সাড়ে পাঁচ ফুট দীর্ঘ একটি শরীর, যার প্রত্যেকটি ইঞ্চি মেয়ে ভাবতেই তো বুক ভরে ওঠে প্রেমে, কপাল ভরে ওঠে ঘামে। রচনার চুল ঘাড় হোঁচট, আর তাতে মৃদু সুগন্ধ তেলের সুবাস। ঠোঁট দুটো পাতলা লালচে যেন টমেটো স্যাণ্ডউইচ। হাসিটা উশ্রীর মত সুশ্রী। সবচেয়ে সুন্দর ওর চোখ। নীলাভ। নীল নীল জ্যোৎস্নার জন্যই ওর চোখ নীল লাগছিল না ওর চোখ নীল বলেই জ্যোৎস্নাটাকেও নীল লাগছিল, সঠিক বলতে পারব না। ওর শরীরের ঢেউগুলো আরব সাগরের ঢেউয়ের মতো উচ্ছৃংখল নয়, বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের মতো সুশৃংখল। খুব সম্ভব ভগবান অজন্তার মূর্তিগুলোর নকল করে ওকে তৈরি করেছিলেন। মোট কথা, রচনাকে দেখে যার জ্বর আসবে না হয়ে সে জড়, নয় মেয়েমানুষ। ভুল বললাম, মেয়েদেরও জ্বর আসবে। হিংসেয়।

এ-হেন রচনা পুরুষমানুষদের মনে গাদা গাদা ভাব জাগায় না, একটাই ভাব জাগায়, গদগদ ভাব। এবার বলি রচনাকে নিয়ে কি করে সূচনা করলাম, গেলর্ড রেস্তারা'তে গে লর্ডের মতোই খাওয়ালাম ওকে, রচনা খেতে পারে বটে! ওর খাওয়ার বহর দেখে মনে হল সাড়ে পাঁচ ফুট রচনার পুরোটাই সম্ভবত ফাঁপা। কাঁপা হাতে বিল দিলাম। তারপর ট্যাক্সি চেপে হু হু বেগে জুহু। ইতিমধ্যে চাঁদফাঁদ যথাস্থানে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বসলাম পাশাপাশি বালিতে। কথা শুরু করতে হবে। কি দিয়ে আরম্ভ করা যায়? ঠিক, দর্শন। ফিলজফারদের ওপর মেয়েদের খুব আকর্ষণ হয়। বললাম, আচ্ছা রচনা, মানুষ জন্মায় কেন বলতে পারো?—প্রশ্নটা করে চোখ মেলে দিলাম দিগন্তে। দার্শনিকের মতোই। রচনা মুহূর্তমাত্র হকচকিয়ে রইল, তারপর বলল, বোকার মতো কথা বলো না। এত বড় হয়েছো জানো না মানুষ জন্মায় কেন? বাপ-মার জন্যে, আবার কেন।

জবাব শুনে আমি দিগন্তের মতোই বোবা হয়ে গেলাম। বুঝলাম দর্শন অ্যাঙ্গেল ফেল করল। এবার? হাল ছাড়তে নেই। সাহিত্য নিয়ে দেখা যাক কি ফল হয়। বললাম, যেতে দাও জন্মরহস্য। রচনা, 'শেষের কবিতা' পড়েছো?

রচনা : হ্যাঁ।

বললাম : কেমন লেগেছে?

রচনা : অপূর্ব। আমি তো পড়ে অমিত রায়ের প্রেমে পড়ে গেছি।

খুশি হলাম, বললাম, বাংলা সাহিত্যে আর কোন উপন্যাসের নায়কের প্রেমে পড়েছি তুমি?

হ্যাঁ, বলল রচনা।

কার? জানতে চাইলাম।

দুষ্টু হাসি হাসল রচনা, বলল, গেস্ করো তো।

বললাম : শ্রীকান্ত?

রচনা : না।

বললাম : গোরা?

রচনা ঃ উহুঁ।

বললাম ঃ কংকর ?

রচনা ঃ না, হলো না।

বললাম ঃ দেবদাস ?

রচনা ঃ না।

বললাম ঃ বিপ্রদাস ?

রচনা ঃ না।

বললাম ঃ নরেন্দ্র ?

রচনা ঃ উহুঁ।

ঘাবড়ে গেলাম। কে রে বাবা? শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এমনকি প্রবোধ সান্যাল বললাম তবুও হল না। ঠিক আছে। নিশ্চয়ই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বললাম ঃ কে অপু ?

না গো না, বলল রচনা।

যাক গে, তুমি বলে দাও, বললাম আমি।

ঃ হেরে গেলে তো ? এত বললে আসলে নামটাই বললে না তুমি। রচনার সারা মুখে কৌতূকের ওডিকোলন।

ঃ আসল নাম ? কে, বলেই দাও না। হার তো স্বীকারি করেছি।

রচনা বলল, কে আবার, ওন্‌লি রিয়েল হিরো, দস্যু মোহন।

শুনলাম। ইচ্ছে না থাকলেও শুনতে হল। কেননা রচনা তার গর্বকণ্ঠের সর্বোচ্চ স্বরে নামটা বলল, বলল আমার কানের কাছে তার তুলতুলে ঠোঁটদুটো এনে। শুনে আমি আমার কানকে ধন্যবাদ দিলাম। এত বড় শকেও কানে তালা লাগল না। বুঝলাম, আমার কান শক-প্রুফ। বুঝলাম আমার কর্ণ মহাভারতের কর্ণের চেয়ে কোন অংশে কম বীর নয়।

সাহিত্য দিয়ে জমলো না,—এবার ?

হাল ছাড়বো না। তাই বিপুল বিক্রমে আবার আলোচনার সূত্রপাত করি। রাজনীতি। বললাম, আচ্ছা চাও এন লাই সম্পর্কে তোমার কি মত? রচনা ভাবিত হল। ভুরুতে এল ভাঁজ, চোখ হল চোখা। বলল, চাও চাও খেয়েছি বেশ ভালো লেগেছে। চাও মিয়েনও খেয়েছি। কিন্তু চাও এন লাই তো খাইনি। কোন রেস্তোরা'য় পাওয়া যায়? খাওয়াবে ?

মাথা নাড়লাম। খাওয়াব বৈকি। কিন্তু নিজে খাবি খেতে লাগলাম। রচনার রাজনীতির কাছে রাজনীতিও ফেল করল। ও চাও এন লাই খেতে চায়। যদি চীনের প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ না করে জাপানী প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করতাম ভালো হত। আর যদি ভাগ্যগুণে তাঁকেই খেতে চাইত তবে সে সুযোগ আমি কখ্‌খনো হেলায় হারাতাম না। আপনারা জানেন জাপানের প্রধানমন্ত্রীর নাম কিসি। কিসি হয়তো দিতে পারতাম না কিন্তু তার বদলে Kissই দিতাম। যাকগে একটা kissই না হয় miss করলাম Missতো আর miss করিনি।

শেষ পর্যন্ত দেখছি আমার পোগ্রেস খুব স্লো। ওদিকে চাঁদটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ফেক্‌লুর মতো আর মস্তো সমুদ্রটা মস্তানের মতো হাসছে ছলাৎ ছলাৎ। দূর ছাই, বললাম আমি, ধ্যাত্তুরিও বললাম—মনে মনে। ভাবলাম আশেপাশে ঝোপ পিটিয়ে লাভ নেই। লাভারকে এগুতে হবে লাভ-এর কথা দিয়েই। তাই কাতুকুতু কণ্ঠে বললাম,—সমুদ্র, চাঁদ আর তুমি এই তিনের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। কেননা সমুদ্রের গভীরতা নেই তোমার হৃদয়ের মতো, চাঁদের রূপ নেই তোমার মুখের মতো। রচনা, তুমি স্বর্গের

রচনা আর রচানার স্বর্গ। তুমি নূতনের মতো পুরাতন আবার তনুজার মতো নূতন। তুমি তিলোত্তমা। রচনা মৃদু হাসল। হাওয়া এসে ওর শাড়িকে বেলুন করল। কিন্তু ওর খেয়াল নেই। কেননা আমার তোষণের হাওয়াতে ওর মনও স্বস্তবত তখন বেলুন। এই সুযোগ! আমি খপ্ করে ওর হাত ধরলাম। ওর আঙ্গুলগুলোর সঙ্গে ওর মাথার আশ্চর্য মিল। বেশ মোটা। কিন্তু সেই আঙ্গুলগুলো নরম যেন মাখন। হাতটাতে চাপ দিলাম। রচনা বাঁধা দিল না। কিন্তু এর অর্থ আমি ভুল বুঝলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে হঠকারিতা করে বসলাম। বাঁ হাত দিয়ে ওর কোমর ধরে কাছে টানলাম। ফরাসী ফিল্মের ষোড়শী নায়িকাকে যে-ভাবে উন্মত্ত নায়ক কাছে টানে, সেইভাবে। ভুল হল। ফরাসী দেশের নায়ক আর এ-দেশী নায়কের ব্যবহার এক হওয়া মারাত্মক। ওদের পক্ষে যেটা নেহাৎই মানবিক আমাদের দেশে সেটা রীতিমত পাশবিক। ফলে ফরাসী নায়িকার মতো রচনার হাত আমার কোমরে এল না, এল গালে। বিদ্যুতবেগে। তাতে বেগ যা ছিল সবটাই রাগের, অনুরাগের আবেগ ছিল না একবিন্দু। তাই সেখানে প্রেমের আগুনে হৃদয় জ্বলার কথা সেখানে গাল জ্বলতে লাগল। হৃদয়ে নিবে গেল প্রণয়ের পঞ্চপ্রদীপ, গালে ফুটে উঠল প্রেয়সীর পঞ্চাঙ্গুলি। শুধুমাত্র হাতের চাপের অর্থ না বোঝায় এই অনর্থ। ভুলে গিয়েছিলাম হাত থেকে ঝট্ করে কোমরে যেতে নেই। হাত থেকে যেতে হয় ঠোঁটে। Lips, তারপর leap forward. হাত ধরেই হঠাৎ long jump করায় সব মাটি। মনে রাখা দরকার প্রেমে long jump বা high-jump চলে না, চলে Hop-step-jump.

সুতরাং প্রেমে যদি সফল হতে চান তবে হাত ধরতে শিখুন, হাতের ভাষা বুঝতে শিখুন। তালে তালে না এগুলে প্রেয়সীর হাত গালেই পাবেন, গলে আর জুটবে না। আর পানি-পথেই যদি আহত হন তবে পানি-গ্রহণটা করবেন কি করে বলুন। হাতে পানি না পাওয়ার মানেই হল হালে পানি না পাওয়া। পানিহীন জীবনকেই সাধুভাষায় বলে প্রাণহীন জীবন।

হাত ধরার অনেক রাস্তা। আমার বন্ধু হাবুল বণিক এ ব্যাপারে রীতিমত একটি মাণিক। হাবুল সর্বদা হাত খপ করে ধরার জন্য হাঁ করে আছে। ও যে কোন লাজুকলতা মেয়ের হাত খপ করে ধরে ফেলতে পারে আর সে লাজুকলতা মেয়েই ওর হাতে হাত মেলে দিয়ে বসে থাকে ঠোঁটের রেলিং-এ এক শাড়ি হাসি মেলে দিয়ে। কাণ্ড দেখে অবাক মানতে হয়। হাবুল আচমকা পাশে বসা মেয়ের হাত ধরে বলে ওঠে, ওরে বাপ, আপনার সানলাইনটা দারুণ; জুপিটারে ক্রুশও রয়েছে। মেয়েটি সান লাইনের কথা শুনে সানসাইন মুখে বসে থাকে। জুপিটারের ক্রুশ এর জন্য হাবুলের ওপর cross হয় না। আর হাবুল সেই সানলাইন দিয়েই ওর প্রেমের মালগাড়ি পার করতে থাকে। এই জ্যোতিষীর কায়দায় যে-কোন মহিয়সীকে ঘায়েল করা যায়। হাবুল সেই যে হাতের রেখা দেখবে বলে হাত নেয় সে হাত ছাড়ে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মেয়েটির কপালে চিন্তার রেখা দেখা দেয়। অথচ পাম্ (palm) সম্পর্কে ও কিছছু জানে না, ও যা কিছু জানে সব কাম সম্পর্কে।

হাবুলের হাত ধরবার হাজার পন্থা। একটি পাঞ্জাবী মেয়ের হাত ধরবার জন্য ও বলেছিল,—আসুন পাঞ্জা লড়ি। পাঞ্জা লড়তে হলে হাবুলের মতে বেশ মাঞ্জা-দেয়া মেয়ে দরকার। ও বলে—'আপনার চুড়ি বা ঘড়ি বা আংটি বা আঙ্গুল কি সুন্দর' বলে হাত ধরা যায়, 'আপনার চোখগুলো লাল, জ্বর নাকি দেখি' বলে পাল্স দেখার ভানে হাত ধরা যায়, 'আপনার হাতটা ঠিক আমার মায়ের মতো' বলে হাত ধরা যায়, কর্দমাক্ত রাস্তায় 'হাতটা দিন পার করে দিই' বলে হাত ধরা যায়, করমর্দন করার সময়ও হাতে হাতে অনেক বাত বলা যায়। হাবুল হাত একবার ধরলে ছাড়তে চায় না। কিন্তু হাত ধরা থেকে ছাঁদনতলা যেতে নারাজ হাবুল। ওর মটো হচ্ছে—ধরি হাত না ছুঁই পানি। যা

বলতে পারেন, ধরি হাত না শুই পাশে।

হাত নিয়ে কবিতাও কম হয়েছে নাকি। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা শ্যামার করস্পর্শে নৃত্য করে উঠেছিল নায়কের হৃদয়। উনি লিখেছেন—

"একদিন বলেছিলে "জানি হাত দেখা" ;
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গণেছিলে রেখা
বলেছিলে, "তোমরা স্বভাব
প্রেমের লক্ষণে দীন।"—দিই নাই কোনই জবাব
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়াছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।।"

তাই হয়। 'পরশের সত্য পুরস্কারে' সব দোষ খণ্ডে যায়। আরেক জায়গায় বলেছেন—

"শোভন হাতের সন্দেশ পানতোয়া
মাছ মাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয়ে সেবামাধুর্যে ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।
বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে
ভাবিছ বসিয়া সহাস ওষ্ঠাধরা—
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদু সংকেতে মোটা ফরমাস করা।
আচ্ছা, না-হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো,
বরদানে দেবী, না হয় হইবে বাম—
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম।।"

শুধু হাতের দামও কম নয়। শুধু হাতেরও যে দাম কম নয় একথা আরেকজন আধুনিক কবিও বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু। 'হাতে'র ওপর লেখা এটিই সম্ভবত একমাত্র বাংলা কবিতা। একমাত্রও শ্রেষ্ঠ। রোমান্টিক কবিতার আসল পরিচয়। আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিতা এটি। কবি লিখেছেন—

....."হঠাৎ পথের মোড়ে একটি বাড়ির
নীচের ঘরের জানালায়
দেখিলাম, ম্লান-নীল ইলেকট্রিকের
আলো দেখা যায়
শুধু এই জানালায় আলো জ্বলিতেছে
অন্ধকার শহর নিরালা ;
কাছে এসে চোখ তুলে যেই তাকালাম,
—বুজিলো জানালা।
নিলাম তাহারি ফাঁকে পলকের তরে
একখানা সাদা হাত দেখে—
দুইটি কবাট এসে বুজিলো তখনি
দুই দিক থেকে।
একখানা সাদা হাত, কয়টি আঙুল,

আংটির হীরার ঝলক,
মণিবন্ধে সরু রুলি, ম্লান নীল আলো,
—চোখের পলক।
আবার দু'চোখ ভরে ঘুম জমে এলো,
সকল পৃথিবী অন্ধকার ;
এই কথা না জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতখানা কার।
এসেছি নিজের ঘরে, বৃষ্টিও এসেছে,
হাওয়ার চিৎকার যায় শোনা ;
যার হাত, কাল তার মুখ দেখি যদি,
আমি চিনবো না।
বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারায়েছে,
না জানি এখন কত রাত ;
—কখনো সে-হাত যদি ছুঁই, জানিব না
এ-ই সেই হাত।"

অপূর্ব নয় কি ? আমি আমার বন্ধু সদাশিব দত্তকে মেয়েদের হাত যে কি বস্তু তা বোঝাচ্ছিলাম এই সব কবিতার ফুল ছিটিয়ে। কিন্তু সদাশিবের মুখ শিবের মতো ধ্যানস্থ মনে হল না, মনে হল শিবের মতো বিধ্বস্ত। বললাম কি সদু, কবিতাগুলো শুনে রক্তে নাচন জাগছে না ?

ঃ হ্যাঁ, বলল সদাশিব, তাণ্ডব।

মুষড়ে পড়লাম, কেন কবিতার ফুলে—

বাধা দিল সদু, বলল কবিতার ফুল ফোটাচ্ছিস তুই আর আমার এদিকে রক্ত ফুটেছে। হাত দিয়ে ন্যাকামো করা তোর সাজে বিয়ে করিসনি বলে। হুঁ, যেদিন বিয়ের মণ্ডপে তোর বৌদির হাত ধরেছিলাম সেদিন আমিও ভেবেছিলাম আহা হাত ধরায় কি আনন্দ। এখন বুঝতে পারছি সেদিন আসলে আমি হাত ধরিনি, হাতী ধরেছি।

ঃ কি বলছিস সদু, বৌদির এমন মৃণালসদৃশ ভুজ, আমি বলতে যাই কিন্তু পারি না।

ঃ মৃণালের মতো ভুজ না তোর মুণ্ডু। ভোজপুরী দরোয়ান সদৃশ ভুজ বল তবে ঠিক হতে পারে। ওই হাত দেখলেই আমার জ্বর আসে।

আমি হাসলাম, জ্বর তো আসবেই। রিমঝিম বৃষ্টির রাতে ওই নরম উষ্ণ হাত যখন তোমার গলায়—

ঃ বাজে বকিসনে। তোর বৌদির হাত আমার গলায় আসে না, আসে পকেটে। সর্বদা। তুই খালি হাতের গুণ গাইছিস, পরে বিয়ের পর আমি তোর বৌদির হাত কোনদিন খালি দেখেনি।

কি থাকে হাতে ?—আমি শিশুসরল চোখে প্রশ্ন করি।

ঃ সাধারণতঃ জুতো।

জুতো ? বলকি ? আমি হতভম্ব।

ঃ হ্যাঁ। জুতো অনেক মেয়েদের চোখে থাকে, অনেক মেয়েদের পায়ে থাকে আর অনেক মেয়েদের হাতে। আমার বৌ-এর হাতেই বেশীর ভাগ সময় থাকে। আর যখন জুতো থাকে না তখন ঝাড়ু থাকে নয়তো বেলুনচাকী, নয়তো খুন্তি। তবে বেশীর ভাগ সময় জুতোই থাকে।

ঃ বৌদির জুতো থাকে হাতে ?

ঃ সব সময় তোর বৌদির জুতো থাকে এমন কোন কথা নেই। ওর হাতে নিজের জুতো না থাকলে সাধারণতঃ আমার চটি থাকে।

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, আমি বললাম। ঠিক এমন সময় আবির্ভাব হল বৌদির। জ্বলন্ত চোখে তাকালেন সদুর দিকে, বললেন, এখনও বসে আড্ডা মারা হবে? বাজারে যাবে নাতো খাবে কি ঘাটের মড়া?

কণ্ঠস্বর শুনলাম। হাতও দেখলাম। খালি নয়। তাতে বিদ্যাসাগরী চটি উদ্যত। মেজাজ রয়েছে চটে আর হাতে রয়েছে চটি। অবস্থা রীতিমতো আশংকাজনক।

শুকনো গলাতে বললো সদাশিব, না স্যরি, তোমার কোমল বাহুলতার গুণ গাইছিলাম শচীনের কাছে।

কানে বৌদি একটু খাটো। গতরের মতোই। বললেন, কার গুণ গাইছিলে? লতার? সকাল সকাল উঠে লতা মঙ্গেসকারের গুণ গাওয়া ছাড়া আর কর্ম পেলে না তুমি।

না না, তাড়াতাড়ি ভুল শোধরায় সদু, তোমার বাহুলতার তোমার মৃণালভুজের।

কি? কাজকর্ম ফেলে মাংটামো করা হচ্ছে। ঘাটের মড়া, তোর ভীমরতি হয়েছে, বলে সদাশিবের মাথা তাক করে চটি ছুঁড়লেন বৌদি। অব্যর্থ নিশানা। যেন মিডলস্টাম্প লক্ষ্য করে ডেভিডসানের বল। সদাশিবের মিডলস্টাম্প নড়ে গেল। অর্থাৎ ওর নাক; ক্লিন বোল্ড আমি বৌদির আশ্চর্য পারদর্শিতায় আরেকটু হলে হাততালি দিয়ে বসতাম। কিন্তু বৌদি সদাশিবকে আউট করে নিজের প্যাভিলিয়নে অর্থাৎ কিচেনে ফিরে গেলেন। পেছনে রেখে গেলেন একটি রক্তাক্ত নাক আর একটি স্তম্ভিত বুরবাককে।

কি বুঝলি? প্রশ্ন করল সদাশিব।

বললাম, বুঝলাম বৌদির মধ্যে Sadism আছে।

ঃ Sadism আছে কিনা জানিনা তবে madism আছে। তাই বলছি শচীন, মৃণাল বাহুডোরফোর ভুলে যা, ওদের হাতের বাঁধন হলে শেকল বুঝলি? তারপর সদাশিব দত্ত দাঁড়িয়ে উঠল। আকাশে উঁচিয়ে তুলল মুস্টিবদ্ধ হাত, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলল, এ শেকল আমাদের ভাঙতেই হবে। বিশ্বের নিপীড়িত স্বামীরা এক হও।

শুনে মনে হল যেন মনুমেণ্টের তলায় বসে আছি লক্ষ জনতার মাঝে। সামনে বিপ্লবী একজন অভিনেতা। (অভিনেতা আর দেশনেতা আমার কাছে একার্থবাচক। অভিধানে এ-দুটো শব্দের ভুল অর্থ দেওয়া থাকে। সংশোধন বাঞ্ছনীয়।) আকাশে হাত তুলেই সদাশিব চলে গেল। বিশ্বের নিপীড়িত স্বামীদের এক করতে না নিজের পীড়িত নাকে ডেটল লাগাতে বলতে পারব না।

সদাশিব দত্তের অন্তর্ধানে বেশ খানিকক্ষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম সদাশিবের মানসী রাক্ষুসী বলে আমার বেচার-হাফও বিটার-হাফ হবে এমন কোন কথা নেই। কপাল মন্দ বলে ওর গলায় জুটেছে কণ্টকমালা, আমার তো বৈজয়ন্তীমালাও জুটতে পারে! আপনারা বলবেন বামন হয়ে চাঁদে হাত দিচ্ছি। কিন্তু বামনরা চাঁদে হাত দিতে পারে না এ তথ্য সত্য নয়। রাশিয়ানরা বেঁটে জাত। মার্কিনদের তুলনায় নেহাৎই বামন। কিন্তু এই বামনরাই চাঁদে হাত দিয়েছে।

কাজে কাজেই আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন না। হাত বাড়ালেই বন্ধু হয়। এইবার আমি হাত বাড়াবো শুধু প্রাণের ভয়ে, হাত বাড়ালেই বন্ধু না হয়ে যদি হাত বাড়ালেই বুদ্ধু প্রমাণিত হই! তবে ইংরেজীতে বলে, No risk, no gain। আমি সংশোধন করে বলি, No wrist, No gain.

মেয়েদের wrist সর্বদা watch করুন। সুযোগ মতো আঁকড়ে ধরুন wristwatch—এর মতো। হাতটায় মৃদু আঁচড় কাটুন। ধীরে ধীরে দেখবেন আপনার

আঁচড়ে ওর হৃদয়ে মোচড় দেওয়া শুরু হবে। এইবার আলতোভাবে হাতটা তুলে ঠোঁটে বোলান। তারপর, যখন আপনার বুকের রক্তে বেজে উঠবে আল্লারাখার তবলা, বুঝবেন এইবার আপনার আর ক্যাবলা হয়ে থাকা চলবে না। কি করবেন তখন ? রোমিওর মতো রোমাণ্টিক হয়ে উঠুন, ডন জুয়ানের মতো জোয়ান মনে করুন নিজেকে। তারপর হাতটা তুলে বুকে রাখুন। দেখবেন আপনার হৃদয়ের জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে উজ্জ্বল করে তুলছে মেয়েটির চোখের বাতি। ফ্লুরোসেণ্ট আলোর মতো ওর ঠোঁট কাঁপছে থরথর। তারপর ? বলুন, যা চিরকালের পুরুষ চিরকালের নারীকে বলে থাকে। বলুন ঃ For God's sake hold your tongue (and conscience too) and let me love.

মেয়েটি বলবে, না। কিন্তু ঘাবড়াবেন না, এ-রকম পরিস্থিতিতে 'না' মানেই হ্যাঁ।

তাহলেই দেখুন আপনি হাত থেকে হাঁ-তে পৌঁছে গেছেন।

(জনান্তিকে বলে রাখি, মেয়েটির এই হাঁ আসলে হাঙরের হাঁ। সেটা অনেক পরে বুঝবেন। যতক্ষণ না বুঝবেন ততক্ষণই আপনার লাভ। Love মানে এটুকুই যা লাভ, বাকি লোকসান।)

লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করছে। সুতরাং হাত সম্পর্কে আমার সমস্ত বাত এখানেই শেষ। পরের বার পা নিয়ে পাকামী করার ইচ্ছা রইল।

॥ বন্ধু ॥

শৈশবের কথা ভাবলেই মনে পড়ে বাবার কথা। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বাবারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বাপ আর বাপ্‌রে বাপ। আমার বাবা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর পাপা (papa) যা'র কাছে সন্তান মাত্রেই হচ্ছে পাপী। বাবাদের যদি সুর দিয়ে বিচার করতে হয় তবে আমার বাবাকে নিঃসন্দেহে রাগপ্রধান বলতে পারেন। রাগই ছিল তাঁর জীবনে প্রধান, বাদবাকী যা ছিল তা বলতে পারেন উপাধান। সত্যি তাই, যেটুকু জেগে থাকতেন সেটুকু রেগেই থাকতেন। তাঁর শাসনে ছোটবেলায় আমার তেমন কোন বন্ধু জোটেনি। কেননা বাবার উপদেশ ছিল ভালো ঘরের ভালো ছেলেই শুধু বন্ধু করা যাবে। সুদূর বর্মাতে তাই তেমন সৎ ছেলে একজনের বেশী জোটেনি। সেই ছিল আমার ছোটবেলাকার একমাত্র বন্ধু। বলা বাহুল্য সে বন্ধুটি আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নন।

পৃথিবীর যেমন তিনভাগ জল এক ভাগ স্থল আমার শৈশবেও তেমনি ছিল তিনভাগ মেয়ে ও একভাগ ছেলে। নিজের যদিও একটি মাত্র বোন কিন্তু সম্পর্কে বোন এমন অনেক মেয়ে ছিল বাড়িতে। তাদের সাম্রাজ্যেই আমি মানুষ। সেজন্য বাবার পর এরাই ছিল আমার বন্ধুশ্রেণীর। সুন্দর বোনদের সেই সুন্দর বনে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত আমার। এরকম পরিবেশে হাঁপাবো না এমন প্রাণ শুধু একজনেরই আছে। তিনি হচ্ছেন হিন্দী সিনেমার ভিলেন প্রাণ। যা বলছিলাম, বোনদের ভীড়ে bone ভাজা-ভাজা অবস্থা। সবাই আমাকে দিয়ে ছোটখাট কাজ করিয়ে নিত। যেমন রান্নাঘর থেকে গুড় চুরি করে আনা, গাছ থেকে কাঁচা আম আনা আর চুপিচুপি ডাকবাক্সে নীলরঙের খাম পোস্ট করে এস। কিন্তু সবাই ছিল কাজের বেলায় কাজী আর কাজ ফুরোলে মেজাজী। চান করিয়ে দেয়া বা চুল আঁচড়ানো, পড়া দেখিয়ে দেয়া বা মাছ বেছে দেয়া এসব কিছুই করত না ওরা। কিন্তু যখন ছাতে চিলেকোঠার আড়ালে, পিকাসোর ঘড়ির মতো ছায়ায় বসে অপরাহ্নের রোদ্দুর-কাক-কার্নিসের সঙ্গতে ওরা চোখ বড় বড় করে আচার চাটতে চাটতে ফিসফাস করত তখন আমাকে আমলই দিত না।

ঃ এই খোকন, তুই এখানে কি করছিস, যা নীচে যা। কালকের হোম টাস্ক কর গিয়ে।

ঃ এই খোকন যা না, কি পাকা ছেলে বাপু, মেয়েদের আড্ডায় বসতে এসেছে।

ঃ এই, তুই পুরুষমানুষ না, আমাদের সঙ্গে এসে বসতে লজ্জা করে না।

ঃ যাও খোকন, বড়দের কথাবার্তা ছোটদের শুনতে নেই।

ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষ্য করে দেখুন, আক্রমণ কি রকম নিখুঁত! প্রথম বোন ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছেন, স্কুল মাস্টারের ভয়। দ্বিতীয় জন আমাকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন যে আমি ছেলে ও ওঁরা মেয়ে। তৃতীয়জন আমার মধ্যে সুপ্ত পুরুষসিংহ জাগ্রত

করার চেষ্টা করেছেন অহমিকার কেশরে হাত বুলিয়ে আর চতুর্থজন সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা গুরুজন ও আমি অভাজন। সুতরাং উঠতে হল। প্রমীলারাজ্য থেকে সবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছি ওমনি শুনতে পেলাম ন'দি ঘাড়ের নীচে আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে শিরীষ কাগজের মতো গলায় বলতে শুরু করেছে, জানিস ভাই—

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, কি বললে?

ন'দি ঃ তোকে আবার বললাম কখন, তুই যা।

আমি ঃ বারে, এইমাত্র যে ভাই বলে ডাকলে?

ন'দি ঃ তোকে ডাকিনি।

আমি ঃ আমি ছাড়া এখানে আর ভাই কোথায়, সবাই তো তোমরা বোন।

ন'দি ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, বোনদের মধ্যেই আমরা ভাই বলে কথা বলি, এখন তুই যা দিকিনি।

আমি ঃ কিন্তু সে তো ভুল। ভাই মেসকুলিন জেণ্ডার।

ন'দি ঃ তবে রে পাজী, জেণ্ডার শেখাতে এসেছো তুমি গণ্ডার কোথাকার। আর একটা কথা বলেছো কি উঠে চড় লাগাব হারামজাদা। ভাগ্।

সবাইকার আগুন-চোখ দেখে বুঝতে পারলাম সত্যি এখন আগুন লেগেছে বোনে বোনে। পিঠটান দিতে হল যদিও ক্ষুণ্নমনেই ইচ্ছে ছিল আবার ন'দির ব্যাকরণ শুদ্ধ করার চেষ্টা করি, বলি, আমি যদি হারামজাদা হই বোন হিসেবে ওরা কি হয়। কিন্তু বৃথা! চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি গ্রামার শেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই ওদের।

ছোটবেলা এভাবেই কাটল। কৈশোরে একটি পাঞ্জাবী বন্ধু জুটেছিল কিন্তু তার সঙ্গে আড়ি হয়ে গেল। কারণ বেটা বলেছিল ভগবান নাকি পাঞ্জাবী! বেটার আস্পর্ধা দেখুন, বিশ্বশুদ্ধ লোক জানে ভগবান হচ্ছেন বাঙালী আর ও বলেছে কিনা পাঞ্জাবী। হাতাহাতি করেও ঝগড়ার মীমাংসা হল না। ওর দাদা দাদাগিরি করতে এসেছিল, বলছিল ভগবান হচ্ছেন সবাইকার এক। উত্তর দিয়েছিলাম, এক তো বটেই, তিনি বাঙালী। উনি বললেন—স্বর্গে বাংলাদেশ পাঞ্জাব ইত্যাদি নেই। ওখানে ভগবান বাঙ্গালী কি করে হবেন?

বললাম, বর্মাতে কি বাংলা দেশ পাঞ্জাব আছে? ওখানে যেমন আমরা বাঙালী রয়েছি, ভগবানও তেমনি বাংলা দেশ থেকে গিয়ে স্বর্গে থাকছেন। স্বর্গে থাকছেন বলে ওঁর বাঙালীত্ব মোটেই ঘুচে যায়নি।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুবিচ্ছেদ। হোক, ভগবানকে অবাঙালী বানাতে চায় যে, এমন বন্ধুর চেয়ে আমার বোনেরা শতগুণে ভালো, হাজার গুণে ভালো আমার বাপ, মানে আমার বাপ্রে বাপ্।

অতঃপর সময় গড়িয়ে গেছে। শৈশব কৈশোর থেকে যৌবনে এসে পৌঁছেছি। অনেক বন্ধু জুটেছে। বিচিত্র তাঁদের চরিত্র। একজাতের বন্ধু আছে যারা জীবনকে মধুর করে তোলে, অন্যজাতের বন্ধুদের কাজ জীবনকে বন্ধুর করে তোলা। আমার নসীব, দ্বিতীয় জাতের বন্ধুই জুটেছে বেশী। ধরুন, আমার বন্ধু ভানা। ভানার জীবনের ধ্যান জ্ঞান শুধু ফুটবল আর ফুটবল! মোহনবাগান, রাজস্থান, ইস্টবেঙ্গল। চুনী গোস্বামী, আমেদ আর রমন। ফুটবল নিয়েই সারাদিন মাথা ঘামাচ্ছে। ওকে কত বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে ফুটবল নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় না, যদি ঘামাতেই হয় তবে পা ঘামানো উচিত। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ফুটবল আমি দু'চোক্খে দেখতে পারি না। কাদা চপচপে মাঠে একটা বল নিয়ে বাইশটা জোয়ান মদ্দ লাথালাথি করছে এ দেখতে আমি মোটেই রাজী নই। তার চেয়ে আমি অখাদ্য কোন ডিকেটটিভ গল্পের অবধ্য কোন হার্কুল পয়োরটের অসাধ্য কোন খুনের হাস্যকর সমাধান পড়ব সেও ভালো। খেলা সম্পর্কে

আমার ধারণা ওটা একটা গোলের জায়গা। গোল দেওয়া ও করার একমাত্র স্থান হচ্ছে খেলার মাঠ। ওখানে ভালো খেললে গোল দেওয়া যায়, আর খারাপ খেললে দলের সমর্থকদের গোল, গোল থেকে গোল, গাল থেকে সোডার বোতল পর্যন্ত গড়াতে পারে। বলকে মাটিতে গড়াতে হয় জানি, কিন্তু বোতলও গড়ায় সেটা যে কোন ধরনের খেলা, পাঠাকরা অনুমান করে নিতে পারেন। ঠেলার নাম বাবাজী কথাটা ভুল, ওটা হবে খেলার নাম বাবাজী, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

ভাবুন ঃ একটি বর্ষাভরা বিকেল। যে বিকেলে আপনি আপনার সঙ্গিনীকে নিয়ে কোন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত চিত্রগৃহে বসে ছবি উপভোগ করতে পারেন (আপনার শরীরের শীততাপ নিয়ন্ত্রণ অবিশ্যি নির্ভর করবে সঙ্গিনীর রূপের ওপর) বা ঘরে বৌকে নিয়ে স্মৃতিমন্থন করতে পারেন, পুরোন কোন রোমাঞ্চিত সন্ধ্যার বা টিনের চালে বৃষ্টির নূপুর শুনতে পারেন আলসেমীর বালিসে মাথা রেখে বা নেহাতই ইলিস মাছ ভাজা বা গরম লংকামুড়ির স্বপ্ন দেখতে পারেন। তার বদলে কর্দমাক্ত একটি চর্মগোলকের ওপর পদাঘাতের ফলাফল লক্ষ্য করে চেঁচানোর মতো হরিব্‌ল আর কি হতে পারে বলুন?

এসব যুক্তিই আমি আমার বন্ধু ভানাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু ও আমাকে ছোট্ট একটা জবাব দিল। ও বললে,—তুই একটা ফলান্‌ক্রু। ভানার নতুন এই অদ্ভুত শব্দ 'ফলান্‌ক্রুর' অর্থ হচ্ছে গবেট। শব্দচয়নে ভানা অদ্বিতীয়। ওর এক ভাইঝি খুব কাঁদত, ভানা ওকে ডাকাত 'চেরাপুঞ্জী' বলে। রাস্তায় সবচেয়ে ধারালো চেহারার মেয়ে গেলে ও বলত 'টিকাচিকা বুম'। গ্রাম্য আটপৌরে কোন মেয়ে গেলে ও বলত 'কটেজ ইণ্ডাস্ট্রী'।

ভানার কথায় স্মার্টনেসও থাকত। একবার কতগুলো ছেলে চাঁদা চাইতে এসেছিল পূজোর জন্য, ভানা বলল তাকে মাপ করতে হবে, চাঁদা দিতে পারবে না। ছেলেরা ধরল,—না দিলে চলবে না। পাশের বাড়ির দেবেনবাবু পাঁচ টাকা দিয়েছেন।

গম্ভীর গলায় বলল ভানা—উনি তো দেবেনই ওঁর নামই যে দেবেনবাবু। কিন্তু আমাকে মাপ করতে হবে।

যাক, এ হেন ভানা আমার লেকচারের বদলে একটি শব্দের আণবিক বোমায় আমাকে হিরোসিমা করে দিল। শব্দ আগেই বলেছি—ফলান্‌ক্রু। তারপর আমার ম্যানিব্যাগ থেকে দু'টাকা নিল কেননা আজ শিল্ডের খেলা আছে। ধার। বুকপকেট থেকে ট্রামের মান্থলীও তুলে নিল। ভানার দল যদি জেতে তবেই সাধারণতঃ ধার ফেরত পেতাম নইলে ধার ফেরত চাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভানার চোখ দু'টো দু'নলা বন্দুকের মতো আমার চোখের ওপর নেমে আসত, বলত লজ্জা করে না ধার ফেরত চাইতে? মোহনবাগান হেরে গেল আর তুই টাকা ফেরত চাইছিস?

বললাম, লজ্জা করবে কেন?

ও বলল, করবে কি করে? লজ্জা থাকলে তো। ইস্‌, যদি রেফারীটাকে হাতের কাছে পেতাম তবে মেরে একেবারে মডেল চেঞ্জ করে দিতাম।—আমার দিকে তাকালো ভানা তারপর উনোর সভায় ভেটো প্রয়োগের ভাষায় বলল,—ও বেটাও তোরই মতো ফলান্‌ক্রু।

এরপর টাকা চাইবার সাহস হল না আমার, কেননা ভানার পেশীবহুল্‌ চেহারা দেখে বুঝতে পারছিলাম দরকার হলে আমার মডেলটিও ও ভালো ভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারে। বলতে কি, সাতাশ বছরের পুরোন নিজের এই মডেলটিকে আমি বেশ ভালোবাসি, ভানার হাতে মডেলটিকে ওভারহল করাবার ইচ্ছে মোটেই নেই আমার।

এবার বলি আমার দ্বিতীয় বন্ধুর কথা, যার নাম সুধাময়। অবিশ্যি এটা ওর আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। আসলনাম বংশীচরণ বা চিন্তাহরণ এরকম একটা কিছু হবে। সুধাময় একজন কথাশিল্পী। আর আমি কথাকানা। কথা খুঁজলেই যাঁরা কথা খুঁজে পান সেই

সব কথাসরিৎসাগরদের সঙ্গে আমার আসমান জমিন ফারাক! কথার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে জান সরবত করে ফেলেছি কিন্তু কথাবাঈজীর আঁচলও ছুঁতে পারিনি। মনে আছে, বয়ঃসন্ধিতে একটি মেয়েকে প্রপোজ করব ভেবে পুরো একবছর আমি তার বাড়ির রঙ, শাড়ির ঢঙ, হাতের রান্না, ছাদের কার্নিস, ছোটভাইয়ের অংক ইত্যাকার যাবতীয় বিষয়ে দু'চার কথা বলতে পেরেছি, কিন্তু হতোস্মি, কাজের কথাটাই বলা হয়নি কোন দিন। শেষ পর্যন্ত তার বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠিটা আমাকে লিখতে বলেছিল সে, আর বলেছিল ভাইফোঁটার দিন আসতে। ভাবুন কি ট্র্যাজেডী! কিন্তু কি করব, কথা আমার মুখে আসে না, কলমে তো নয়ই। অথচ এই সুধাময়ের কি ভাষার বহর! পাকিস্তান থেকে আসবার সময়ও অত লটবহর ছিল না আমার সঙ্গে। সুধাময়ের লেখা একখানা গান তো বাজারে এখন দারুণ হিট। কয়েকটি মেয়ে গানটি শুনে এত মুগ্ধ যে সুধাময়ের জন্য ওদের হৃদয়ের সীমান্তে খাইবার পাশ খুলে বসে আছে। সুধাময়কে পেলেই তাকে কাঁচা খাইবার ইচ্ছা ওদের। একটি গানের ছাড়পত্র নিয়ে সীমান্ত অতিক্রমণ এ যুগে প্রায় অসম্ভবই। কিন্তু সুধাময় সুধাময়ই। ওর সঙ্গে কার তুলনা! ওর হিট গানের প্রথম চারলাইন এখনো আমার কানে লেগে আছে।

...'তোমার হৃদয় সবুজ বাতাস, চাঁদের
চোখে জল, শুধু জল গো
পলাশ ফুল গন্ধ ছড়ায়, তুমি যেন এক
মরুভুমি ছল ছল গো।'.....

আহা কি ভাষা! পড়েই যুক্তকরে রবীন্দ্রনাথের সুর বলতে ইচ্ছে করে—'তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।'—সুধাময় সবাইকার মতে প্রতিভাধর বঙ্গসন্তান। আমি এ সমাজের আউটকাস্ট। প্রতিভাকে আমি জানি মেয়েদের নাম হিসেবে আর ধর পদবী হিসেবে। ও দুটো যোগ করলে যে এমন মহিষাসুরের উৎপত্তি হয় তা জানতাম না।

এ হেন প্রতিভাধর সুধাময় আমার জীবনকে কিন্তু বিষময় করে রেখেছে। ও হচ্ছে মেয়েধরা। মেয়েদের ধরতে হত না, মেয়েরাই ওর কাছে ধরা দিয়ে বসে থাকত। ও ছিল দুর্দান্ত প্রেমিক। একটি গ্লাসে যদি সুধাময়কে ঢালা যায় আর অন্য একটি গ্লাসে যদি ঢালা যায় রোমিও,শাজাহান, মজনু, রঞ্ঝা, মহীওয়াল ও দেবদাসকে তবে এক চুমুকেই টের পাবেন সুধাময় প্রেমিক হিসেবে ওঁদের সম্মিলিত ককটেলের চেয়ে অনেক বেশী ঝাঁঝালো।

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। সুধাময় ডাইরী খুলে আমাকে দেখিয়েছে যে ওর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে তিনটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে, ও চারজন স্বামী ছেড়ে পালাতে গিয়ে জেলে আসামী হয়ে রয়েছে। একজন ওকে পাবার জন্যে এক বেলা খেয়ে রোগা হবার চেষ্টা করছে, দু'জন পাঁচবেলা খেয়ে মোটা হবার চেষ্টা করেছে। একটি বাঙ্গালী মেয়ে ইংরেজী নাচ শিখতে ব্যস্ত আর দুটি এ্যাংলো মেয়ে বাংলা বর্ণপরিচয় শেখা শেষ করে এনেছে। বুঝুন কাণ্ডখানা!

এই সুধাময়কে একদিন নিজের দুর্বলতার কথা বললাম। খুবই ভুল করেছিলাম, কিন্তু সেটা পরে বুঝেছি। বললাম, সুধা, আমি, আমি হৃদয় হারিয়েছি।

সুধাময় ঃ কোথায় আবার হারালি? এত কেয়ারলেস স্বভাব তোর জানিস যখন, তখন এত দামী জিনিস সঙ্গে নিয়ে ঘোরার কোন মানে হয়? পুলিসে খবর দিয়েছিস?

বললাম ঃ ইয়ার্কী নয় সুধা, সত্যি, আই অ্যাম ইন লাভ।

সুধাময় ঃ আই সি, মেয়েটি কে?

বললাম ঃ পাশের বাড়িতে নতুন এসেছে দিল্লী থকে। পাঞ্জাবী।

সুধাময় ঃ এ অসম্ভব, বৃথা চেষ্টা বন্ধু। কিপলিং বলে গেছেন ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট ক্যান নেভার মিট। পাঞ্জাব ইস্ট আর বাংলা ওয়েস্টে। শুধু ইস্ট ওয়েস্ট নয়, বলা যায় পাঞ্জাব আর বাংলা ভারতের দুই সীমান্ত।

আমি বললাম, কি বলছিস বোকার মতো? ভূগোলও জানিস না?

মৃদু হাসল সুধাময়, এ তোর জলস্থলের ভূগোল নয়, রোমান্সের ভূগোল—এ ভূগোলে পাঞ্জাব আর বাংলা দুই সীমান্ত। প্রমাণ—রবীন্দ্রনাথ।

অবাক হয়ে বললাম, রবীন্দ্রনাথ?

হ্যাঁ, জবাব দিল সুধাময়, জাতীয় সঙ্গীত নিশ্চয়ই পড়েছিস। তাতে নেই 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'? আমার বোকাসোকা চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল,—দেখছিস না, পাঞ্জাব আর বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ দুই সীমান্তে রেখেছেন। এর অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস? এর অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা হচ্ছে পাঞ্জাবী আর বাঙালী দূরে দূরে থাকাই ভালো।

তোর মুণ্ডু, বললাম আমি, আমি জানকীকে ভালবাসি, ওকে আমি বিয়ে করব, এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। আমার প্রতিজ্ঞাকঠিন কণ্ঠস্বর শুনে একমিনিট পিটপিট করে তাকালো সুধাময়। তারপর যথারীতি সিগ্রেট জ্বালিয়ে আমার দেশলাই পকেটস্থ করে বলল, মেয়েটার কি মত?

ঃ কি করে জানব? জবাব দিলাম।

ঃ সে কি, আলাপ নেই তোর?

ঃ উহুঁ!

ঃ তবে?

বললাম, আলাপের চেষ্টাই তো করছি। ভেবে পাচ্ছি না কি ভাবে এগোব। তিনটে তিক্রম ভেবেছি। এক নম্বর ফটো তোলা। ফটো তোলায় সাধারণতঃ মেয়েরা উৎসাহী হয়। দুই নম্বর, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। তিন নম্বর, হাত দেখতে পারার ভান করা। এতেও মেয়ারা করায়ত্ব হয়। পানিনিপীড়ণ থেকে পানিগ্রহণ দাঁড়ায় আর কি। ভাবছি শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করব।

বেশ, উঠে দাঁড়ালো সুধাময়, তাই কর, হাত দেখতে গিয়ে হাতই দেখিস, বুড়ো আঙুল দেখে ফিরে আসিস না যেন।

গুডলাক বয়। বলে হাওয়া হল সুধাময়। সেইসঙ্গে হাওয়া হল পুরো এক প্যাকেট গোল্ডফ্রেক আর আমার সখের চিরুনীখানা। তারপর? খুবই দুঃখের ঘটনা। জানকীর সঙ্গে আলাপ করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। কেননা জানকী নিজে চমৎকার ছবি তোলে, ওর ভাইয়ের শহরত্যাগ ও হোস্টেলগমন আর ওর বাবা জাঁদরেল পামিস্ট। হতাশ হয়ে যখন নতুন রাস্তা ভাবছিলাম, তখন জানকীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ করিয়ে দিল সুধাময়। হ্যাঁ, স্বয়ং সুধাময়!

একা ভল্‌গা রেস্টুরেন্টে বসে চা খাচ্ছিলাম। সুধাময় এল, বগলে জানকী। দেখে বিষম খেলাম। রাগে পিত্তি জ্বলতে আরম্ভ করল। জানকীকে নিয়ে যে কটা স্বপ্ন দেখেছিলাম সবকটা আমেরিকান রকেটের মতো বুকের মহাকাশে সশব্দে বিস্ফারিত হয়ে গেল। সুধাময় কিন্তু নির্বিকার! আর চোখেমুখে হাসি জ্বলছিল জানকীর। শালোয়ার কামিজে অপূর্ব দেখাচ্ছিল জানকীকে, যেন টিকাচিকাবুম। সুধাময় বলল, আরে তুই ওখানে?

আমি কঠিন চোখে ওর দিকে তাকালাম। কিন্তু সুধাময় তখন জানকীর দিকে তাকিয়ে মোমমসৃণ সুধাতরল কণ্ঠে বললো,—ওগো মোর জানকী, এ কে তুমি জান কি?

উঃ, হারামজাদার আস্পর্ধা দেখুন। কাব্যি করা হচ্ছে আবার! জানকী

কোকিল-কালো চোখ তুলে বলল, না। আশ্চর্য, মেয়েটা অল্পসল্প বাংলাও বোঝে দেখছি। সবই সুধাময়ের মোহজালের ফলাফল। সুধাময় বলল, এ হচ্ছে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু (মনে মনে ভাবছিলাম, ইস্ এই মুহূর্তে আমি যদি ওর বন্ধু না হয়ে একটা বন্দুক হতাম!) বচন ফকির। আর বচনে, ইনি হচ্ছেন আমার বান্ধবী জানকী শরিন। বলবার ইচ্ছে ছিল, এই জানকী শরিনকে দয়া করে সরিয়ে নেন হুঁজুর, আমি এসব সইতে পারছি না। কিন্তু তার বদলে নমস্কার করলাম, বললাম, বসুন। এও বললাম, আপনার কথা অনেক শুনেছি সুধাময়ের কাছে। জানকী লজ্জা লজ্জা চোখে তাকালো সুধাময়ের দিকে। দু'চোখে কোমল দুটি মোমবাতি জ্বলছে যেন। আমিও তাকালাম সুধাময়ের দিকে, আমার চোখও জ্বলে উঠল, মোমবাতি নয়, দুটি ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের বয়লার। ওতে সুধাময়ের ক্ষতি হল না কিছু। মনের আনন্দে স্যাণ্ডউইচ আর হট্‌ডগ্‌স্ খাচ্ছিল ও আর জানকীকে জোর করছিল আরো বেশী খাবার জন্যে। ঠিক যখন সুধাময় দেখতে পেল বিল নিয়ে বেয়ারা আসছে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ঘড়ি দেখে বলল,—গল্প করতে করতে ভুলেই গিয়েছিলাম সাড়ে ছ'টায় সিনেমার টিকিট কাটা রয়েছে, চলো জানকী। আচ্ছা বচনে, থ্যাংকস ফর দা স্ন্যাকস। চলে গেল সুধাময়, চলে গেল জানকী। পেছনে পড়ে রইল শুধু ওদের বিল আর আমি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে টাকা দিলাম বয়কে আর ভগ্নকণ্ঠে আওড়ালাম, আমারই বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।........

এরপর বেশ কয়েকদিন সুধাময়ের বিরুদ্ধে কেস করবার কথা ভেবেছি।

'ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ার' আওতায় কেসটা দাঁড় করাবার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ভেবে দেখলাম কোন লাভ নেই। সুধাময়ও কেস লড়বে। আর সুধাময়কে আমি যতদূর জানি তাতে এও নিশ্চিত আমার বিরুদ্ধে কেস লড়বার জন্য সুধাময়কে টাকাও ধার করতে হবে। সে টাকা আমি ছাড়া আর কে দেবে? কেননা সুধাময়ের মটো হচ্ছে, এ ফ্রেণ্ড ইন নিড্ ইজ এ ফ্রেণ্ড ইনডিড। মোদ্দা কথা, কেস করা মানে পক্ষে ও বিপক্ষে আমাকেই টাকা খরচ করতে হবে। সুতরাং আমার অবস্থা দেবদাস। একজন বন্ধুকে বার্ট লাংকাস্টার একটা কথা বলেছিলেন অপর একজন লোকের বন্ধুত্ব সম্পর্কে—ইফ ইউ গেট হিম অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড ইউ ডোণ্ট নিড এনি এনিমি। সুধাময়কে বন্ধু হিসেবে পাওয়া মানেও তাই, আপনার আর শত্রুর প্রয়োজনই হবে না কোনদিন।

এবার বলি আমার বন্ধু কুশলের কথা। কুশল হচ্ছে সবজান্তা। দুনিয়ার এমন বস্তু নেই যে ও জানে না। হলিউডের কোন অভিনেত্রীর মাপ কি ও মুহূর্তে বলে দেবে। ওর কাছ থেকেই জেনেছি হলিউডের অনিতা একবার্গের বুক ৪১ ইঞ্চি, জেইন ম্যানসফিল্ডের ৪০ ইঞ্চি ও সোফিয়া লরেনের ৩৯ ইঞ্চি। হলিউডের আনহোলি খবর থেকে শুরু করে স্পুটনিকের কুকুরটার গায়ের রঙ, ইটালিয়ান স্পোর্টকার ফেরারীর হর্সপাওয়ার, ফ্রান্সের ফলি বার্জেয়েরের নাইট-শোর নায়িকার বয়েস, জার্মানীর জুভেনাইল ক্রাইমের সংখ্যা ও জাপানের হারি-কিরির ধর্মীয় যুক্তি সব ওর মুখস্থ। ইদানিং ওর ঝোঁক মনোবিশ্লেষণের ওপর। যা আপনি করুন না কেন ও তার আশ্চর্য বিশ্লেষণ করবে। শুনে অবিশ্যি আপনার জ্বর আসতে পারে। একবার ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে নাক চুলকোচ্ছিলাম আর যাবে কোথায়? শুরু হয়ে গেল কুশলবার্তা। গম্ভীর কণ্ঠে শুরু করল ও, কবে থেকে নাক ওভাবে চুলকোচ্ছিস রে?

অ্যাঁ, চমকে হাত সরিয়ে বললাম, নাক চুলকোচ্ছিলাম বুঝি। এমনিই চুলকোচ্ছিলাম।

হুঃ, বলল কুশল, এমনি মানে?

ঃ এমনি, মানে নাকে চুলকুনি হচ্ছিল, তাই।

মোটেই না,—কুশল কুশলী মনস্তত্ত্ববিদের মতো শুরু করল,—নাক চুলকোনোর

পেছনে রয়েছে তোমার অবচেতন মন আর তোমার অবচেতনের পেছনে রয়েছে সেক্স। তারপর ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, য়ুঙ, কিনসে থেকে অনর্গল বকে-ঝকে ও আমাকে যা বোঝাল তা কহতব্য নয়।

জলের মতো বুঝতে পারলাম আমার নাকের মতো ন্যক্কারজনক বস্তু পৃথিবীতে আর দু'টি নেই।

এই মনস্তত্ত্ববিদ মহাশয় আমার একটা রোমাঞ্চকর রেমান্সকে নষ্ট করে দিয়েছে। চমৎকার মেয়ে ছিল ইরা। যেমন রূপ তেমন রূপো। ভাবসাব জমিয়েছিলাম কিন্তু মনের আমদানী রপ্তানী তখনো বাকী ছিল। সে সময় দেখা দিল কুশল আর সঙ্গে সঙ্গে চালু হল বাক্যশলাকা।

কুশল ঃ ইমপ্রেস করেছিস ইরাকে ?

আমি ঃ বুঝতে পারছি না।

কুশল ঃ এ ধরনের মেয়েকে ইমপ্রেস করা যায় সাইকোলজিক্যালি। বুদ্ধিমানের মতো এগোলে তোর জয় অনিবার্য। আমি তোকে হেল্প করতে পারি।

আমি ঃ বল না ভাই কি করে এগোই ?

কুশল ঃ দেখ আমি ইরাকে বেশ স্টাডি করেছি। ইরার রূপ আছে, বাপের টাকা আছে, ভালো গান গায়, ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন ভালো। একটা জিনিষ ছাড়া সব আছে ইরার, বলতো কি নেই ?

আমি উজ্জ্বল মুখে বললাম, স্বামী।

দূর বোকা, বলল কুশল, স্বামী তো বাইরের জিনিস, আমি ওর ব্যক্তিগত বস্তু মানে গুণাবলীর একটি ত্রুটির উল্লেখ করেছি। সেটা হচ্ছে বিদ্যা। ইরা পড়াশুনো বিশেষ করেনি।

করেনি বেশ করেছে, আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, তাতে তোমার কি ? দুর্বলকে ডিফেণ্ড করা আমি আমার পুরুযোচিত কর্তব্য মনে করলাম। ইরার ওপর এই অহেতুক আক্রমণ রীতিমত অন্যায়।

চট্‌ছিস কেন, কুশল মৃদু হাসল, এই যে প্রেমিকার সর্টকামিংস শুনে চটে যাওয়া, এটা হচ্ছে এক ধরনের কমপ্লেক্স। কিন্‌সে বলেন—

বললাম, কিন্‌সের কথা ছাড়ো, বলো ইরাকে কি করে পাওয়া যায়।

ঃ হ্যাঁ যা বলছিলাম, ইরার যেহেতু বিদ্যা কম সেজন্য ওকে আকর্ষণ করতে পারবে বিদ্যা। অর্থাৎ ইনটেলেকচুয়াল এ্যাপ্রোচ হল বেস্ট। তুই যদি বেশ উঁচু ধরনের কথাবার্তা বলতে পারিস দেখবি ইরার মুখ জ্ঞান পিপাসায় তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠবে। এই জ্ঞানদান করে করেই দেখবি ইরা তোর জন্যে অজ্ঞান না হয়ে যাবে না। মনে রাখিস ক্লুটো,—ইনটেলেকচুয়াল এ্যাপ্রোচ।

রেজাল্ট শুনুন।

বিকেলবেলা ইরার বাড়িতে গিয়ে হাজির। ড্রইংরুমে ইরা বসেছিল আর ছিল ছোট ভাই ও ছোট বোন। আমি আমার দিলীপকুমারী তৈলহীন চুলে আর দু'দিনের গজানো দাড়িতে (ইনটেলেকচুয়াল চেহারা করার জন্য) হাত বুলিয়ে বললাম, ইরা, কোনদিন ভেবে দেখেছ যে তোমার ঐ পিয়ানোর পাশে যদি একটা বাঁদর বেঁধে রাখা যায়, যুগ যুগ ধরে যদি সে বাজিয়ে চলে তবে একসময় না একসময় সে বেটোফেনের নাইন্‌থ সিম্ফনি বাজিয়ে ফেলবে। ল অফ চান্স সত্যি বড় অদ্ভুত সায়েন্স, না ইরা ? এ বিজ্ঞান অনুযায়ী অনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে-কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ইরা শান্ত চোখে আমার দিকে তাকালো। ছোট ভাই গাবুল আর ছোট বোন মিছরিও তাকালো একবার। তারপর মিছরি দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, জানিস দিদি, আজ

রেখাকে না টিচার সারাদিন নিলডাউন করে রেখেছে।

দিদি, বলল গাবলু, কাল যদি এলভিস্ প্রিসলের নতুন রেকর্ড না কিনে দাও আমি তোমার সেতার ভেঙে দেবো।

ইরা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কাল তোমরা দু'জনেই মাথা শ্যাম্পু করবে, দু'জনের মাথাই বালিতে ভর্তি।

ধৈর্য আমার ভাঙবার উপক্রম। টেবিলে চড় মেরে বললাম, আমি যে একটা কথা বলছি কারুর কি সেটা কানে গেছে?

তুমি আবার কি বললে? ইরা অজন্তার ফ্রেস্কোর মতো নিমীলিত চোখে বলল।

আমি বর্তমান সায়েন্সের এক অভূতপূর্ব সমস্যার কথা বলছি।—বললাম উষ্ণকণ্ঠে।

বারে, তুমি তো একটা বাঁদরের কথা বলছিলে।

বাঁদরের কথা মোটেই নয়, চেঁচিয়ে বললাম, বলছিলাম ল অফ চান্সের কথা, সায়েন্সের কথা।

ঃ গোড়া থেকেই যখন চেঁচাতে শুরু করেছো তখন এ আলোচনা না হয় বন্ধ করা যাক।

ঃ বন্ধ করা যাবে মানে? আলোচনা তো শুরুই হয়নি এখনো।

মিছরি বলল, দিদি আমি খেলতে যাই।

না, ধমকে উঠলাম, বোস, শোন আমার আলোচনা।

ইরা হাই তুলল, তারপর বলল, বল বাপু, কি বলছিলে বাদরের গল্প।

এমতাবস্থায় যে-কোন ভদ্রলোক যা করত আমিও তাই করলাম, সোজা উঠে চলে এলাম।

পরদিন নীল খামের চিঠি এল ইরার। লিখেছে, মাথার কোন ভালো ডাক্তার দেখাও, যদি রাঁচীর ব্যবস্থা হয় জানিও। খরচের ব্যবস্থা আমি করে দেবো, সেজন্য মোটেই ভেবো না।

সবশেষে আমার মেয়ে বন্ধু আল্পনার কথা বলি। মেয়ে বন্ধু মানে মেয়ে বন্ধুই। অর্থাৎ ফ্রেণ্ড, ফিয়াঁসে নয়। আল্পনা হচ্ছে শতকরা নব্বুই জন বাঙ্গালী মেয়ের প্রতীক। ভানার ভাষায়, কটেজ ইণ্ডাস্ট্রী। দেখতে অসাধারণ নয়, অর্থ ও বিদ্যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীসঙ্গত অর্থাৎ বাবার বেতন সাতশ' আর পাশ করেছে আই. এ। কথাবার্তার ধরণ হল—ভারি অসভ্য, একশোবার বলব, ইস্ বাবুর রাগ দেখ না, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, আহা, নিজের যা ছিরি, ওমা কি মিথ্যুক, আপ্ন গড্ বলছি, ওকথা বলতে নেই, যেতে নেই এসো, বারে, প্রণাম করব না কেন তুমি আমার বয়সে বড় না বুঝি, জানো কালকে একটা স্বপ্ন দেখেছি, সিগ্রেট খাওয়া দু'চক্ষে দেখতে পারি না, সোনা ছুঁয়ে বল মদ খাওনি কোনদিন, কোনদিন যাবে না—। এসব হল আল্পনার অ্যাটর‍্যাণ্ডাম কথাবার্তার সাগর থেকে সিঞ্চিত ঝিনুক। এই কথাগুলো থেকেই আঁচ করে নিতে পারেন আল্পনাকে।

ওর একমাত্র দোষ সহজে রেগে যাওয়া। আর এই দোষটাই আমার সব চেয়ে প্রিয়। নিত্য নতুন প্রক্রিয়া ভেবে যাই ওকে রাগাবার জন্য। সম্প্রতি কিভাবে রাগিয়ে এসেছি শোনাচ্ছি। দিন দশেক ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। ঘরে ঢুকতেই খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ও। চোখেমুখে কথা বলতে চাইছে যেন। (বলা ভালো, আল্পনা একটু বেশি কথা বলে।) সশব্দে হাততালি বাজিয়ে বলে উঠল, আরে তুমি, জানতাম আজ তুমি আসবে—

আমি বললাম, আরে তুমি, জানতাম আজ তুমি আসবে।

আল্পনা ঃ আচ্ছা, এসেই ইয়ার্কি শুরু। অসভ্য কোথাকার।

আমি ঃ আচ্ছা, এসেই ইয়ার্কি শুরু। অসভ্য কোথাকার।

আল্পনা ঃ ফাজলামো নয়, অনেক কথা বলবার আছে তোমাকে, বোসো।
আমি ঃ ফাজলামো নয়, অনেক কথা বলবার আছে তোমাকে বোসো।
আল্পনা ঃ আজকে আমাকে রাগাতে পারবে না। .
আমি ঃ আজকে আমাকে রাগাতে পারবে না।
আল্পনা ঃ প্লিজ শোন না, জরুরী কথা।
আমি ঃ প্লিজ শোন না, জরুরী কথা।
আল্পনা (রাগ শুরু) ঃ চ্যাংড়ামী করতেই এসেছো ?
আমি ঃ চ্যাংড়ামী করতেই এসেছো ?
আল্পনা (রেগেমেগে) ঃ সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে বচনদা।
আমি ঃ সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে বচনদা।
আল্পনা ঃ ভালো হবে না বলছি।
আমি ঃ ভালো হবে না বলছি।
আল্পনা (ভেবে নিয়ে) ঃ আমি একটা ছোটলোক পাজী শুয়োর গাধা।
আমি ঃ (পাল্টা করে বললাম) ঃ তুমি একটা ছোটলোক পাজী শুয়োর গাধা।
এবার নিজের চালাকী এভাবে মিসফায়ার হওয়ায় ও চটে আগুন।
কঠিন কণ্ঠে বলল, শেষবার জিজ্ঞেস করছি, ও বদমাইসী বন্ধ করবে কিনা ?
আমি ঃ শেষবার জিজ্ঞেস করছি ও বদমাইসী বন্ধ করবে কিনা ?
আল্পনা ঃ উঃ, কি মোটা চামড়া রে।
আমি ঃ উঃ, কি মোটা চামড়া রে।
আল্পনা ঃ (গলায় পুরো জোর লাগিয়ে) বচনদা।
আমি ঃ (ততোধিক উচ্চকণ্ঠে) বচনদা।
আল্পনা (দাঁড়িয়ে ওঠে) ঃ বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।
আমি (দাঁড়িয়ে ওঠে) ঃ বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

আল্পনার আগুন-চোখে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। সারা শরীরে দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে উঠছে আর নামছে, কপালে, গলায় ঘামের মুক্তো। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। তারপর ধুপ করে সোফায় বসে পড়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদতে আরম্ভ করলে আল্পনা। সশব্দে ঃ সে কি কান্না, এমন হাউ হাউ করে কাঁদতে কম মেয়েকেই দেখেছি।

বলা বাহুল্য, এরপর প্রচুর সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে ওকে। অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফুটেছে ওর। তারপর শুরু করল ওর কথামালা। বক বক বক করেই চলল। বারোটার পর বাস পাব না বলে ছুটি নিয়ে আসতে পেরেছি নইলে গল্পের ঠেলায় ও আমাকেও কাঁদিয়ে ছাড়ত।

এই হল আল্পনার চরিত্র। ওর ওপর এ যাবত আমি প্রায় বাইশ রকম রাগাবার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে দেখেছি ও সফলকাম হয়েছি। ভবিষ্যতে আরো নতুন কয়টি প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা চলছে। ঈশ্বরের দয়ায় এ ব্যাপারে আমি ভানা, সুধাময় বা কুশল কারুর সাহায্য নিইনি, নেবও না। আগামী তিনটি নতুন প্রক্রিয়ার পর রাগানো শিল্পের রজতজয়ন্তী করব আমি। সে উৎসবে আপনাদের নেমন্তন্ন রইলো। এলে নিজের নিজের রাগ নিজে নিজে নিয়ে আসবেন। কেননা আমি শুধু আল্পনাকেই রাগাতে ভালবাসি, সবাইকে নয়। এতে আপনারা রাগই করুন আর যাই করুন। আমি নাচার।

॥ পদবী প্রসঙ্গে ॥

ব্যাপারটা এ্যাদ্দুর গড়াবে ভাবতে পারিনি।

কফি-হাউসের টেবিলে ঝড় উঠল। প্রণব সেন, অজিত গুপ্ত। অজিত গুপ্ত আর প্রণব সেন। সেন আর গুপ্তের লড়াই।

ঃ রাখ, রাখ, গুপ্তের আবার তিড়িং-তিড়িং, তোদের দৌড় তো পেন্সিলের এফ. এন, গুপ্ত পর্যন্ত।

গুপ্তও এবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেনেদের কথা বলিস নে, প্রবাদের গৌরী সেন ছাড়া আর সেন কোথায় ?

তারপর প্রণব নির্বিবাদে লক্ষ্মণ সেন, ভীম সেন, সান ইয়াৎ সেন থেকে কিম্-ইর-সেন, সুচিত্রা সেন থেকে নোট লিখিয়ে এম, সেন পর্যন্ত সবাইকে আসরে নামাল আর অজিত চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্র গুপ্ত থেকে নীহার গুপ্ত পর্যন্ত কাউকে হেনস্থা করতে বাদ রাখলো না। আমি আর মঞ্জরী দাম দু-জনেই চুপ করে রইলাম। কারণ আমি ভৌমিক, অনেক খুঁজে-পেতেও গোপাল ভৌমিক আর ননী ভৌমিক ছাড়া কাউকে খুঁজে পেলাম না। (ঢাকা রেডিও-তে ঝুনু ভৌমিক বলে একটি মেয়ে ভালো গান গাইত, আর একদিন কাগজে অপলা ভৌমিক বলে একটা নাচিয়ে মেয়ের নাম দেখেছিলাম, সেই থেকেই ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা শুরু করেছিলাম যাতে এরা শিগ্‌গিরই বেশ নামী হয়ে ওঠেন। কিন্তু কাকস্য পরবেদনা!) এ আলোচনায় যোগ দিলে প্রথম ঘা'তেই আমি কুপোকাৎ হবো, তাই পদবীর দুঃখে বিমর্ষ হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি ? আর মঞ্জরী দাম! বেচারা। ও জানে, যতোই চেঁচাক কেউ ওর কথার দাম দেবে না। কোন মেয়ের পদবী যদি দাম হয়, তবে দু'চার পেগ্ রাম পেটে পড়লেও যে কোন রামচন্দর একেবারে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না, নির্জন পাম প্লেসের মতো calm হ'য়ে সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে সেই দামিনীর দিকে তাকিয়ে থাকবে, প্যারিসে নতুন-আসা কোন আগন্তুকের ইফেল টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো। তাই মনের দুঃখ মনে চেপে আমি আর মঞ্জরী দাম নির্বিবাদে চিপস্ আর নাট্‌স্ এর সদ্ব্যবহারে তৎপর হ'লাম।

তবেই দেখুন, পদবী একটা হেলাফেলা করবার জিনিস নয় মোটেই। ধরুন আপনি রায়, নামজাদা কোন রায় না থাকায় হয়তো হায় হায় করতে হচ্ছে আপনাকে, কিন্তু দুঃখু করবার তেমন কিছু নেই আপনার। অমিত রায়কে সাহেবসুবোরা আদর করে ডাকত অমিট রে। চমৎকার শোনায় না ? কেমন কেমন একটা ইংরেজী সাহেব-সাহেব কথা। কিন্তু ভাবুন কোন ভজহরি গড়াই-এর কথা। সাহেবরা গড়াইকে বড় জোর গেড়ে বলে ডাকতে পারে, সাদা কথায় গ্যাঁড়া! যত্তসব গ্যাঁড়াকল!

আর আপনি যদি বন্দ্যোপাধ্যায় হন, তবে আপনার ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল। এক্ষুনি

কলম নিয়ে বসে যান, কলম ধরতে না ধরতেই দেখবেন দু'চারটে হাঁসুলী বাঁক আপনার কলম থেকে তরতর বেরিয়ে আসছে ফিল্মস্টারদের ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার বুদ্ধির মতো। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সব সাহিত্যের পিলারগুলোই বাঁড়ুয্যে। লিখতে শুরু করুন আর কিছু না হ'তে পারেন অন্ততঃ আহা মরি বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারবেন নিশ্চয়ই।

আমার সঙ্গে রতনকুমার সিংহ বলে একটা ছেলে পড়ত। ও আমাকে একদিন দুঃখু করে জানিয়েছিল লর্ড সিংহ ছাড়া সে আর উল্লেখযোগ্য সিংহ খুঁজে পাচ্ছে না। ওর কাছে চিড়িয়াখানার কথা উল্লেখ করব ভেবেও করলাম না। কারণ আমাদের চিড়িয়াখানার সিংহগুলোর যা হাল, তাদের কাউকেই উল্লেখযোগ্য বলে অভিহিত করা যায় না। রতনের চেয়ে বেশি মনোকষ্টে ভুগত দেবেশ ধাড়া। তাকে দেখলে তার পদবীর উল্টোটার কথাই মনে পড়ত আমার, যেমন বিরহিনী রাধা। ও বেচারা আদালতের নথিপত্র ছাড়া কোথাও খুঁজে পায়নি নিজেকে। একবার কি কারণে ৬০২ না ৬০৫ কোন এক ধারায় পুলিস ওকে গ্রেপ্তার করে। ধারায় ধারায় ধরপাকড় আর কি। কতো মজার পদবীও হয়। ধরুন আপনি দালাল। না না, গালাগালী দিচ্ছি না। আপনার পদবীই দালাল, হয়ত আপনি শুভেন্দুকুমার দালাল। কিন্তু আপনি সাহিত্য করতে আসুন, কেউ আপনার লেখা পড়তে চাইবে না, সাহিত্য-ক্ষেত্রে আপনার ফোপর-দালালী সহ্য করবে না কেউ। (যেমন লাভা হুই-এর লেখা পড়ে এমন দুর্ভাগা পাঠক বড় একটা দেখা যায় না।) আপনার কি দুঃখ বলুন তো? আপনি শুধু দালাল বলে এভাবে লাঞ্ছিত হ'লেন জনসাধারণের কাছে। তখন কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারশিপের জন্য বড়জোর চেষ্টা করতে পারেন আপনি, আর কিই বা করবেন? কিন্তু যদি আপনি মিত্র হ'তেন, যদি চৌধুরী হ'তেন, যদি বসু হ'তেন, যদি মুখুয্যে হ'তেন, তবে?

প্রেমেন্দ্র মিত্র না হ'তে পারেন আপনি অন্ততঃ বিগলিত মিত্র হ'তে পারতেন তো? প্রমথ চৌধুরী না হতে পারেন প্রমত্ত চৌধুরী হ'তে বাধা নেই নিশ্চয়ই। বুদ্ধদেব বসুর প্রতিভা আয়ত্বে না আনতে পারলেও প্রবুদ্ধদেব বসুর কলমের জোর পেতে পারতেন হয়তো, কিন্তু মিছে ভেবে আর লাভ নেই, আপনি নেহাতই দালাল!......

কিছুদিন আগে আমি একটা লেখা পেয়েছিলাম হাওড়া থেকে। একটা কবিতা, অবিশ্যি গদ্য-কবিতা। কবিতাটার এক পৃষ্ঠা পড়েই আমি শেষ পৃষ্ঠায় কবির নাম দেখে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কবিতাটা সরিয়ে রেখেছিলাম। কারণ কবির মান মনুজেন্দ্র সাঁতরা। বিরাট পদবীসমুদ্রে বেচারারা একেবারে এ্যামিবা। মাইতি মন্ত্রী হয়, পাঁজা মন্ত্রী হয় কিন্তু সাঁতারারা আজ পর্যন্তও.......থাক্, দুঃখের কথা শুনিয়ে ব্যথা দিতে প্রাণ চায় না!

আমাদের কমিউনিস্ট মণ্টু মুখুয্যে একদিন সক্ষোভে জানাল, ভদ্রলোক কোনদিন মুখুয্যে হয়?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, কেন?

ঃ এই দেখ না বলাই মুখুয্যে থেকে বিনয় মুখুয্যে (যাযাবর) এঁরা সত্যি কথা বলতে কি মুখুয্যের কলঙ্ক ছাড়া আর কি? এই বনফুলটা মুখুয্যে হয়ে মরতে গেল কেন, অন্ততঃ ভৌমিক হলেও—

অ্যাঁ—রীতিমতো আর্তনাদ করে উঠি।

ঃ সে থাক্, তার চেয়ে দেখ চাটুয্যেরা ঢের ভালো, তাদের বঙ্কিম এবং শরৎ রয়েছে, ভট্চাজদের কানন, গাঙ্গুলীদের নারায়ণ রয়েছে, দত্তদের বিবেকানন্দ, ঘোষদের সুবোধ, আর সান্যালদের প্রবোধ, চক্রবর্তীদের শিবরাম আর সেনগুপ্তদের অচিন্ত্য, হালদারদের গোপাল আর—তাড়াতাড়ি ক্রিম-ফকির টেট্রো সামনে এগিয়ে দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করি।

ঃ আচ্ছা, তা'হলে তোর মতে কোন পদবীটা সবচেয়ে ভালো?' আমি প্রশ্ন ছুঁড়লাম।

শুনবি, এক চামচ কফি মুখে তুলে ও আইসেনহাওয়ারের ফরমোজায় দৃষ্টিপাতের মতো এক টুকরো আশ্বাস ভরা চকমকে দৃষ্টি বুলোল আমার ওপর, সবচেয়ে বেস্ট পদবী হচ্ছে—পণ্ডিত।

ঃ পণ্ডিত?

ঃ হ্যাঁ, নামের আগে বসালে তুমি প্রধানমন্ত্রী, (মন্ত্রী হয়ে না হয় ওটুকু ছেড়ে দিয়ে হাততালি কুড়োন যাবে) আর শেষে বসালে একেবারে বৃটিশ হাইকমিশনার—ক্রিমক্রেকার বিস্কুটের মতো মুচমুচে হেসে নিয়ে বলল মণ্টু ঃ তাছাড়া ভালো সাহিত্যিকও হ'তে পারো। 'ডিসকভারী অফ ইণ্ডিয়া'র মতো রোম্যাণ্টিক উপন্যাস বা 'রু দকারার দিনগুলি'র মতো ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা সোজা কথা নয়।

মণ্টু চোখ গোল-গোল করে তোলে।

তারপর থেকেই আমি ঠিক করেছি পদবী চেঞ্জ করে পণ্ডিত পদবী পাবার জন্যে আমি হাইকোর্টে আবেদন করব। তারপর নিজের নামের আগে পণ্ডিত বসিয়ে দরখাস্ত ছুঁড়ে দেবো প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য। কাজ করতে হবে তো ঘেঁচু! শুধু জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জন্যে হাতির বাচ্চা পাঠানো ;—সে আমি খুব ভালোই পারব। আর বোন যখন নেই তখন একটা বিয়ে করে বউ-এর নামের পেছনে 'পণ্ডিত' জুড়ে দিয়ে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রদূত পদের জন্যে পোজ দেওয়া ঃ এইতো রাষ্ট্রদূতের কাজ, সে আমার বউ খুব পারবে।

অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি,—যে নামী হ'তে হ'লে যেমন সভ্যভব্য সমাজে চলবার জন্যে বেশ একটা রঙিন টাই (না ফাঁস!) থাকা দরকার, একটা হৃষ্টপুষ্ট টেল্-এর প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন একটা জাঁদরেল টাইটেল। বিখ্যাত হওয়ার সিক্রেটই হচ্ছে টাইটেল। বড় হওয়ার ভাইটেল ফোর্স, বলতে কি আর কিছুই নয়—টাইটেল।

সুতরাং.......

।। পুরুষের বিরুদ্ধে ।।

অনেক পাঠিকা আমাকে নারীবিদ্বেষী বলে গাল দিয়েছেন, আর অনেকে আঙুর-ফল-টক-শৃগাল বলেও গাল দিয়েছেন। বুঝলাম, ওনাদের মন আর সরল নেই, তরল অনলের মতো জ্বলছে। না, ওঁদের এমন চটানো আমার উচিত নয়। সত্যি বলতে, আমার আলনায় শুধু আমার কোটই ঝুলবে আর কারুর পেটিকোট ঝুলবে না, ভাবতেই মন আমার মণ হয়ে ওঠে, বুকটাকে মনে হয় উজবুক। এছাড়া মেয়েরা সব সময় যে অহিংসাকে পরম ধর্ম ভাববেন তা নাও হতে পারে। যতক্ষণ ওঁরা লক্ষ্মী বা সরস্বতী ততক্ষণ বেশ, কিন্তু একবার যদি মা-কালীর রূপ নেন তখন আমি নিশ্চিত জানি মালা তৈরির জন্যে প্রথম আমার মুণ্ডটাই নেবেন। বাপরে! মেয়েদের গলায় আমি মালা ঝোলাতে রাজী আছি কিন্তু মুণ্ডু ঝোলাতে পারব না। কেননা আমার ধারণা যদি মুণ্ডু ঝোলে তাহলে খুব সম্ভব আমি মারা যাব। আর যদি মারা যাই তাহলে পৃথিবীর সবিশেষ ক্ষতি না হোক, আমার একটু ক্ষতি হবেই। সত্যি বলতে, আমি মৃত্যুকে যে খুব ভয় পাই তা নয়। তবে কি জানেন, আমি আমার লোহার সিঙ্গল বেড থেকে চিতের সিঙ্গল বেডে যেতে চাই না। সিঙ্গল বেড থেকে ডবল বেড, তারপরই ডবল বেড থেকে সিঙ্গল বেডএ যেতে চাই। ফুলশয্যা ছাড়াই অন্তিমশয্যা, আপনাদের কাছে উপাদেয় লাগতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা fool শয্যা লাগবে। এইসব সাতপাঁচ ভেবে ঠিক করেছি মেয়েদের একটু মস্কাফাই করব এ প্রবন্ধে। মস্কাফাই শুনে ভাববেন না এ আমার নতুন কোন মস্করা, মস্কাফাই হচ্ছে পায়ে তেল লাগানোর বোম্বাই সংস্করণ। আপনারা এও জানেন জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই যেরকম অসম্ভব, স্থলে থেকে কুমারীদের সঙ্গে লড়াইও তেমনি অর্থহীন। আশা করছি এ প্রবন্ধের পর আমাকে মেয়েরা একআধটু লাই দিতে রাজী হবেন। আমার মটো হচ্ছে লাই থেকে ভিলাই। বুঝলেন না? ভারত সরকার রাশিয়াকে যেই একটু লাই দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কি হল? সঙ্গে সঙ্গে ভিলাই ইস্পাত কারখানার সূত্রপাত। আমারও সেরকমই পরিকল্পনা। মেয়েরা লাই দিলে সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের হৃদয়ে আমার ভালোবাসার ভিলাই তৈরি করব আমি।

প্রথমেই বলি, ছেলেদের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। এটা অবিশ্যি গালাগাল নয়। কেননা দু'চোখে আমি ছেলে কেন, কিছুই দেখতে পারি না। ছেলে না, মেয়ে না, দাড়ি না, শাড়ি না, কিছুই না। কারণ আমার চোখ খারাপ। চশমা ছাড়া আমার সামনে সব মায়া। চশমা লাগালে ছেলে আমি বেশ দেখতে পারি, কষ্ট হলেও দেখতে হয়।

ছেলেদের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় মিথ্যে হচ্ছে ছেলেরা নাকি আত্মত্যাগে মহান, ছেলেরা নাকি স্বার্থপর নয়, ছেলেরা নাকি দারুণ প্রেমিক হয়। দারুণ প্রেমিকের দারুণ প্রমাণ নাকি তাজমহল। একেবারে বাজে কথা। শাজাহান মমতাজের স্মৃতির চেয়েও

বেশি নিজের পাবলিসিটি পছন্দ করতেন। সেজন্যে তাজমহল। ভালবাসা দেখাবার জন্য শাজাহানের শুধু একজনকে খুশি করবার কথা—মমতাজকে, জনতাকে নয়। সম্রাট ভালবাসাকে হৃদয় থেকে নামিয়ে অপমান করেছেন, তাকে, প্রেমের লজ্জাহরণ করেছেন পাথরের সৌধে তাকে নিষ্ঠুরভাবে বন্দী করে। স্বামীর কাছে যে কোনো স্ত্রীর নগ্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পথে গোড়ালির ওপর কাপড় তোলা চূড়ান্ত নির্লজ্জতা। তেমনি ভালোবাসাও স্ত্রীকেই শুধু জানানো চলে, তাকে জনসমক্ষে দেখানো সমান নির্লজ্জতা। আমার মতে শাজাহান মমতাজকে যতটা ভালবাসতেন মমতাজ শাজাহানকে তার চেয়ে হাজারগুণ ভালবাসতেন। শাজাহান প্রেমের জন্য মমতাজকে দিয়েছেন একটি পাথরের কৌতুক, আর মমতাজ প্রেমের জন্য শাজাহানকে দিয়েছেন চোদ্দটি জীবনের যৌতুক, চোদ্দটি সন্তান। চোদ্দটি সন্তানের প্রসব-বেদনার কাছে সম্রাটের বিরহবেদনা নিতান্তই হাস্যকর। তাজমহল ঐশ্বর্য দিয়ে তৈরি আর সন্তান তৈরি করতে মমতাজ রক্তমাংস দিয়েছেন, দিয়েছেন বুকের দুধ, দিয়েছেন হৃদয়ের মমতা। প্রেম গভীর হলে তা নিঃশব্দ হয়, জল গভীর হলে তাতে ঢেউ থাকে না। মমতাজের প্রেম গভীর ছিল তাই তা ছিল নীরব, শাজাহান প্রেম অগভীর তাই এই তাজমহলের কোলাহল। এই অট্টালিকার অট্টহাসি।

শাজাহানকে তো একহাত নেওয়া গেল। এইবার? পুরুষজাত বা বজ্জাতদের সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা যাক। অনেককে বলতে শুনেছি মেয়েরা না থাকলে পৃথিবীর কি ক্ষতি হত। ক্ষতি হত এই যে পৃথিবীটা একটা বিরাট ক্ষত হয়ে থাকত। কেননা পুরুষ হবে অথচ পরিচ্ছন্ন হবে এমন মণিকাঞ্চনযোগ বড় বেশি দেখা যায় না। গায়ের রঙ সাদা এমন পুরুষমানুষ আপনি হয়তো পাবেন বেশ কিছু, কিন্তু গেঞ্জির রঙ সাদা এমন পুরুষ হাজারে একজন পাবেন কিনা সন্দেহ। সাবধানী মেয়েরা জানে প্রজাপতি-আঁকা বুস-শার্ট পরা, প্রজাপতি-কাটা গোঁফের নিচে প্রজাপতি-মার্কা হাসি ঝুলিয়ে যে ছেলে উত্তমকুমারের মতো পোজ দিয়ে দাঁড়ায় সে দেখতেই শুধু উত্তম, বাইরে থেকেই সে প্রজাপতি, জামার নিচে হয়তো গুটিপোকার মতোই কুশ্রী। তাই মেয়েদের টিপস্ দিয়ে রাখি কোনো ভালো দেখতে ছেলে দেখলেই ঝুপ করে প্রেমে পড়ে যাবেন না। নিম্নোক্ত ঢং-এ কথোপকথনটা চালাবেন। ফল খুব ভালো পাবেন।

ছেলে ঃ নমস্কার। আপনাকে সেদিন ফাংশানে দেখলাম। ভিড়ের জন্য কথা বলতে পারিনি। আমি আপনার ভাই কমলেশের ক্লাস ফ্রেণ্ড। (খুব নার্ভাস ছেলে হলে এখানে যে দেশলাইয়ের কাঠি মুখে লাগিয়ে একটা সিগারেট বার করে সিগারেটের প্যাকেট ঘষে ঘষে জ্বলাবার চেষ্টা করতে পারে)।

মেয়েটি ঃ আপনার নাম দাদার মুখে অনেক শুনেছি। আপনি তো কবিতাও লেখেন।

ছেলে ঃ সে পড়বার যোগ্য নয়, হেঁ হেঁ, বলছিলাম কি, মানে—।

মেয়েটি ঃ (চোখের দিকে তাকিয়ে, সিধে নয়, ৯৫০ ডিগ্রী করে, যাকে বলে কটাক্ষ) বলুন।

ছেলেটি ঃ (এখানে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসেবে বাজবে স্পটুনিকের আওয়াজ অর্থাৎ বীপ বীপ বীপ) ইয়ে মানে আপনাকে প্রথম দিন দেখেই, ইয়ে মানে চলুন না কাল আমার সঙ্গে চা খেতে ম্যাগ্নেলিয়ায়। যদি আপত্তি থাকে, তবে অবিশ্যি—।

মেয়েটি ঃ না না আপত্তি হবে কেন। তবে আমার একটা ছোট্ট শর্ত আছে।

ছেলেটি ঃ বলুন—ফ্র্যাংকলি বলুন।

মেয়েটি ঃ জানি না আপনি আমাকে কী ভাববেন। কিন্তু না দেখে আমি (লজ্জায় লাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কালো মেয়ে হলে বেগুনী) আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।

ছেলেটি ঃ কি বলছেন ? মানে! কি দেখা ?

মেয়েটি ঃ যদি আপনি দেখান, তাহলেই—

ছেলেটি ঃ দেখাবো ? (মনের মধ্যে কয়েকটি পটকা ফাটবে। কান গরম, জিভ ভারী আর পেট কনকনও স্বাভাবিক) কী দেখাবো ?

মেয়েটি ঃ আপনার—বলতে ভারি লজ্জা করছে।

ছেলেটি ঃ বলেই ফেলুন প্লিজ! (ফাঁসির অর্ডার শোনার আগেকার মতো মুখচোখ হবে।)

মেয়েটি ঃ আপনার গেঞ্জিটা।

এরপরে ছেলেটির গেঞ্জি যদি দেখেন সাদা, তখন নির্বিকার চিত্তে ঝুলে পড়ুন। ফরসা গেঞ্জিওয়ালা ছেলেকে বিয়ে করে ঘটকালির জন্য আমাকে কোনদিন গঞ্জনা দিতে হবে না।

আমি পরিচ্ছন্ন গেঞ্জি-পরা ছেলে যে-কজন দেখেছি তারা প্রায় সবাই বিবাহিত। একজন বিবাহিত নয় তবে তার চারজন বোন আছে। ওরা সবাই মিলে ওর গেঞ্জি আর দাড়ির পেছনে যথেষ্ট সময় নষ্ট করে বলেই ওর ফরসা গেঞ্জি আর কামানো মুখ।

পুরুষমানুষ আর সিগারেটের মানে কি জানেন ? মানে হচ্ছে পোড়া বিছানার চাদর, পর্দা আর জামায় অজস্র ফুটো, নোংরা বাথরুম, ধোঁয়াটে ঘর আর কাল্‌চে ঠোঁট।

চায়ের কাপ বা দামী কার্পেট থাকতে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ে এমন পুরুষমানুষ আপনি দু'টি পাবেন না। স্মোকারদের সবচেয়ে বড় এলার্জি হচ্ছে ছাইদান। নেহাত যারা দয়ালু তারা দুয়েকটা দাঁত খোঁচানো লালচে পোড়া দেশলাইর কাঠি বড় জোর দান করে ছাইদানে, কিন্তু ছাই কদাচ নয়।

একধরনের পুরুষ আছে যাদের ধারণা মেয়েদের কাছে আদৃত হওয়ার উপায় হচ্ছে খুব স্মার্ট ইংরেজী বলা। তাদের নমুনা দিই। ভদ্রলোক কানপুর থেকে এসেছেন। বিকেল মহিলাবহুল এক চাচক্রে এলেন। কয়েকজন মহিলা বলে উঠলেন ঃ আসুন আসুন।

ভদ্রলোক ঃ আপনারা যতবার আসি ততবারই এমন ওভারকাম (ওয়েলকাম হবে) করেন যে না এসে থাকা যায় না। বাঃ! মিস্‌ মিত্র, এই কুকুরটা বুঝি আপনার, কি কুকুর ?

ভদ্রমহিলা ঃ গ্রেট ডেন। আপনার কুকুরের শখ বুঝি ?

ভদ্রলোক ঃ হ্যাঁ, আমিও হচ্ছি ডগপ্রেমিক। সেদিনই নতুন কিনলাম একখানা বার্নার্ড শ, দারুণ কুকুর। (সেণ্ট বার্নার্ড হবে)

ভদ্রমহিলা ঃ আরে এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়েই দিই নি। এঁর নাম সীতা রায়, ভালো গায়িকা।

ভদ্রলোক ঃ জানি। আমাদের কানপুরেও আপনারও খুব পপুলেশেন, (পপুলারিটি হবে) সবাই সীতা রায় বলতে অজ্ঞান।

গায়িকা ঃ ও, কানপুরে একটা ফাংশানে আমার যাওয়ার কথা।

ভদ্রলোক ঃ গেলে জানাবেন, ওখানে আমার যা কর্পোরেশন দরকার, চাইলেই পাবেন (কো-অপারেশন হবে)।

ভদ্রমহিলা ঃ নিনি, কেক খান।

ভদ্রলোক ঃ না, কেক-টেক খাব না। তিনদিন ধরে আমার খুব কনস্টিটিউশন হয়েছে। (কনস্টিপেশন হবে)

গায়িকা ঃ সুদর্শনবাবু, একটা অনুরোধ আছে।

ভদ্রলোক ঃ আই অ্যাম অ্যাট ইওর সারভেণ্টে, (সাবভিস হবে) বলুন কী করতে

হবে।

গায়িকা ঃ এই মেয়েটি আমার মামাতো বোন। এইবার বি. এ. পাশ করেছে। সর্টহ্যাণ্ডও শিখেছে। আপনার তো নিজের বিজনেস, দিন না ওকে একটা চাকরিতে লাগিয়ে। যদি অবিশ্যি আপনার জায়গা থাকে।

ভদ্রলোক ঃ সর্টহ্যাণ্ড টাইপিং যখন জানে তখন পারব নিশ্চয়ই। আমার অফিসে একটা জায়গা খালিও আছে। তবে একটা কথা, তিন মাস পরেই প্রাগনেণ্ট করে দেব, (পার্মানেণ্ট হবে) চলবে তো?.......

দেখলেন তো নমুনা! এরকম একজনের পাল্লায় পড়লে টের পাবেন ইংরেজী কাকে বলে। ভালো ইংরেজীকে কিংস্ ইংলিশ বলা হয়। আমার মনে হয় এ ধরনের ইংরেজীকে বলা উচিত কিংকঙস্ ইংলিশ।

অনেকে বলেন মেয়েরা সংকীর্ণমনা সন্দেহপরায়ণা। তাহা মিথ্যে। পুরুষরা অনেক বেশি সন্দেহমনা ও অনুদার। আমি এক ভদ্র-মহিলাকে জানি যিনি দেব আনন্দের ফ্যান ছিলেন। অনেকদিন পর দেখা হতে বললাম, চলুন আপনার হিরোর সঙ্গে আলাপ করবেন। কাছেই ওঁর স্যুটিং আছে।

ঃ না, না, আতঙ্কিত গলায় বললেন ভদ্রমহিলা, উনি খুব রাগ করবেন।

ঃ রাগ করবেন? কেন?

ঃ জানি না। কিন্তু বিয়ের পর ও যখন জানল আমি দেবের ফ্যান তখন থেকে আমাকে দেব আনন্দের কোন ছবি দেখতে দেয় না! অটোগ্রাফ খাতাটাও ফেলে দিয়েছে। অন্যমনস্ক থাকবার যো নেই। বলবে দেবের কথাই নাকি ভাবছি। অসময়ে বিরক্ত করতে এলে, না বললেই বলবে, আমি দেব আনন্দের মতো চুমু খেতে পারি না তাই তোমার সহ্য হচ্ছে না আমাকে। আপনাদের নিয়ে ঘর করা যে কি জ্বালা তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। বলেই ভদ্রমহিলা চোখ ঘুরিয়ে নিলেন, জল লুকোতে। এ-ধরনের চরিত্র বিরল নয় মোটেই। আমার এক বন্ধু রসিকতা করে বলে, তোর ঘর আমার ঘর, আমার ঘর তোর ঘর, তোর মা আমার মা, আমার মা তোর মা, তোর স্ত্রী আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী। রসিকতা হলেও এটা প্রত্যেক পুরুষমানুষের মনের কথা। তোর স্ত্রী আমার স্ত্রী, কিন্তু আমার স্ত্রী আমারই স্ত্রী। অর্থাৎ হেড আই উইন্ টেল ইউ লুজ! স্বামীরা যদি স্ত্রীকে সত্যি ভালবাসত, তবে না হয় মেয়েরা সন্দেহ-টন্দেহগুলো সহ্য করেও সুখী হত। কিন্তু সে হয় না। বিয়ে করতে হবে অথচ ভালোও বাসতে হবে এমন আইন পুরুষজাত মানে না। স্ত্রীকে ভালবাসে এমন পুরুষ যে দেখা যায় না তা নয়, তবে সে নিজের স্ত্রীকে নয়, পরের স্ত্রীকে। পরের বোন, পরের মেয়ে, পরের স্ত্রীকে সব স্বামীরাই ভালবাসে, শুধু নিজের স্ত্রীকে ছাড়া। খুব করুণাময় যারা তারা বড় জোর স্ত্রীর বোনকে ভালবাসে, কিন্তু স্ত্রীকে কদাচ নয়। এদের ধারণা স্ত্রী আর ইস্ত্রীতে তফাত নেই। দুটোই আসবাব মাত্র, প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা নিয়ে কথা! সব স্বামীই স্ত্রীর কাছে আশা করে সে তাকে, তার বাবা মা ভাই বোন দাসদাসী সবাইকে খুশী রাখবে কিন্তু স্বামী হিসেবে তার দায়িত্ব শুধু একজনকেই খুশি রাখা, নিজেকে। স্বামীদের ধারণা যেহেতু সে ম্যাসকুলিন জেণ্ডার সে massদের মধ্যে কুলীন, আর বউ হচ্ছে হরিজন। নর হয়েও এমন বানরোচিত ব্যবহার পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। সৎ সন্তানকে সহ্য করতে না পারলে সে স্ত্রী নিন্দনীয় নয় কিন্তু সেরকম অবস্থায় যে-কোনো স্বামী স্ত্রীর আগের পক্ষে সন্তানদের সঙ্গে যে আরো নৃশংস ব্যবহার করে থাকে তার খবর কেউ রাখে না। সৎমার কঠিন হৃদয় নিয়ে অনেক কাহিনী পাবেন কিন্তু সৎবাবার কঠিন হৃদয় নিয়ে একখানা কাহিনীও পাবেন না। ঘটনার অভাব নেই, লেখকের অভাব নেই, অভাব নিঃস্বার্থভাবে লেখার।

লেখকরা প্রায় সবই যে অবতার। আর অবতারদের পক্ষে এ-ধরনের কাহিনী অবতারণা করা মুশকিল। তবে যে প্রেস্টিজ পাংচার। পুরুষরা ধরে নিয়েছে মেয়েরা একেবারে অবুঝ, কিছু বোঝে না, জানে না। এজন্যই বোধ হয়, অর্থাৎ ওরা কিছু জানে না ভেবেই মেয়েদের নামকরণ করেছে জানানা। কিন্তু জানানারা সব জানেন। জেনেও চুপ থাকেন, সব সহ্য করেন। হাসিমুখে। ওঁরা হচ্ছেন সহ্যের প্রশান্ত মহাসাগর। মহাসাগর বলেই এই ভিসুভিয়াস পুরুষজাত নিয়ে ঘর করতে পারছে। সত্যি বলতে, সংসারে পুরুষরা সং মাত্র, মেয়েরাই সার। বুদ্ধিমতী মেয়েদের অভিধানে তাই ছেলে মানে হচ্ছে ছলনা। তাদের কাছে কিছুই আশা করে না ওরা, এমনকি নিয়মিত রাত্তিরে আসার আশাও করে না। ছেলেরা ঘর করেই ভাবে মস্ত এ্যাচিভমেণ্ট করেছি। কিন্তু জানেনা এ এ্যাচিভমেণ্ট আর পেভমেণ্টে কোন তফাত নেই। কেননা Home করাটা বড় কথা নয়, বড় কথা Home চালানো। তাতে দরকার হয় হোম্‌স-এর। হ্যাঁ, শার্লক হোম্‌স্‌ যে অজস্র বুদ্ধি খরচ করে এক একটা সংসার গুছিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য আমি ভারত সরকারে অনুরোধ করব প্রতিটি গৃহকর্ত্রীকে যেন পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আমি অনেক ভেবে দেখেছি মেয়েদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে তারা মেয়ে বিয়ে করতে পারে না, ছেলেদের বিয়ে করতে হয়। মেয়েরা যদি মেয়েদের বিয়ে করতে পারত তবে সেটাই হত সবচেয়ে সুখের সর্গ। নারীদের ভবিতব্যই হল নরকে বিয়ে করা। আর নরকে বিয়ে করা যে কথা, নরকে থাকাও সেই কথা। শেক্সপীয়র বলেছে, 'All men are odd,' অথচ ছেলেদের ধারণা তাঁরা odd নন, তাঁরা God। যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন তাঁরা। কিছু oddলোকদের সম্পর্কে আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। এঁদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো। এঁদের বিয়ে করতে যাবেন না। বিপদ হতে পারে। এক নম্বর হচ্ছে ঃ ডাক্তার। ধরুন আপনার বিয়ে হয়েছে এক ডাক্তারের সঙ্গে। বিয়ের রাত। অজস্র গয়না, মালা আর চেলির ভারে আপনি অবনতা, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের নিচে আপনি কম্পিত লজ্জিত মুখে অপেক্ষা করছেন কখন স্বামী আসবে, কখন সে ঘোমটা সরিয়ে আপনার মুখ দেখবে অপলক চোখে, কখন অধরে অধর ছোঁয়াবে সোহাগের আবেশে। এল স্বামী।.........কাছে আসছে।..........বুক ধুকপুক,.......চোখের পাতা ভারী। ঘোমটাও সরাল সে। তবে মুখ দেখল না। বলল, দেখি, তোমার জিভ দেখাও তো। বিয়ের রাতে স্বামীর কাছ থেকে এরকম বেরসিক প্রশ্ন শুনে আপনার গা জ্বলে উঠবে। ইচ্ছে করবে জিভ নয়, বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে। তবু আপনি নিজেকে সামলে জিভ হয়তো দেখালেন, আর জিভ দেখতে না দেখতেই বলে উঠল আপনার ডাক্তার-স্বামী, ইস তোমার জিভ খুব ময়লা তো। পেট পরিষ্কার নেই। কাল সকালেই তোমাকে পার্গেটিভ দেব। মুহূর্তে আপনার বিবাহ সম্পর্কে গোলাপী ধারণাটা জোলাপী হয়ে গেল। পারবেন এমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে? বিয়ের রাতে যে মুখ দেখে না, জিভ দেখে আর সকালে উঠে যে চুমু দেয় না, পার্গেটিভ দেয়, তার সঙ্গে কী করে বাস করবেন আপনি? তাই বলি, ডাক্তারের চেয়ে অনেক ভালো ডাক-তারের কোন কর্মচারী, এমন কি যে-কোন মোক্তারও ডাক্তারের চেয়ে ভালো। ডাক্তারের সঙ্গে বাস করাও যা, ক্যাস্টার অয়েল আর কডলিভার অয়েলের সঙ্গে বাস করাও তাই!

দুই ঃ প্রফেসর। প্রফেসরমাত্রই বডড ভোলা হয়। যাকে বলে বম্‌ভোলা। সে প্রফেসরের কাহিনীটি নিশ্চয়ই জানেন যে একদিন বাড়িতে এসে শোবার ঘরের বিছানায় একটি সুন্দরী মেয়েকে পাতলা নাইটগাউন পরে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? কি চান এখানে? এখানে

এলেনই বা কি করে?

মেয়েটি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে মধুর করে হাসল। নাইটগাউনের নিচে থেকে একটা পা বার করে প্রফেসরের চোখের সামনে সাপের মতো নাচল। প্রফেসরের চশমা খসে পড়বার উপক্রম। তারপর মেয়েটি মেরিলিন মনরোর মতো কণ্ঠে বললো, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। বড্ড ক্লান্ত লাগছিল হাঁটিতে। দেখলাম এ বাড়ির দরজাটা খোলা, ঢুকে পড়লাম। ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি বেডরুমটার দরজাও খোলা। ভাবলাম, যাই না ভেতরে, দেখি কে আছে। এলাম, কেউ নেই। বাথরুমে জলের ফোঁটা পড়ছিল টপটপ। মনে হল চান করে নিলে মন্দ হয় না, ঘামে শরীর প্যাচপ্যাচ করছিল। বাথরুমে শ্যাম্পু সাবান সব ছিল। চান করলাম। ওখানেই এই নাইটগাউনটা পেলাম। পরে বেরিয়ে আসতেই বিছানাটা যেন হাতছানি দিচ্ছিল। ভাবলাম একটু শুয়েই যাওয়া যাক। তাই বিছানায় এসে শুয়েছি। এ পর্যন্ত বলে মেয়েটি তাকাল প্রফেসরের মুখের দিকে। প্রফেসরের মুখে রাজ্যের বিস্ময় আর আতঙ্ক। মেয়েটি এবার হিংস্র কণ্ঠে শেষ করলো, আর এছাড়া মুখপোড়া মিনসে, আমি তোমার বিয়ে-করা বউ।

বুঝুন ঠ্যালা! বউকেই ভুলে বসে আছে। এ ধরনের লোককে বিয়ে করা বিড়ম্বনা। আপনি হয়তো বাচ্চার মা হতে বাপের বাড়ি এসেছেন তখন হয়তো স্বামীটি দুম্ করে আরেকটি বিয়েই করে বসল। আপনি ফিরে যেতেই মাথা চুলকে বলল, তুমি আমার বউ বুঝি? এই দ্যাখো, তুমি ছিলে না আর ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি বিবাহিত, তাই আরেকটি বিয়ে করে ফেলেছি। এবার কি হবে?

শান্তকণ্ঠে জবাব দিতে পারেন, জেল। কিন্তু এ জবাবে আইন হয়তো শান্ত হবে আপনি হবেন কি? তাই বলি প্রফেসর-ট্রফেসর থেকে 'শত হস্তেন' থাকাই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় হচ্ছে ব্যায়ামবীর। জীবন আপনার ব্যারাম করে তুলবে সে। সকাল পাঁচটায় তুলে আপনাকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে হয়তো বলবে, দু-পা জোড়া করে দাঁড়াও। এইবার এক পা তোলো। হ্যাঁ, এইবার অন্য পা'টি তোলো।

দুই পা এক সঙ্গে তোলা যে অসম্ভব সেটা ব্যায়ামবীর বুঝবেন না। কেননা মাধ্যাকর্ষণ বোঝা তাঁর অসাধ্য। ব্যায়ামবীর বিজ্ঞানবীর নন। ফলে আপনাকে দুটো পা-ই তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার পশ্চাৎদেশটি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ভূমিষ্ঠ হবে। আপনি যদি একটু হৃষ্টপুষ্টা হন তবে এই ভূমিষ্ঠা হওয়াটা ভূমিকম্পনের কারণ হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং পেশী থেকে যত বেশী দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

চতুর্থ হচ্ছে দাড়িওয়ালা। দাড়িওয়ালা পুরুষ হচ্ছে বুরুশের মতো। জুতোর ওপরই তাকে মানায়, কোনো মেয়ের মুখের ওপর নয়। দেড়ো লোক যখন আপনার সঙ্গে প্রেমালাপ করবে আপনি বুঝতেই পারবেন না আপনি মানুষের সঙ্গে প্রেম করছেন, না সজারুর সঙ্গে। সখী-সখী চুলওয়ালারা তবু ভালো। রেগে গিয়ে চুলোচুলি করার সময় কাজে লাগবে। কিন্তু দাড়ি? বুকে বসে ওপড়ানো যায় হয়তো, কিন্তু ল্যাং মেরে নিচে ফেলে বুকে বসা চাড্ডিখানা কথা নয়। তাই বলি দাড়ি থেকে দূরে থাকুন। দেড়োর চেয়ে মেড়োও শ্রেয়।

পঞ্চম হচ্ছে সিনেমার পরিচালক। আমি একজন পরিচালকের স্ত্রীকে জানি যিনি আমাকে বলেছিলেন কোনো মেয়ের যেন ফিল্ম ডিরেক্টর বিয়ে করার দুর্ভাগ্য না হয়। অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন?

দেখো না, এই সেদিন বারাণ্ডায় আমরা দু'জন ছিলাম। পূর্ণিমা রাত। আমার অধিবাসের থালার মতো মস্ত চাঁদটা জ্বলছিল আকাশে। মনটা যেন কেমন করে উঠল।

ওর কাছে গিয়ে বললাম, হ্যাঁ গো, আমি যখন থাকব না তখন ঐ চাঁদের দিকে তাকিয়ে তোমার মনে পড়বে আমার কথা? এর জবাবে ও কি বলল, জানো? প্রশ্ন করলাম, কী বলল?

বলল, 'কাট্'।

আমি অবাক, কাট্?

হ্যাঁ, কাট্। বলল, রিটেক হবে। বলল, আমার ডায়লগ ডেলিভারী নাকি ঠিক হয় নি। আমার নাকি উচিত ছিল ঃ 'হ্যাঁ গো, আমি যখন থাকব না তখন' ঃ এরপর ছোট্ট pause দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফের ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বাকি ডায়লগটা বলা। বুঝিয়ে দিয়েই বলল, নাউ ক্যামেরা স্টার্ট। এবার বলো।

আমি হাসব না কাঁদব বুঝছিলাম না। এক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দৌড়ে ঘরে চলে এলাম। ওর কাছে ছবির হিরোইন আর বউয়ে কোন তফাত নেই। বউকেও ও হিরোইনই ভাবছে!

শুনে-টুনে বললাম, না বউদি, হয়তো সেদিন মনটা ওঁর স্টুডিওতে পড়েছিল তাই ওরকম বলেছেন।

ঃ সেদিন নয় শুধু, সব সময় ওরকমই করে ও। আজ কি হয়েছ জানো?

বললাম, কী?

ঃ বাথরুম থেকে ওকে ডাকলাম, শুনছ।

ও এল। আসতেই বললাম পিঠটা বড় টড়বড় করছে। দাওনা পিঠটায় একটু সাবান মাখিয়ে। বলে পিঠটা খুলে ওর দিকে পেছন ফিরে বসলাম। ও কী বলল জানো?

ঃ কী বলল?

বলল,না না। সে পারব না আমি। ও সিন সেন্সার বোর্ড কিছুতেই এ্যালাউ করবে না।

ঃ বুঝলে তো এইবার? এরকম পাগলা নিয়ে ঘর করা আর রাঁচীতে থাকা এক কথা নয়? একে তুমি হাসব্যাণ্ড বলবে?

সত্যি বলতে এ-ধরনের হাসব্যাণ্ডকে হাসব্যাণ্ড বলার মানে হয় না। বলা উচিত কাঁদব্যাণ্ড। সারাজীবন এরা হাসায় না, কাঁদিয়েই যায়। এদের ধারণা কন্যা কথাটা কান্না থেকেই এসেছে।

আমার ঘোরতর বিশ্বাস, এ ব্যাকরণ জ্ঞান নিয়ে হয়তো বা বি. এ দেওয়া চলে কিন্তু বিয়ে করা চলে না। সুতরাং সিনেমা পরিচালক থেকে সাবধান। ছবিতে নামবার চান্সের জন্য ওদের নিয়ে একটু ইয়ে করতে চান করুন কিন্তু বিয়ে কদাচ নয়।

Odd চরিত্রের কথা যতই ভাবছি ততই মনের মধ্যে হাজারো চরিত্র উঁকি দিচ্ছে। ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। শেক্সপীয়রই সঠিক সংবাদ দিয়েছেন ঃ All men are odd। সব মরদারই গলদ। মোট কথা male-দের থেকে mile খানিক দূরে থাকাই শ্রেয়। মনে রাখবেন, He মানে আসলে হচ্ছে হিং। আর শুধুই হিং নয়, একেবারে হিং টিং ছট্। ছেলেরা যে কোন সাহসে নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহার করে আমি ভেবে পাই না। যদি নেহাৎ কিছু ব্যবহার করতেই হয় তবে একমাত্র 'ছিঃ' কথাটাই উপযুক্ত। শ্রীশ্রীকান্ত তালুকদার যার নাম, জেনে রাখুন আসলে সে ছিঃ-ছিঃ-কান্ত তালুকদার। আদর করে অবিশ্যি বলতে পারেন, ছ্যা ছ্যাকান্ত।

মেয়েদের টয়লেটের দেরি নিয়ে হাজারো গল্প আছে। ওঁরা নাকি 'এক মিনিট লক্ষ্মীটি' বলে এক ঘণ্টা লাগান। এটা এমন কিছু একটা। অসম্ভব সিচুয়েশন নয়। ছ-টার শো'র টিকিট কেটে এনে তিনটে'র শো দেখতে যাচ্ছি বললেই দেখা যাবে ওরা যথাসময়ে অর্থাৎ পৌনে ছ-টা নাগাদ রেডি। সেজন্যে আমি বলব এটা কোন সমস্যাই নয়। সমস্যা হল, তাসের আড্ডা থেকে স্ত্রীর তাগাদা শুনে স্বামী যখন বলে 'এক মিনিট লক্ষ্মীটি' এটা লাস্ট ডিল'—তখন। কেননা স্ত্রী জানে, এই 'লাস্ট ডিল' মাত্র একখানা ডিল নয়। কারণ তাসের গণিতে লাস্ট ডিল এক নয়, একাশী। এ সময়ে যে কোন স্ত্রী অনায়াসে উত্তমকুমারের জন্যে একটা পুরোসোয়েটার বুনে ফেলতে পারে, এমন কি স্বামীর জন্যে একটা মাফলারও। তাসভক্ত স্বামী যাঁর সে স্ত্রী জানেন তাঁর স্বামীর জীবনে Rummy-ই সব, আমি কিছু না।

সেজন্য আমার রায় হচ্ছে ঃ পুরুষদের সর্দির মতো পরিহার করুন। সম্মান যদি বাঁচাতে চান তবে man-দের পাত্তা দেবেন না। শুধু আমাকে ছাড়া। কারণ আমি ফরসা গেঞ্জি পরি, অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলি, odd-দের মতো নিজেকে কক্ষনো God মনে করি না। এক কথায় আমি খুব ভালো। মেয়েদের সঙ্গে কোন খারাপ উদ্দেশ্যে মিশি না। আমি প্লেটনিক লাভ-এ বিশ্বাস করি। হ্যাঁ, platonic লাভার বলতে বোঝায় একমাত্র শচীন ভৌমিক। platonic মানে হচ্ছে ঃ যা আপনাদের কাছে play, কিন্তু আমার কাছে tonic !

॥ কনুই ॥

কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলার চেয়ে আমার বেশি দুঃখ হয় মেয়েদের কনুই পুরুষদের কাছে এত বেশি উপেক্ষিত বলে। মেয়েদের 'লুক' নিয়ে বলতে গেলেই পুরুষরা প্রথমেই বুক নিয়ে বকবে। চোখ সম্পর্কে চোক্‌ড় হয়ে যাবে, নিতম্ব দেখে হতভম্ব হবে কিন্তু কনুই সম্পর্কে এতটুকু কুঁইকুঁইও করবে না। পুরুষরা শুধু গোল দেখে গোলমাল করবে, কোণ নিয়ে গুণগুণ করতে নারাজ। ভাস্কররা ও চিত্রকররা (অজন্তা ইলোরা বা কোনারক খাজুরাহো) মেয়েদের প্রচুর স্তন নিয়ে উচ্চ শিল্পকর্ম করেছেন, বা উচ্চ স্তন নিয়ে প্রচুর শিল্পকর্ম করেছেন। কিন্তু কনুই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পায়নি। কেন বলুন তো? কনুই কি অবহেলা করার মতো? পুরুষদের কনুই মেয়েদের কনুইতে কোন তফাৎ নেই বলেই কি? পুরুষদের চেয়ে কিঞ্চিৎ নরম ও কিঞ্চিৎ ছোট ছাড়া আর কোন প্রভেদ নেই। সেজন্য ফ্রয়েড থেকে হ্যাভলক এলিস, ক্র্যাফট্ এবং বা কিন্‌সে কনুইকে পাত্তা দেননি। কনুই সেক্সি নয়, এরোটিক জোনের মধ্যে পড়ে না। 'কেবলমাত্র বিবাহিতের জন্য', মার্কা যৌনগ্রন্থেন 'বিবাহোত্তর শৃঙ্গারে কনুইকে চুম্বন করুন' বলে লেখা নেই। নাকের ডগা কানের লতি নিয়ে ওকালতি অনেক পাবেন কিন্তু 'আগামী পরিচ্ছেদে এল্‌বো নিয়ে বলবো' বলে কোথাও পাবেন না। ইংরেজী Elbow, জার্মান Ellbogen ও ফরাসীতে কনুইকে বলে Un coude (আনকুথ নয়!) ফরাসীতে এটা পুংলিঙ্গ। তাহলেই দেখুন যখন সুন্দরী কোন ফরাসী মেয়ে দেখে আপনি বলবেন, She is every inch a woman কথাটা ব্যাকারণে অশুদ্ধ হবে। মেয়েটির কনুই যদি পুংলিঙ্গ হয় তাহলে ওর শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি স্ত্রীলিঙ্গ তো হতে পারে না। ফ্রান্সে গেলেই কথাটা শুধু মনে রাখবেন। সে জায়গায় বলবেন—You are every inch a woman except, of course, your elbow, which is masculine gender. স্বভাবতঃই মেয়েটা প্রেমে পড়বে। .কেননা ফিজিক্যালি প্রেম না করুক, গ্রামাটিকেলি তো করবেই। আপনি না হোক আপনার গ্রামারই ওর জামার বোতাম খুলবে যথাশীঘ্র

কনুই আর হাঁটু একই জাতের অঙ্গ। তবে তফাৎ আছে। কনুই সামনের দিকে ভাঙে আর হাঁটু পেছনের দিকে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিন যে এর উল্টোটা উনি করেননি। সেক্ষেত্রে চলা অসুবিধাজনক হতো। যদিও পেট চুলকোলে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চুলকোনো যেতো এটা একটা লাভ ভাবতে পারতেন। তবে হাত উল্টো ভাঙলে দাড়ি কামানো অসম্ভব হতো। নাপিতরা অবশ্য খুবই খুশি হতো, ওদের হতো পৌষমাস। যদিও নাপিতরা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সামনে আয়নায় আপনার মুখ দেখে তবে দাড়ি কাটতে পারত। প্রেম করারও বিস্তর অসুবিধা হতো। বাৎস্যায়নকে আসন লিখতে হলে আরও দুশ্চিন্তায় পড়তে হতো। বাসর রাতের ন'মাস পর হাসপাতালে না

গিয়ে অনেক দম্পতির হাতের ফ্র্যাকটার ঠিক করতে পরের দিন সকালেই যেতে হতো। ভাবুন কি বিড়ম্বনা হতো।

মেয়েদের কনুই-এর চাইতে হাঁটু সব পুরুষের কাছে প্রিয়। হাঁটু দেখতে ভালবাসে পুরুষরা। মেয়েরা সে কথা জানে। তাই স্কার্টের ঝুল কখনো হাঁটুর নীচে, কখনো মিনি স্কার্টের ঝুল হাঁটুর ওপরে। মানে "দেখাবো না" "দেখাবো" এই লুকোচুরি খেলা। পুরুষদের সঙ্গে। বাঙালী মেয়েরা শাড়ি পরে। কখনো শাড়ি গুটিয়ে যদি উঠে যায় ও কোন ছেলে হাঁটু দেখে ফেলে সে তৎক্ষণাৎ লাটু হয়ে যাবে। হাঁটু ছুঁতেও পুরুষদের পছন্দ। কেননা হাঁটু থেকে ওরা অগ্রসর হবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কনুই? মেয়েদের সবচেয়ে নগ্ন প্রত্যঙ্গ। দেখে ছেলেদের বরং ভয় হয়ে যে এগুতে গেলে মেয়েটা কনুই মেরে দেবে। ছুঁতে কারুরই আগ্রহ নেই। কনুই থেকে অগ্রসর হয়ে স্কন্ধে যাওয়া যায়। কিন্তু কাঁধ তো পুরুষদের কাছে সাধের বা স্বাদের বস্তু নয়। কাঁধে বড়জোর মাথা রাখা যায়, কিন্তু প্রেম পর্বে মাথা রাখা নিয়ে কার আর মাথাব্যথা হয় বলুন?

কনুই আজ নয়, কিন্তু একদিন হয়তো মেয়েদের শরীরের সবচেয়ে আর্কষণীয় অঙ্গ হবে। এ যুগে যে রকম নগ্নতার ছড়াছড়ি তাতে বুক পাছা হয়তো আর উত্তেজনার কারণ থাকবে না। ভাবুন সেই আগামী যুগ। মেয়েদের ব্লাউজের হাত টাইট হলে কনুই-এর খোপ দেখে আমরা হয়তো ততটাই উত্তেজিত হবো যতটা আজকাল টাইট-প্যাণ্ট পরা মেয়ে দেখে হই। লুজ হাতা হলে হয়তো অবহেলায় কখনো আমার কনুই পর্যন্ত হাতার নীচে দেখে ফেলবো ও লজ্জায় লাল হবো। স্ট্রীপটীজ দেখতে যাবো যেখানে সম্পূর্ণ উলঙ্গ মেয়ে আসবে হাতে মোজা পরে। আর হট মিউজিকের সঙ্গে যখন মেয়েটা মোজা খুলবে তখন উত্তেজিত জনতা মদে মাতাল কণ্ঠে চেঁচাবে, Jake it off Baby. ভারতীয় ছবিতে কনুই ভালোভাবে ঢাকা না থাকলে সেটা অশ্লীলতার জন্য সেন্সার হয়ে যাবে। মেয়েদের জন্য বিজ্ঞাপন বেরুবে—নতুন হরমোন ক্রিম। "আপনি কি দুর্বল কনুই-এর জন্য ভুগছেন? আপনার কনুই কি আয়তনে ক্ষুদ্র? হতাশ হবেন না। আমাদের অপূর্ব আবিষ্কার 'নারী বন্ধু ক্রিম' ব্যবহার করুন। দু'সপ্তাহের মধ্যে কনুই সুডৌল হবে, দুই ইঞ্চি আয়তন বৃদ্ধি পাবে। ক্রিম ব্যবহার করুন ও নারীজন্ম সার্থক করুন। ফল না পেলে মূল্য ফেরত। দাম দশ টাকা। অবিলম্বে লিখুন পোস্টবক্স ৪২০ অমৃতসর।"

অবাক হবেন না। এ যুগ আসতেও পারে। তখন হয়তো মিস্ ইণ্ডিয়ার মাপ বেরুবে—বুক ৩৬", কোমর ২২" নিতম্ব ৩৬", কনুই ৯"।

যতদিন সে যুগ না আসে ততদিন যত পারেন মেয়েদের খোলা কনুই দেখে নিন। মনে রাখবেন, আপনার পরের জেনারেশন এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। শেষ সুযোগ। 'সেল' এর লাস্ট ডেট আসতে দেরি নেই। সুতরাং দেরি করবেন না। মেয়ে দেখলেই বলুন, কিছু মনে করবেন না যদি অনুমতি করেন তবে—

কি?—মেয়েটা জানতে চাইবে।

মানে, বলুন, আপনার এলবো নিয়ে একটু খেলবো?

মেয়েটি বলবে, পাগল হয়েছেন?

হ্যাঁ, বলবেন, আপনার কনুই আমাকে পাগল করে দিয়েছে। আপনার মোমের মত মসৃণ, সুঁচের মতো সু-চোল আর মার্বেলের মতো ঠাণ্ডা কনুই, আমার রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটি বলবে, কনুই আগুন জ্বালাতে পারে?

বলুন, পারে। আপনি বুঝবেন না। আপনার কাছে এটা শুধু কনুই আর আমার কাছে এটা কোনারক।

দেখুন সংলাপও দিয়ে দিলাম। শুরু করে যান। গুড লাক।

।। ঘুরণ-চণ্ডির ভ্রমণ কাণ্ড ।।

ঘুরে বেড়াতে আমার ভালো লাগে। এদিক দিয়ে চীনের সঙ্গে শচীনের কিছুটা মিল আছে। চীন যেমন চলার জন্য পা তুলেই আছে, আমিও তাই। তফাত শুধু এই চীনের পা সীমানার বাইরে আর আমার পা একেবারে গণ্ডীর ভেতরে। গণ্ডীর মধ্যেই গণ্ডা গণ্ডা বার আমি চরকি-বাজির মতো ঘুরেছি। গণ্ডার (বা চীন)-এর মতো গণ্ডীর বাইরে গিয়ে গুণ্ডামী করিনি! (বিদেশে গেছি বন্ধুর মতো বান্ধবীর খোঁজে, এক আধটু নেকিং করে থাকব। কিন্তু চীনের মতো দরজা ভেঙে নেক-ব্রেকিং করিনি।) যা বলছিলাম, আমার ভ্রমণ পুরাণ। ট্রেন, প্লেন, ও মোটর এই তিন যানে জান হাত নিয়ে কত ঘুরলাম। তার অভিজ্ঞতা থেকেই লিখছি এ প্রবন্ধ।

প্রথমেই বলি, সময় হাতে থাকলে ও সঙ্গে সঙ্গী থাকলে ট্রেন বেশ মজার। যাযাবরের ভাষায় ঃ ট্রেনে আছে জাতির আয়েস আর প্লেনে গতির বেগ। দর্শনীয়, ক্ষেত—গ্রাম—পুকুর—মানুষ (লোটা হাতে বা লাঠি হাতে)—কুকুর—স্টেশন কত কি দেখা যায় ট্রেন থেকে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল চরিত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ট্রেনে আমি চরিত্র দেখেছি কম, বেশির ভাগ যা দেখেছি, তা চরিত্রহীন। স্বীকার করছি ট্রেনে যাতায়াত কম করি। কিন্তু সঙ্গী হিসেবে পাই বোতল-প্রেমিক অ্যাংলো, পরস্ত্রী প্রেমিক কোন কেরানী বা নাসিকা গর্জন মন্দ্রিত কোন সর্দারজী। বুঝুন। একমাত্র অবশ্য হিন্দী সিনেমার সিন হচ্ছিল। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। চারজন যাত্রী। চারজনের মধ্যে মাত্র একজন ছাত্রী। বলাবাহুল্য বাকি তিনজন হল হুলো। রাত দশটায় এক স্টেশনে নেমে গেল দু'জন যাত্রী। ফার্স্ট ইমাজিন একেবারে রক হাডসন, ডরিস ডে মার্কা সিচুয়েশন। অর্থাৎ রাত, ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরা, বাইরে বন আর আমার মধ্যে বুনো ইচ্ছে। চুপচাপ সে ও আমি। অ্যাডাম আর ইভ অর্থাৎ বলা যায় দু'জন হিশি। (কিডনি উৎপাদিত নয়। হিশি মানে HE ও SHE)। এমন সময় প্রায় লতা কণ্ঠের লতানো আবেগ শুনতে পেলাম, শুনছেন?

শুনব না মানে? কান তখন স্টিরিওফনিক রেকর্ডিং-এর সবচেয়ে সেনসেটিভ মাইক-এর মতো শব্দান্বেষী। সুতরাং সজাগ কণ্ঠে বললাম, আমায় কিছু বলছেন? (ন্যাকামী দেখুন! যেন কামরায় আর কেউ রয়েছে আর কি!)

একবার উঠবেন? বলল সেই ছাত্রী যাত্রিনী। কি বোকা মেয়ে। আমি তো শুয়েছিলাম ওঠবার জন্যেই।

সুতরাং কল্পনায় গোটা-তিনেক সেন্সার দ্বারা নাকচ হয়ে যাওয়া দৃশ্য দেখতে দেখতে কাছে এলুম মেয়েটির বার্থের। বলুন, বললাম আমি। মনে মনে ক্যাসানোভার মতো স্মৃতি-চিত্রে আজকের রাতের ঘটনা কি লিখব ভাবতে থাকলাম।

আপনার কাছে এনট্রোকুইনল হবে? বলল, মেয়েটি, স্টেশনের খাবার আমার সহ্য হয় না। মনে হয় ডিসেণ্ট্রির অ্যাটাক্টা হচ্ছে আবার।

এরই নাম কপাল! রাত, ট্রেনের নির্জন কামরা, আমরা দু'জনে, সেখানে ডিসেণ্ট্রি না হোক ইনডিসেণ্ট্ অনেক কিছু হতে পারত। তাই বলে ডিসেণ্ট্রি! হৃদয়ের সমস্ত অনলে এনট্রোকুইনল সোজা নলের জল ঢেলে দিল আর কি! ফলে পরের স্টেশনে নেমে কামরা খুঁজে খুঁজে ডিসেণ্ট্রির ওষুধ পাওয়া গেল ও এনে দেওয়া গেল। তারপর থেকে ঠিক করেছি ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হলে বলব, রোগটোগ ছেলেদের দিয়েছো দাও, মেয়েদের প্লিজ কোন রোগ দিও না মাইরি। মেয়েরা শুধু থাক প্রেম করবার জন্য। ওদের শরীর থেকে ইনটেস্টাইন, কিডনি, ব্লাডর, বাউয়েল-টাউয়েল সব হটিয়ে দাও, শুধু হার্টটা থাকুক। ঈশ্বর আমার কথা শুনবেন কিনা জানি না। তবে না শুনলে প্রশ্নটা আমি ইউ, এন, ও, তে তুলব ও ভোট দিয়ে পাশ করিয়ে সেক্রেটারী জেনারেলকে পাঠিয়ে দেব ভগবানের সঙ্গে একটা স্বমিট মিটিং করতে। সত্যি বলছি, আই অ্যাম সিরিয়াস্।

আমার বন্ধুর মতে ট্রেনে অনেক পাগল যাত্রীও ওঠে। যেমন, সে হলপ করে বলেছে নীচের ঘটনাটা সত্যি।

ট্রেনে সে যাচ্ছিল মাদ্রাজ! ট্রেন লেট। পাশ ফিরে সে একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে?

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঘড়ির উপর হাত চাপা দিয়ে বলল, বলব না।

বন্ধু অবাক। টাইম জিজ্ঞেস করলে বলবে না এ কিরকম লোক রে বাবা! বলল, কি আশ্চর্য, বলবেন না কেন?

লোকটি বলল, আমি জানি আপনার চাল। আপনি প্রথমে টাইম জিজ্ঞেস করবেন, আমি বলব। তারপর আমার নাম জিজ্ঞেস করবেন, আমি বলব। তারপর আমার সঙ্গে গল্প শুরু করবেন। আমি পরের স্টেশনে চা খাব। তার পয়সা আমাকে দিতে দেবেন না। আপনি নিজেই দেবেন। ফলে পরের স্টেশনে আপনি চা খাবেন, আমি আপনাকে পয়সা দিতে দেব না। তারপর আপনি সিগ্রেট অফার করবেন, আমি দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে দেব। নামবার আগে কৃতজ্ঞ হয়ে আমি আপনাকে দেখা করতে বলব ও বাড়ির ঠিকানা দেব। আপনি একদিন এসে উপস্থিত হবেন। এসে দেখবেন আমার একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। আপনি তার সঙ্গে গল্প করবেন। আপনাদের ভাব হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। তারপর একদিন আপনারা দু'জন বিয়ে করতে চাইবেন! কিন্তু সে ছেলেকে আমি কিছুতেই মেয়ে দেব না, যে হাতে একটা সামান্য ঘড়ি পর্যন্ত পরতে পারে না। বুঝেছেন? সেজন্যে আপনাকে টাইম আমি কিছুতেই বলব না। বলেই ভদ্রলোক ঘড়ির উপর রুমাল বেঁধে বসে রইলেন।

বন্ধু একেবারে ভ্যাবাগঙ্গারাম। ওর মুখব্যাদান কল্পনা করে নিন। বোকাটে ঘোলা মুখটার সঙ্গে শুধু ওর তুলনা চলে কোন মৃত আগ্নেয়গিরির মুখের সঙ্গে। দেখলেন তো, কি বিচিত্র ধরনের যাত্রী হয় ট্রেনে?

সুতরাং ট্রেনে আমার লাক নেই। আমার বন্ধুরও লাক নেই। অথচ অনেকে শুনেছি ট্রেনে আলাপ, প্রলাপ ও প্রেমের পর বিবাহ পর্যন্ত করেছে। শুধু তাই নয়, যে বিবাহের পরিণাম স্বরূপ একটি ছেলে ট্রেনের লাইনে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে বলে শুনেছি। সবই কপাল! অনেকের জীবনে ট্রেন এত প্রমিনেণ্ট যে হাতের রেখা পর্যন্ত ওদের জংসন স্টেশনের মতো হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাড লাক। আমি তাদের চিনি না। আমার থিম সং হল,—"জানে ও ক্যায়সে লোগ থে যিন্‌কা ট্রেনমে প্যায়ার মিলা, হামনে তো যব কাঁলিয়া মাঙ্গি, চয়সেস্ট গাঁলিয়াস"

মোটর-ভ্রমণ আমার ভালো লাগে। তবে সেটা নির্ভর করে কম্পানীর ওপর।

জানলার ধারের সীট আমি আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ মানুষকে ছেড়ে দিতে দেখিনি তবে, মেয়েরা জানলার ধারের সীট সম্পর্কে খুব উৎসাহী নয়। বিশেষ করে মর্ডান হেয়ার স্টাইল সম্পর্কে যেসব মেয়েদের দুর্বলতা আছে। চুল ওড়ে বলে ওরা মাঝেই বসতে চায়। দু'চারজন বিটনিক মেয়ে (যারা নিজেরাই উড়ছে সুতরাং চুল উড়ুক আর না উড়ুক তাতে বিশেষ মাথাব্যথা নেই।) জানলার ধারে সীটে চাইলে আমি দিয়ে থাকি। কেননা মেয়েদের দ্বারা স্যাণ্ডউইচ হতে কার আর খারাপ লাগে বলুন! ধারের সীট দখল করার উপায় জানতে চান? শুনুন ঃ

(১) প্রথমে চড়েই দরজাটা লক্ করে দিন। তারপর সিরিয়াসলি বলুন, লকটা আটকে গেছে খুলতে পারছি না। দেখবেন বাকিরা সুড় সুড় করে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকছে।

(২) বুদ্ধি করে একেবারে শেষে গাড়িতে ওঠবার প্লান করুন।

(৩) শ্রেষ্ঠ উপায়—নিজে গাড়ি কিনুন। লং ড্রাইভে কখনও বাচ্চাদের সঙ্গে নেবেন না। অসময়ে ও অজায়গায় বাচ্চারা নিচের দু'টো কাজ সর্বদা করে থাকে ঃ—

।। এক ।। গাড়ি থামাও জল খাব।

।। দুই ।। গাড়ি থামাও হিসি করব।

সত্যি বলতে, লং ড্রাইভে মেয়ে যাত্রী থাকলেই সুবিধে। প্রয়োজন থাকলেও উপরোক্ত দু'কারণে ওরা থামায় না। দ্বিতীয় কারণে তো প্রাণ থাকতে নয়ই।

এবার আসুন প্লেনে।

প্লেনে ভাইকাউন্ট আর বোয়েয়িং হলে পেছনের সিট নেবেন। ক্যারাভেল হলে সামনে। ফ্রেণ্ডশীপ হলে পেছনে। কারণ ভাইকাউন্টের ও ফ্রেণ্ডশীপের পাখা থাকে সামনে।

বোয়েয়িং-এরও জেট থাকে সামনে। শুধু ক্যারাভেলের জেট পেছনে। ভাইকাউন্ট আর ফ্রেণ্ডশীপ হলে জানলার ধারে সীট নেবেন। কেননা উপরোক্ত তিনটে প্লেনের মধ্যে এটাই বরং নিচু দিয়ে চলে, ফলে পৃথিবী দৃষ্টিগোচর থাকে! বাকী জেট দু'টো এত উঁচুতে চলে যে ফরহ্যান্স টুথপেস্টের ফেনার মতো সাদা সাদা মেঘ আর ব্লু টেরিলিনের মত আকাশ ছাড়া কিছু ছাই দেখাই যায় না। ক্যারাভেলে প্যাসেজের ধারে প্রথম সিটটা নেবেন। লাভ কি? লাভ হল ক্যারাভেলের মাঝের প্যাসেজটা সরু। সুতরাং এয়ার হোস্টেস যতবার যাতায়াত করবে ততবার মৃদু ধাক্কা খাবেন। হলপ করে বলতে পারি আমাদের এয়ার লাইনের হোস্টেসরা সুন্দরী ও সুদেহী! ওদের স্পর্শ বিমর্ষ মোটেই করবে না আপনাকে। আমাকে অন্তত করে না। আর ওদের ছোঁয়া থেকে দূরে থাকব আমি এরকম পিউরিটান নই। অস্পৃশ্যতাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। এইযুগে অস্পৃশ্যতা? ভারতবর্ষ কবে যে জাগ্রত হবে কে জানে!

বোয়েয়িং ও ক্যারাভেলের তিন সিটের অসুবিধাও আছে। প্রথম সীটে বসে জাগ্রত ভারতবর্ষের স্পর্শবিভেদ বিদ্বেষীর পরিচয় দেওয়া যায় বটে, কিন্তু বাকী দু'জন যতবার উঠবে ততবার আপনাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। সে এক জ্বালা। হাঁটুর সামনে দিয়ে একটা পিঁপড়ে যেতে হলেও এ প্লেনে পিঁপড়েকে বলতে হয়, এক্সকিউজ মি প্লিজ। সত্যি বলছি, এই অবস্থা। ঘুমিয়ে পড়লেও যখন পাশের যাত্রী আপনাকে জাগিয়ে বাথরুমে যায় তখন আপনি যে ভাষায় প্লেনকে গালাগাল করবেন সেভাষা ডিক্শেনারিতে পাবেন না।

সেজন্য তিন সিটওয়ালা প্লেন কোম্পানিকে একটি অনুরোধ,—আপনারা হাঁটুর সামনে একটা লোক যেন যেতে পারে ততটা জায়গা রাখুন। এতে সিট সংখ্যা কমাতে হলে কিছু কমান। আর এ সাজেসান গ্রহণ করা একান্ত অসম্ভব হলে প্রত্যেকের সিটের

নিচে যেন একটা করে বেডপ্যান রাখা হয়। নিদেনপক্ষে হাঁটুর কম্পাউণ্ড ফ্রাকচারের চাইতে নির্লজ্জ হওয়া ঢের বেশি ভালো। আপনারাই বলুন।

আরেকটা অনুরোধ। প্লেনে হিন্দীতে ঘোষণা বন্ধ করা উচিত। কেননা শুদ্ধ হিন্দীতে কেউই বলে না।

প্রত্যেক মেয়ে ইংরেজী অ্যাক্সেন্টে হিন্দী বলে। সেটা কমেডি শোনায়। বললে খাঁটি হিন্দীতে বলা উচিত। বিশ্রী হিন্দী বলার পেছনে কমপ্লেক্স আছে। ভালো বলতে পারি না, ইংরেজী ঢং-এ বলি, তার মানে আমি খুব সফিস্টিকেটেড মেয়ে। ঠ্যালা বোঝ!

এ ধরনের কমপ্লেক্স থাকা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও এয়ার হোস্টেসদের বিরুদ্ধে কোন রাগ নেই আমার। কেননা প্লেক্সই ওঁদের কম আছে, তাই বলে সেক্স তো আর কম নেই।

একথা একটি এয়ার হোস্টেসকে বলেছিলাম আমি। বলেছিলাম, সব দোষ মাপ। কেননা আপনি সুন্দরী। আর সবাই জানে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। মেয়েটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সাদা বাংলায় বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার মনে হয় সুন্দর মুখের ভয় সর্বত্র।

বাকি যাত্রাটুকু সেই ভীতু মেয়েটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়েই সারতে হল।

যাত্রাকাণ্ড আমার প্রকাণ্ড হতে পারত। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আপনাদের ধৈর্যভাণ্ড ইতিমধ্যে টইটুম্বুর। সুতরাং আমার ঘুরণ-চণ্ডীর চণ্ডালীকার এইখানেই দাঁড়ি।

॥ মোটাদের স্বপক্ষে ॥

সম্প্রতি সারা বিশ্বে স্থূল নিয়ে হুলস্থূল পড়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, লোটার মতো মোটা একটি মেয়ের নগ্ন ছবি বেরিয়েছে জার্মানীর 'স্টার্ন' পত্রিকায়। সেটা দেখতে সারা পৃথিবীর চোখ সেদিকে টার্ন হয়ে গেছে। কে এই স্থূলাঙ্গিনী হস্তিনী বিবসনা রমণী। কে এই নাদুসনুদুস মেয়েমানুষ? কেন এত হুল্লোড়? বিশদ শুনুন। সবিস্তারে। মেয়েটির মাংসল বিস্তার দিয়েই শুরু করি। তিস্তার সঙ্গে তার বিস্তার তুলনা করা চলে না। গঙ্গার সঙ্গে বড় জোর তার জংঘার তুলনা করা যায়। সম্ভবত এই মেদসাগরের সঙ্গে একমাত্র তুল্য হল বর্ষার বঙ্গোপসাগর। যদি পাহাড় বলেন তবে নন্দাদেবী বলা যেতে পারে। সবচেয়ে উপযুক্ত নামকরণ হয় নাঙ্গা পর্বত। কেননা এই দেবী নাঙ্গাও বটে, পর্বতও বটে। ব্যাপারাটা হল এই : জাপানের ফুজি ফিল্ম জার্মানীর 'স্টার্ন'-এ একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া ঠিক করলে। 'স্টার্ন'-এর বিক্রি হল সপ্তাহে ষোল লক্ষ কপি! ষোল লক্ষ মশাই, ষোলর পিছনে কতগুলো শূন্য কে জানে, তাই সংখ্যায় না লিখে অক্ষরে লিখলাম। ফুজি প্রচার বিভাগকে বলল, নগ্ন মেয়ের ছবি দিয়ে যেন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। স্বভাবতঃ ফুজি চায় পুরুষদের মনে সে ছবি দেখে যেন ফুজিয়ামার মত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। কিন্তু প্রচারকর্তারা দেখলে নগ্ন মেয়ের মডেলের ছবি তো আজকাল সব কাগজের পাতায় পাতায়। সবই তো এক। লোক বিশেষভাবে কেন আকর্ষণ বোধ করবে? একজনের আইডিয়া এল, খুব মোটাসোটা এক মেয়ের নগ্ন ছবি ছাপা যাক। নতুনত্ব হবে। সুতরাং ফটোগ্রাফার খুঁজতে লাগলেন একটি fat but nice মডেলের জন্য। পাওয়া গেল। হামবুর্গে। নরওয়ের এক ছাত্রী হামবুর্গে আর্ট স্কুলে পড়ছিল। সে ছাত্রী দু'হাজার টাকার বিনিময়ে উদোম পোজ দেওয়ার পাত্রী হতে রাজী হল। নাম গার্ড টিংলাম। বয়েস বিশ বছর। উচ্চতা, ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ওজন, ১৬১ পাউণ্ড। মাংসল বিস্তার কত জানেন, বিষম খাবেন না। বুক : ৪৫ ইঞ্চি, কোমর : ৩৯ ইঞ্চি, নিতম্ব : ৪৩ ইঞ্চি। (বিজ্ঞদের মতে প্রকৃত সুন্দরীর ফিগারের আদর্শ মাপ হল ৩৬" ২২" ৩৬") ছবি তুলে 'স্টার্ন কাগজে ফুজি ফিল্মের বিজ্ঞাপন ছাপা হল, সমুদ্রতীরে ছাতা মাথায় এই নাঙ্গা পাড়ার মানে গার্ড টিংলামের নগ্ন ছবি। নিচে লেখা : Take a picture of your sunshine in the sunshine. মানে, আপনার জীবনের সূর্যকিরণের ছবি সূর্যকিরণে তুলে রাখুন। সূর্যকিরণই বটে! না কি বলা উচিত, আপনার হাতী মেরা সাথীকে সূর্যের বাতিতে তাতিয়ে রাখুন। জীবনকে মাতিয়ে রাখুন।'

যাই হোক, ছবি ছাপার পর হুলস্থূল পড়ে গেল। দিনে ২০টি চিঠি আসতে লাগল ভক্তদের কাছে থেকে, দাবী : ঐ ছবিটা আবার ছাপা হোক। জার্মান এয়ারফোর্সের একটা স্কোয়াড্রনে ৩০টি সে ছবির বড় কপি চেয়ে পাঠিয়েছে। জনতার এই দাবী দেখে ফুজি

কোম্পানি ছবিটার ১০ হাজার পোস্টার ছেপেছে ও ৩৫ টাকা করে এক একখানা কপি বিক্রি করেছে। একটি রেকর্ড কোম্পানী মেয়েটিকে একটা ৪৫ আর. পি. এম. রেকর্ড করতে বলেছে ভালো টাকার বদলে। গান জানুক, না জানুক রেকর্ডের কভারে এই নগ্ন ছবিটা থাকলেই হু হু করে বিক্রি হবে রেকর্ড—তাই কোম্পানীর এই অনুরোধ।

এত মোটা মেয়ের এ ছবি কেন এত হৈ চৈ ফেলেছে? কেন এই ছবির এত জনপ্রিয়তা? বিজ্ঞাপনদাতা বললেন, মানুষের মধ্যে বেশির ভাগই আদর্শ চেহারার অধিকারী নয়। ফলে এই ছবি ছাপায় সাধারণ মানুষের ইনফিরিয়টি কমপ্লেক্স, মানে হীনম্মন্যতা বোধ কম হচ্ছে। সবাই বেশ সহজ বোধ করছে। সেজন্য মোটা মেয়েটির এত জয়-জয়কার। কথাটা ভাববার মত। আর্টের জন্ম থেকেই নগ্ন নারী শিল্পীদের প্রিয় বিষয়বস্তু। কিন্তু রেনেসাঁ সব শিল্প-কর্মে দেখুন তখন মোটা নারীদেহেরই বেশি মূর্তি ও ছবি আঁকা হত। নধরকান্তি নারীই ছিল পুরুষদের প্রিয়। অজন্তা, ইলোরা, কোনারক, খজুরাহো এমন কি বাংলা পটেও দেখবেন বিশাল স্তন, দীর্ঘ আঁখি, বিরাট নিতম্ব ও ভারী স্তম্ভের মত পা-ই ছিল তখনকার শিল্পীদের মতে আদর্শ নারীসৌন্দর্য।

আমার মনে হয় সে যুগ আবার ফিরে আসছে। আমরা জেট এজ থেকে মনে হয় প্রবেশ করছি ফ্যাট এজ-এ। হ্যাঁ, কলি যুগ থেকে যাচ্ছি স্থূলি যুগে। দেখুন না, রুচি সবসময়ই ঘুরে আসে। অসভ্য যুগে মেয়েরা জঙ্গলে প্রথম পোশাক পরেছে পাতার কাঁচুলি ও বাকলের লুঙ্গি। এখন আবার মেয়েদের লেটেস্ট ফ্যাশাল হল জামা ও লুঙ্গি। মনে হয় মেয়েদের পোশাক আগামী যুগে হবে শুধু লিপস্টিক আর নেলপালিশ। সে স্বর্ণযুগকে আপাতত ঈর্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। যা বলছিলাম, রেনেসাঁ যুগের মত এবার মোটাদের যুগ এল বলে। য়ুরোপে এসে গেছে। এখানে আর কত দেরি বলুন। হিপিরা এসে গেছে, এবার আসবে হিপ্পিরা। মানে টাকার hippy, যাকে বলে মোটা হিপের মানুষী। বা বলতে পারেন হিপোপটেমাসীরা।

তাই বলি, মোটা না হোন মোটা বিয়ে করুন। ভেবে দেখুন কত লাভ। একটি মেয়েই পাচ্ছেন জীবনে যখন, তখন কেন মাত্র ১০০ পাউণ্ডের মেয়ে নেবেন, maximum ২০০ পাউণ্ডের মেয়ে নিন। ভেবে দেখুন ২০০ পাউণ্ড, তার প্রতিটি ইঞ্চি মেয়ে! দারুণ নয়? বক্সিং-এর জন্য আপনাকে পাঞ্চিং ব্যাগ কিনতে হবে না, শোবার জন্য ডানলোপিলো কিনতে হবে না, হিলস্টেসন দেখার জন্য আপনাকে দার্জিলিং সিমলা বা কাশ্মীর যেতে হবে না—স্ত্রীর অঙ্গেই সারা ভারতের পর্বতমালা দেখতে পাবেন। স্টেশনে আপনাকে কুলি নিতে হবে না, বাচ্চার জন্য কোনদিন গ্ল্যাক্সো কিনতে হবে না, বউ কারুর সঙ্গে পালিয়ে যাবে সে ভয় থাকবে না। আর কত বলব? লাভই লাভ। রোগা মেয়ে মানেই ভোগ। সে আপনাকে হত না করুক, হতভাগা করে তো দেবেই। তাই বলি সুঁটিক মেয়ে ছেড়ে মুটকি ধরুন। মুটকির কাছেই পাবেন আপনার ড্রিম কী (dreamkey)। এমন কী ঈশ্বর না করুন আপানার চোখ খারাপ হলে হয়তো আপনার রোগা স্ত্রী হলে তাকে দেখতেই পাবেন না। কিন্তু মোটা হলে? পঞ্চাশ পার্সেণ্ট দেখতে পেলেও সেটা কি কম হল? অর্ধেক বউ তো দেখতে পারেনই। না—দেখার চাইতে অর্ধেক কি কম? এছাড়া মোটা মেয়ে হলেই সে ডায়েটিং করতে চাইবে। ফলে খাওয়ার খরচও কম। সিরিয়াসলি ভাবুন।

আর মনে রাখবেন, মোটা মানেই মোটাবুদ্ধি নয়, বরং রোগা পটকারা বেশি চতুর ও যাকে বলে বিপজ্জনক। মোটাদের মনের উদারতা তাদের মেদের উদারতার মতই বিশাল। রোগারা ডেঞ্জারাস। দেখুন স্বয়ং সেক্সপীয়র পর্যন্ত সে কথা বলে গেছেন। জুলিয়াস সিজার-এ সিজারের স্ত্রী ক্যালপুর্নিয়া যখন স্বামীকে ভয়াবহ স্বপ্নের কথা বলেছিলেন তখন সিজার নির্ভয়ে রোমের এক জনসংগমে এসে চারদিকে লোকজন দেখে এণ্টনিকে বলেছিলেন—

Let me have men about me that are fat ;
Sleek-headed men, and such as sleep o' nights,

Your Cassius has a lean and hungry look ;

He thinks too much. Such men are dangerous.

দেখলেন তো? উনি বলেছেন—আমার চারদিকে মোটা লোকেরা থাকুক। ক্যাসিয়াসের চেহারা রোগাটে আর দৃষ্টিতে বুভুক্ষুতা, এ ধরনের লোকেরা ভয়ঙ্কর।

Such men are dangerous ঃ তবেই দেখুন। উনি বলতে চান ছিপ্‌ছিপে চেহারা মানেই মিচ্‌ মিচে শয়তান।

আর থল্‌ থলে মনুষ্যগজরাই হল দিগ্‌গজ। মেদালয় মানেই মহাশয়। মেয়েদের বেলাতেও তাই। গজগামিনীরাই আপনার ভালো সহধর্মিনী হবে, মাতঙ্গিনীরাই হবে শ্রেষ্ঠতম অর্ধাঙ্গিনী। ভীমকায়া স্ত্রীই হবে আপনার ভীমপলশ্রী।

মোটা পুরুষরাও সাধারণত শান্ত স্বভাবের হয়। চিড়্‌ চিড়ে বা খিট্‌খিটে মোটা মানুষ কম দেখবেন! মোটা মহাশয় এত শান্ত যেন এক একজন প্রশান্ত মহাশয় বা বলতে পারেন প্রশান্ত মহাসাগর।

মোটারা মারপিট কম করেন। ডাকাত, গুণ্ডা, চোরের মধ্যে মোটা আপনি পাবেনই না। এমন কি ঈশ্বরদের মধ্যে যে দুজন সবচেয়ে লাভেব্‌ল্‌, মানে যে দ'জনকে বড় লক্ষ্মী ভগবান মনে হয়, তাঁরা দ'জনই ভুঁড়িওয়ালা। আমি শিবঠাকুর আর গণেশ বাবাজীর কথা বলছি। একজন ভোলানাথ, অপরজন সিদ্ধিদাতা। এ-ও বলতে পারেন একজন সিদ্ধি খান, অপরজন সিদ্ধি দেন। লোকে বলে হিপির জন্মস্থান আমেরিকা। ক্যরুক সাহেব নাকি এর জন্মদাতা। বাজে কথা। আদি হিপিতো আমাদের শিবঠাকুর। সত্যি বলছি, উনিই আদি হিপি। আজকালকার হিপিরা তো নকল মশাই। আমাদের শিবের কাছে এরা নেহাতই শিবা। ঈশ্বরের কথা বাদ দিয়ে আসুন নশ্বরদের কথাই বলি। মেয়েরাও যদি সুখী হতে চান তবে মোটা স্বামী খুঁজুন। মনে রাখবেন, রোগা মানুষরা হল ছেলে মানুষ, আরা মোটা মানুষরা হল গোটা মানুষ, মানে ভালোমানুষ। যদি সারা জীবন কোঁদল নিয়ে কুৎ-কুৎ না করতে চান, তবে আজই পাকড়াও করুন কোন হোঁদলকুৎকুৎকে।

কদর দেখে নয়, নধর দেখে স্বামী ধরুন। উতোর মতো (মানে উত্তমকুমারের মতো) বা সুতোর মতো স্বামী খুঁজবেন না। হিমের হিমানী হওয়ার চাইতে কোন ভীমের ভামিনী হওয়া ঢের ভালো। যদি সিংহই চান তবে কোন সরু সিংহকে বিয়ে না করে কোনো দারা সিংহকে বেছে নিন। স্বামী যেন কোন ধনীর গ্রাণ্ডসনই শুধু না হয়, সে যেন স্যামসনও হয়। ফুলের মত নরম মনের স্বামী চান তো স্থূলের মধ্যেই তাকে পাবেন। উদর দেখে তবে সিঁদুর পরুন। মনে রাখবেন ভুঁড়িতেই রয়েছে আপনার জীবনের ভুরি ভুরি আনন্দ। সুতরাং মেদের জন্য জেদ করুন। সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন—

গদি যদি রাখতে চাও
হাতীর মতো সাথী দাও।

আর পুরুষগণ আপনারাও একইসঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠুন—

মোটা মোটা কনে চাই,
নইলে চল বনে যাই।

ক্ষীণপ্রস্থ মেয়ের চাইতে বানপ্রস্থ অনেক ভালো।

মোটাদের পক্ষে বচন ফকিরের কলকের ধোঁয়া এখানেই মিলিয়ে গেল। মোটা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করলাম। জার্মানীর সেই উলঙ্গিনী মাতঙ্গিনী গার্ড টিংলামের ছবি দেখে আনগার্ডেড মুহূর্তে কলমের এই বাকচপলতা নিজগুণে মার্জনা করবেন। যদি পারেন ছবিটা দেখে নেবেন যথাস্থান থেকে, তারপরে দেখে বলুন তো, হৈ-চৈ ফেলে দেয়া ছবিটা আপনাদের বাকপটু করে তোলে না, বাক্‌হীন?

নমস্কার।

॥ জুতো ॥

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শচীন ভৌমিক সবজান্তা এতটা বড়াই মানাবে না। জ্যাক অফ অল ট্রেড, বাট্ মাস্টার অফ সাম্ (নান নয়!) বলতে পারেন। জুতো থেকে পা, পা থেকে জানু, জানু থেকে কটী পর্যন্ত ভালোই জানি। মানে আপাদমস্তক না জানলেও, আপাদকটী জানা আছে। জনান্তিকে বলি, বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী জানার প্রয়োজন কি? কিন্তু পা নিয়ে পাধা নিসা নয়, জুতো নিয়ে জুৎসই নকসী কথার পাঁচালী লেখার জন্য কলম ধরেছি আজ। হ্যাঁ মশাই, জুতোর আলোচনা করবে শচীন ভৌমিক, বা জুতোর সুলোচনা বলতে পারেন। হ্যাঁ SHOE লোচনা। বুঝেছেন?

জুতো কবে আবিষ্কার হয়েছিল আমার জানা নেই। রামায়ণ মহাভারতের কালেও জুতো ছিল। তার অনেক প্রমাণ আছে। তবে? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন হবুচন্দ্রের রাজত্বকালে জুতো আবিষ্কার হয়েছিল। পড়েন নি জুতোর জন্মকাব্য? কবিতার নাম 'জুতা-আবিষ্কার'।

কহিলা হবু 'শুন গো গোবু রায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র।
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী-মাঝে চরণ ফেলা মাত্র।
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি অনাসৃষ্টি।
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।'

পুরো রাজ্যে বিপদ দেখা দিল। পণ্ডিতের 'হইল মুখ চুন।' হবে না? গভীর সমস্যা। অনেক অজুহাত শোনান হল রাজাকে। ধুলো না থাকলে 'পায়ের ধুলো' কি করে পাওয়া যাবে। মাটি না থাকলে শস্য' গজাবে কি করে? কিন্তু রাজা এ সব যুক্তিতে খুশী নন। কি উপায়?

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাটা সাড়ে-সতেরো লক্ষ,

ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ ও বক্ষ।

রাজা রেগে যেতেই 'একুশ লাখ ভিস্তি' পথ এত ভিজিয়ে দিল যে সব মাটি কাদা হয়ে গেল! রাজা রেগে আগুন। কতশত উদ্ভট পরামর্শ এলো। যেমন রাজাকে ঘর থেকে বার কর। বন্ধ করা হোক, 'মহী মাদুর দিয়ে' ঢাকা হোক. 'চমর্ দিয়ে মুড়িয়া দাও পৃথ্বী'—এ পরামর্শও এলো; তাহলে নাকি 'ধুলির মহী ঝুলির মধ্যে ঢাকি, মহীপতির মহীকীর্তি' থেকে যাবে! কিন্তু তখনই ধীরে রাজার কাছে এল চামার-কুলপতি। বলল—

বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দু'টি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।

ব্যাস—এই হল জুতো আবিষ্কারের কাহিনী। কবিগুরু কবিতা শেষ করেছেন—

সেদিন হতে চলিল জুতা পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।।

সত্যি বলতে—আমার গভীর বিশ্বাস, এরকম কোন সূত্র ধরেই জুতো আবিষ্কার হয়েছিল। সেই থেকে, পা যেমন আমাদের শরীরের অঙ্গ, সেরকম পাদুকাও শরীরে প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। যেমন শরীর ঢাকার জন্য বস্ত্র, সেরকই পা ঢাকার জন্য পদ-বস্ত্র, পদাবরণ। এই পদাভরণই হল পাদুকা, মানে জুতো।

আমাদের প্রাচীন সভ্যতায় জুতোর কদর ছিল। সাহিত্যে তার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। পাদুকা মুকুটের চেয়ে কম নয়। কোন অংশেই নয়। পাদুকার স্থান সিংহাসনেও হতে পারে। হয়েও ছিল। মনে করে দেখুন, কৈকেয়ী রামকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন দশরথকে বলে, কেননা তাঁর পুত্র ভরত যাতে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে পারেন। কিন্তু ভরত কি করেছিলেন? বড় ভাই রামের পাদুকা এনে রেখেছিলেন সিংহাসনে। নিজে কোনকালেই বসেননি। ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। দেখলেন তো জুতোর কি সম্মান দেওয়া হয়েছিল?

মহাভারতে জুতোর যে প্রসঙ্গ রয়েছে সেটা মহাভারতে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। লোকমুখে বানানো কাহিনী। বেদ ব্যাস লেখেননি, শ্রীগণেশ অনুলেখন করেন নি। না, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যত সংস্করণ বেরিয়েছে, কেউ এই ঘটনা লেখেন নি। তবুও এই মুখোরোচক উপকথা অনেকেই জানেন। সারমেয় জন্তুর মৈথুন কালে যে দীর্ঘ ও অদ্ভুত সংযুক্তি আমাদের সাধারণতঃ বিরক্ত বিব্রত লজ্জিত (জন্তুদের নিজের মোটেই নয়!) করে, সেটার জন্য নাকি পাণ্ডব ভাইদের শাপ হল আসল কারণ। কেন কুকুরকে শাপ দিয়েছিলেন পঞ্চপাণ্ডব? কারণ সেই জুতো। লোক কাহিনী হল এইরকম।

যখনই পাণ্ডব ভ্রাতাদের যে কোন একজন দ্রৌপদীর শয্যাঘরে প্রবেশ করতেন তখন জুতো বাইরে রেখে যেতেন। সুতরাং অন্য কোন ভ্রাতা সে জুতো দেখে বুঝতে পারতেন, যে অন্দর মহলে একজন গিয়েছেন, সুতরাং অন্য কেউ কখনই প্রবেশ করতেন না। একবার নাকি একটি কুকুর জুতো জোড়া মুখে করে সরে যায়। ঘরে দ্রৌপদী একা ভেবে অন্য এক স্বামী যখন প্রবেশ করে ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসেন, তখন সেই লজ্জাজনক পরিস্থিতির জন্য দায়ী জুতো-চোর কুকুরটির উপর অগ্নিশর্মা হয়ে পাণ্ডবরা শাপ দিলেন মৈথুন কালে 'তোদেরও লজ্জাজনক পরিস্থিতির সাজা পেতে হবে।' সেই থেকে নাকি কুকুররা মৈথুন কালীন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে আসছে।

দেখলেন তো রামায়ণ হোক বা মহাভারত, দুটোতেই পাদুকার কি অসামান্য ভূমিকা।

শুনেছি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর খুবই সৌখীন লোক ছিলেন। উনি নাকি জুতোতে হীরে বসিয়েছিলেন। ভাবুন জুতোতে হীরে! পঞ্চাশ দশকের একজন বিখ্যাত পিয়ানো বাদকের নাম ছিল লিব্রাচি। তাঁরও সখ ছিল জুতোতে হীরে লাগানো। টুপি থেকে জুতো পর্যন্ত দামী হীরে পান্না চুনী বসানো থাকতো তার সব পরিধানে। ময়ূরের মতো এত বেশি অলংকার পরতেন ভদ্রলোক যে কমিক লাগতো দেখতে। প্রেসলে, আমাদের এলভিস বা পেলভিস প্রেসলেরও জুতোপ্রীতি ছিল অসাধারণ। আজকের হলিউড অভিনেত্রী গ্লেন ক্লোজ ও মোর, দুজনই বিশ পঁচিশ জো ড়া দামী জুতো কিনে থাকেন এক একবারের শপিং-এ। অবশ্য এসব কিছুই লাগে না খন, ফিলিপাইনের ডিকটেটর মার্কোসি-এর পতনের পর তাঁর প্রাসাদে তাঁর স্ত্রীর দুশো জোড়া জুতো পাওয়া গিয়েছিল। গিনিস্ বুক্স্ অফ রেকর্ডে ইমেল্ডা মার্কোসি-এর নামই সবাধিক জুতো সংগ্রহকর্ত্রীর তালিকায় শীর্ষে ছাপা হবে। ভদ্রমহিলার নাম ইমেলডা না হয়ে হওয়া উচিত ছিল SHOE নন্দা SHOE হাসিনী নাকি SHOE মিত্রা? জুতোর উপর হীরে বসিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ আর লিব্রাচি। কিন্তু জুতোর ভেতরে হীরে লুকিয়ে রেখে চোরাকারবার অনেকদিন ধরে চলছে। স্মাগলারদের কাছে জুতোর খুব কদর। জুতোর ফাঁপা ফল্স হীলের মধ্যে প্রচুর হীরে ভরে চোরাকারবার চালাতে ওস্তাদ এরা। কাস্টম্স ধরেছে অনেক, অনেক ধরা পড়েওনি। বলতে ভুলে গেছি, আমাদের প্রাক্তন প্রাইম-মিনিষ্টার রাজীব গান্ধীরও সৌখীন জুতোর সখ। বিশ্ববিখ্যাত ও দামী 'গুস্যি'র জুতো উনি ব্যবহার করেন। তার মানে প্রাইম-মিনিস্টার থেকে ক্রাইম-মিনিস্টার (মানে স্মাগলার) সবার কাছে জুতোর যথেষ্ট মূল্য আছে। ধর্মক্ষেত্রেও জুতোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এদেশে নয়। বিদেশে। আমাদের হোলি উৎসবে যেমন আগুন জ্বালানো হয়, সেরকম বেলজিয়ামে পুরনো জুতো জ্বালিয়ে এক ধরনের উৎসব হয়। ভাবুন কি কাণ্ড!'

আমাদের হোলির আগুন জ্বালানো হয় শ্রীকৃষ্ণের পুতনা রাক্ষসী বধের রূপক হিসেবে। অন্য এক প্রচলিত কাহিনীতে প্রহ্লাদের মাসী হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে প্রহ্লাদকে বাঁচিয়ে নিজে আগুনে জ্বলে পুড়ে মরার প্রতীক হিসেবে হোলির বনফায়ার জ্বালানো হয়। কিন্তু বেলজিয়ামে পুরনো জুতো জ্বালানোর উৎসবের উৎস কাহিনী আমার জানা নেই। তথ্যসংগ্রহ উৎস অবশ্য আমার জানা আছে। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়াতে ছাপা হয়েছে— In Belgium Holilike festival is celibrated. People turn old shoes.

সাহিত্য ক্ষেত্রে জুতোর মূল্য কম নয়। কবিগুরু স্বয়ং তো বিখ্যাত 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতাটি লিখেছেন, যার উল্লেখ আগে করেছি। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে জুতা সংক্রান্ত একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার হাওড়ার কোন অনুষ্ঠান শেষে শরৎচন্দ্র দেখতে পান তাঁর একপাটি জুতো উধাও। অনেক খুঁজেও পেলেন না। উনি ভাবলেন কোন চোর চুরি করেছে। কলকাতা হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে ফিরে যাবার সময় ভাবলেন বেটা চোর অন্য পাটি জুতো যেন কোনদিন না পায়, এক পাটি নিয়ে বেটার কি আর লাভ হবে? চোরকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র অন্য পাটি জুতোটা গাড়ি থেকে ছুড়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। পরদিন হাওড়ায়, বলাবাহুল্য, চৌকীর তলায় অন্য পাটি জুতোটা পাওয়া গেল! চোরের বদলে নিজেই শাস্তি পেলেন লেখক। বলুন, মজার কাণ্ড নয়? কাহিনীকার বিমল মিত্রের বিখ্যাত 'সাহেব বিবি গোলাম' সবাই পড়ে থাকবেন, সিনেমাও দেখে থাকবেন। সেখানে বড়বাবুর জুতোপ্রীতির ঘটনাটা মনে

আছে? একবার বাঈজী বাড়ি থেকে ফিরছেন ফিটন গাড়িতে, বাড়ির সামনে দেখলেন বৃষ্টির জন্য জলকাদা, জুতো নোংরা হবে। উনি কি করলেন তখন। ভৃত্যকুলকে বললেন, বাড়ির সিংহদ্বার ভেঙে দিতে। ভৃত্যরা প্রভুর আদেশ পালন করলেন। উনি ফিটনে অপেক্ষা করলেন। ভাঙার পর ফিটন বাড়ির শুকনো বারান্দা পর্যন্ত চলে এল। তখন গাড়ি থেকে বারান্দায় নেমে গেলেন বড়বাবু। গেট ভাঙা যেতে পারে, কিন্তু জুতো নোংরা করা চলবে না। এই না হলে জমিদার কিসের। জুতোর মহিমা দেখলেন। পরে অবশ্য বিমলবাবু বড়বাবুর লাইফ স্টাইলের আইরনি (irony) দেখিয়েছেন। বড়বাবু বাড়ি থেকে চিরকালের মতো চলে যাবার সময় জুতো খুঁজে পাননি। একজোড়াও নয়। বড়বাবুকে নগ্নপদেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল! এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি আর হতে পারে বলুন। প্রয়াত লেখক সুবোধ ঘোষও চটিকে সাহিত্যে উল্লেখ করেছেন! একটি উপন্যাসে ভীতা স্ত্রীর স্বামী সহবাসে অনীহা ছিল কিন্তু রোজ রাত্রিরে আতংকিত অসহায়ার মতো অপেক্ষা করতো স্বামীর চটির আওয়াজের জন্য। স্টাডি থেকে কাজ সেরে স্বামী আসতেন জোর করে স্ত্রীধর্ম আদায় করতে। এমন চমৎকার বর্ণনা করেছিলেন যে চটির আওয়াজ আক্রমনোদ্ধত একটি মাংসাসী জন্তুর পদশব্দের মতো মনে হতো। স্বর্গতঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত তাঁর বেশির ভাগ লেখায় ধনাঢ্য চরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়ই হরিণের চামড়ার চটি'র উল্লেখ করেছেন। আপনারা জানেন বিদ্যাসাগরের মতো মহান ব্যক্তির নাম জুতোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমাদের বিখ্যাত, সামনে উর্ধ্বমুখী, বাঁকানো, বিদ্যাসাগরের চটি। সাহেব টেবিলের পরা জুতো রেখে কথা বলেছিলেন বলে তার প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের টেবিলের উপর তাঁর বিখ্যাত চটি রেখে সে সাহেবের সঙ্গে কথা বলার বিশেষ ঘটনা বাঙালী মাত্রেরই জানা। এই বিদ্যাসাগরী চটিকে চটি বলতে পারেন, চপেটাঘাতও বলতে পারেন। টিট্ ফর ট্যাট আর কি! বিদ্যাসাগরের চটি নিয়ে একটি মজার কৌতুকী আছে। ঘটনাটি বলা বাহুল্য কাল্পনিক। কিন্তু রসিক পাঠকদের ভালো লাগবে। ঘটনাটা হল বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখলেন বিদ্যাসাগরমশাই আসছেন। নজরে পড়ল তাঁর চটিজুতোর দিকে। বঙ্কিমবাবু সামনের দিকে ওল্টানো চটি দেখে বলে উঠলেন—

বিদ্যার সাগর কেন উর্ধ্বমুখে ধায়?

বিদ্যাসাগর জবার দিলেন—

চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ হলে বঙ্কিম হয়ে যায়।

এটাও সেই ইটের বদলে পাটকেল। টিট ফর ট্যাট্! বলাবাহুল্য ঘটনা কাল্পনিক। ছোটবেলায় মৌচাক পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর গল্প পড়েছিলাম। গল্পটির নামটা ছিল 'সুশিক্ষা না Shoe শিক্ষা'। চমৎকার ছোটদের গল্প। উনি বলতে চেয়েছেন কিন্তু বাচ্চাদের শায়েস্তা করার জন্য জুতো পেটা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজীতে বলে — স্পেয়ার দ্য রড্ এণ্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড। একই কথা। সুশিক্ষা দেওয়া জন্য প্রয়োজন হলে Shoe শিক্ষা দিতে হয়। তাতে কাজ হয়।

জুতো আমাদের ভাষায় নানা প্রয়োগের শব্দ। যেমন—জুতিয়ে পাট করে দেওয়া, জুতো দিয়ে পেটানো উচিত। মারব মুখে জুতো দিয়ে, একশ ঘা জুতো দিয়ে মারা, বড়লোকের জুতো চাটা ইত্যাদি। হিন্দীতে অনেকে বলে—যদি ঝুট্ বলে থাকি তবে, 'আপকা জুতা ঔর মেরা শর। মানে সহজবোধ্য. জুতো যে হাওয়াই হতে পারে তা নয়, জুতো দাওয়াইও হতে পারে। হ্যাঁ, মশাই। দাওয়াই। মৃগী রোগীদের জুতোর তলা শুঁকতে দেয়া হয়। জুতো শুঁকলে রোগী সেরে ওঠে। জুতো মাথায় চড়ে কিনা জানিনা কিন্তু মৃগীদের নাকে নিশ্চয়ই চড়ে থাকে। জুতো টেবিলেও চড়েছে। আপনার আমার—বাড়ির টেবিলে নয়, ইউ. এন. ও.র টেবিলে। মনে নেই, সেই ঐতিহাসিক

ঘটনা? আমাদের ক্রুশ্চেভ সাহেব ইউ. এন. ও.-তে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সেই অসভ্য ব্যবহারটি করেছিলেন। পা থেকে এক পাটি জুতো খুলে নিয়ে টেবিলে থপ থপ করে বাজিয়েছিলেন। রাজনৈতিক জুতোর কাহিনীর কি অন্ত আছে!'

কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমন জুতো টানলে পা আসতে বাধ্য। আপনার পা সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি? জানেন আপনার বয়েস যখন সত্তর বয়েস তখন আপনার পা—They will have walked the equivalent of three times around the world. বিশ্বাস হচ্ছে না কিন্তু সত্যি। পায়ের বোঝা নির্ভর করে বুড়ো আঙুল আর পায়ের গোড়ালির উপর, যাকে ইংরেজীতে বলে বিগ্ টো-আর বল্ অফ দা ফুট। পা সম্পর্কে আরেকটু জ্ঞান দিচ্ছি।

In supporting the weight of the body, the feet have to take a considerable strain. To cope with this they have a complex structure of bones, muscles, sinews and nerves. Each foot contain 26 small, very delicate bones—the highest concentration of bone structure in the human body. To keep the bones in this correct position and provide elasticity, there are four times ligaments and muscles as there are bones.

বুঝেছেন, পা হেলাফেলার অঙ্গ নয়। পা তৈরী করতে ঈশ্বরের খুবই মেহনত করতে হয়েছে। সেজন্য কোন কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য—'মাই ফুট্'! বলবেন না। কেননা আপনার ফুট্ বা ফিট্ খুবই বৈজ্ঞানিক প্রণালীসিদ্ধ সৃষ্টি। আমাদের অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তুচ্ছ মোটেই নয়। পায়ের নিজস্ব একটা রূপ আছে। গুরুজনদের পা প্রণম্য। আমাদের সভ্যতার সংস্কৃতির মার্গে শ্রদ্ধা জানানোর পদ্ধতি হল পদসেবা, পদধূলি নেয়া, পদোদক পান করা। চিঠি শুরু করা হয় পদবন্দনায়—শ্রীচরণকমলেষু দিয়ে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের পা খুব সুন্দর ছিল। সেজন্য দীনেশ দাসের কবিতা পড়তে ভালো লাগে—

তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোনখানো রাখবো প্রণাম।

চলচ্চিত্র জগতে নায়িকাদের ক্ষেত্রে মধুবালার পা খুব সুন্দর ছিল। দুঃখের কথা ওয়াহিদা, মীণাকুমারী ও হেমামালিনীর পাকে পদশ্রী বা পদকমল বলা যাবে না। লক্ষ্মীর পা বলতে পারেন শ্রীদেবীর, আর নতুন নায়িকা ভাগ্যশ্রীর। হলিউডে এসথার উইলিয়মস্ এর পা সুন্দর ছিল। আজকের দিনে বো ডেরেকের সুশ্রী চরণশ্রীর চর্চা আছে। চীনে আগেকার দিনে মেয়েদের পা কাঠের জুতো পরিয়ে ছোট রাখা হতো। কেননা ছোট পা নাকি সৌন্দর্যের প্রতীক। একে কঠোর অত্যাচার বলা যায়। সবই ভিন্ন দেশের ভিন্ন রুচির ব্যপার। পা নিয়ে কাব্যচর্চা হয়েছে অনেক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাকো নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর। পরানবল্লভ,
তোমার কোমলকাণ্ড চরণ পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে যায় জীবন তরীতে,
কোন ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

হিন্দী ছবি 'পাকিজা'তে রয়েছে—ট্রেনে নায়ক উঠে দেখলেন নায়িকা ঘুমিয়ে আছেন। আঁচলে মুখ ঢাকা, শুধু পায়ের পাতা দু'টি দেখা যাচ্ছে। নায়ক পরবর্তী স্টেশনে নামবার আগে নায়িকার পায়ের আঙুলের ফাঁকে একটি ছোট্ট চিঠি রেখে গেলেন।

অনেক পরে নায়িকা জেগে উঠে চিঠিটা পড়লেন। লেখা আছে—'আপকা পাও দেখে, বহোৎ খুবসুরৎ হ্যায়। ইসে জমীনসে মৎ উতারিয়েগা। ময়লা হো জায়েগা।

হামরাহী'

মানে—আপনার চরণযুগল দেখলাম। খুব সুন্দর। এ দু'টোকে মাটিতে নামাবেন না। ময়লা হয়ে যাবে।

সহযাত্রী।

রোমাঞ্চিকতার চূড়ান্ত নয়, আপনারাই বলুন। রবীন্দ্রনাথের অমর কবিতা 'বিজয়ন'তে আছে স্বয়ং মদনদেব, অনঙ্গদেব যৌবনবতী রমণীর বক্ষে পুষ্পবাণ না মেরে পদপ্রান্তে 'পুষ্পধনু, পুষ্পশরভার' সব সমর্পিত করেছিল। আগে থেকে শুনুন—

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিল রূপসী ;
ত্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে ; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরেত্থ
উরু পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার ; সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে ; ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনে মতো রহিল পড়িয়া ;
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

তখন ? ত্যজিয়া বকুলমূল অনঙ্গদেব উঠলেন মৃদুমন্দ হাসিয়া। উনি কি করলেন ?

...... ভূমি 'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্প যার ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপাচার
তূণ শূন্য করি।

দেখলেন তো রূপসীর কি অসীম ক্ষমতা। স্বয়ং কামদেব নায়িকার 'পদপ্রান্তে' সব ধনুকবান পূজা উপাচারের মতো সমর্পণ করে দিল। সুন্দরী রমণীর পা পূজোর যোগ্য।

প্রেমের জন্য এই পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণের রকমফের এ যুগেও আছে। সেটা হল রূপসী যৌবনবতী কন্যার জুতো খুলে তাতে শ্যাম্পেন ঢেলে পান করা। আমি নিজে এরকম প্রেমপূজারী দেখেছি সচক্ষে, এই অতি রোমান্টিকতার সাফল্যও দেখেছি। যৌবনে শাম্মি কাপুর জনৈকা তারকারানী ঠাকুরানীর এক পাটি জুতো খুলে তাতে শ্যাম্পেন ঢেলে খেয়েছিলেন। নায়িকা উচ্ছ্বসিত, এত ভালোবাসা। আমাকে ? শাম্মি তো শুধু জুতো

খুলেছিল, বাকি সব, বলা বাহুল্য, মুগ্ধমতী নিজেই খুলেছিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নায়িকাকে কি বিজয়িনী বলবেন, না নায়ক বলবেন বিজয়ী। এ সমস্যার সমাধান আপনারাই করুন।

আমার ছেলে বোম্বে শহরে জন্মেছে ; গ্রাম ট্রাম দেখেনি। ছোটবেলায় মহারাষ্ট্রের গ্রাম দেখে সবচেয়ে অবাক হয়েছিল অল্প জলে দাঁড়ানো বক দেখে। ধ্যানী বুদ্ধের মতো বকটা এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলের কৌতূহল ছিল—বকের কি একটাই পা। বললাম, না। তারপর বকের বিখ্যাত গল্পটা শোনালাম। একজন জঙ্গলের ফরেস্ট অফিসার বাটলারকে বলেছে হাঁস মুরগী না পাও বক সারস যা পাও রান্না করবে। বাটলার বক ধরে সেটাকে কেটে রান্না করলো। খাওয়ার সময় সাহেব বললেন, একটা লেগ্ কেন, হোয়ের ইজ দ্য আদার লেগ্? বাটলার আসলে একটা ঠ্যাং খেয়ে নিয়েছিল? সে মিথ্যে বলল, স্যার দিস্ বক—বার্ড হ্যাড ওয়ান লেগ্ ওনলি। এই বকটার নাকি একটাই ঠ্যাং ছিল! সাহেব চুপচাপ খেয়ে নিল। পরদিন শিকারে বেরোতেই সাহেব দেখল ঝিলের জলে এক পায়ে একটা বক দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে ছিল বাটলার আবদুল। সে বলল, লুক স্যার, ওয়ান লেগেড বার্ড। সাহেব বলল, আচ্ছা। দাঁড়াও দেখছি। সাহেব 'হুস' করে আওয়াজ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বকটা উড়ে গেল। স্পষ্ট বকের দুটি পাই দৃষ্টিগোচর হল। সাহেব বললেন, কি? দুটো পা তো দেখা গেল। বলো এবার।

আবদুল নির্ভয় কণ্ঠে জবাব দিল, খাবার সময় আপনি তো 'হুস' করেননি। করলে দু'টো পাই বেরিয়ে আসতো। সাহেব বুড়বাক।

যা বলছিলাম আমার ছেলেকে এই বকের গল্প শুনিয়ে ম্যানেজ করতাম। সেসব ওর ছোটবেলার কথা। এখন অবশ্য বকের গল্পে ছেলেকে ভোলানো যায় না। এখন ওর মুখে বকের নাম নয়, খালি শোনা যায় রিবক্-এর নাম! হ্যাঁ, বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন জুতো—রিবক্। এখন জুতো চলে ব্র্যাণ্ডের নামে। রিবক্, নাইকে, আদিদাস্। লোটো থেকে বাটার পাওয়ার পর্যন্ত। যদিও শ্রমমূল্য কম করার জন্য বেশীর ভাগ পশ্চিমী জুতো কোম্পানির জুতো তৈরি হয় ফিলিপাইনস্, থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া ও তাইওয়ানে। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি পাম্পস্, অক্সফোর্ড, কেড্স, কাবুলী চপ্পল, গামবুট, হাওয়াইয়ান রবারের চপ্পল, ক্রিকেটারদের ও ফুটবল খেলোয়াড়দের জুতো, বিদ্যাসাগরী চটি, জরির কাজ করা মুজরো এইসব। হ্যাঁ, কাঠের খড়মও দেখেছি। ব্যাস। এই পর্যন্ত। এখন অবশ্য জুতোর জাতই আলাদা। স্পোর্টস্, জগিং সু থেকে বেশীর ভাগ জুতো এখন ইউনিসেক্স। মানে ছেলে ও মেয়েদের জুতোর কোন তফাৎ নেই। এথলেটদের বিভিন্ন জুতো থেকে শুরু একুয়াপ্রেসার রাবারের জুতো, কত কি! সবাই কিন্তু উভলিঙ্গ, মানে ছেলেমেয়ে সবার পায়েই বিরাজমান হবার যোগ্য। দেখুন আজকার হাঁটু-কাটা এসিড্ ওয়শেড্ জিন্স, জাপানী ইলেকট্রনিক্স-এর মিউজিক সিস্টেম (সি.ডি. থেকে লেজার ডিস্ক্), ইটালীয়ান শার্ট, ফরাসী পারফিউম, জার্মান মোটরগাড়ি, ক্রিশ্চিয়ান ডায়র (ফ্রেঞ্চ) বা কাজাল্ (জার্মান) রোদ-চশমা—এসবগুলো হল একুশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার প্রধান সামগ্রী। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে পদযুগলের জন্য—রিবক্ জুতো। শরীরে সুস্থতার জন্য অবশ্য 'ইণ্ডিয়ান যোগ্যা' মানে—ভারতীয় যোগব্যায়াম।

চলচ্চিত্র জগতে জুতোর অবদান কম নয়। ব্যালে নৃত্যের উপর তৈরী বিখ্যাত চলচ্চিত্রের নাম হল—'রেড সুজ্'। ময়রা শিয়ারার অপূর্ব ব্যালে নৃত্য আছে ছবিতে। মূল কাহিনী হল স্বামী, যিনি কম্পোজার, তাঁর সঙ্গে গৃহবন্দী হবেন, না ব্যালে প্রীতির নিদর্শন লাল জুতোর পৃথিবীতে নৃত্যশিল্পী হিসেবে নর্তকী জীবনকেই আপন করে নেবেন, এই দুই মানসিকতার দ্বন্দ্ব। বিখ্যাত আলোক-চিত্রশিল্পী জ্যাক কার্ডিফের অপূর্ব

ফোটোগ্রাফী ফিল্মটিকে অমর করে রেখেছে। রেড সুজ্ ছাড়া সিণ্ডারেলার মধুর প্রেম ও প্রতিরোধের কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে জুতোর নামে। ছবিটির নাম 'দি স্লিপার অণ্ড দি রোজ'। এছাড়া একটি ডিটেক্টিভ কমেডি ছবি হয়েছিল যার নাম 'দি ম্যান উইথ ওয়ান রেড্ সু'। আত্মভোলা একটি চরিত্র যে এক পায়ে কালো আর অন্য পায়ে লাল জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাকে নিয়ে গল্প। আরেকটি ছবি হয়েছিল যার নাম 'দি গোল্ডেন স্লিপার'। এককালে এই নামে কলকাতায় একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ ছিল। বিখ্যাত জাপানী পরিচালক একিরী কুরোসোয়া একটি ছবি করেছিলেন যার নায়ক জুতো তৈরী করতেন। ঈর্ষাকাতর খলনায়কের ছলনায় সর্বস্বান্ত হয়ে যায় তবুও নায়ক আত্মসম্মান হারাননি। মূল চরিত্রে তোসিরো মিফুন অপূর্ব অভিনয় করেছেন। ছবিটি মূল আধার—জুতো। ছবির নাম 'হাই এণ্ড লো'। হলিউডে একটি ছবি হয়েছিল যাতে নায়িকা হাই হিলের সরু হিলকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নামটা মনে পড়ছে না। রাজ কাপুর তাঁর 'আওয়ারা' ছবিতে জুতোকে অমর করেছেন বিখ্যাত গানে যার শুরু হল, 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানী'। কারদার পরিচালনা করেছিলেন—'দাস্তান'। তাতে নায়ক কিশোর থেকে যুবক হয়েছেন জুতো মারফৎ। মানে ভৃত্য কিশোর নায়কের জুতো পালিশ করছিলেন তারপর ডিজল্‌ভ হয়ে দেখা গেল ভৃত্য জুতো পালিশ করছেন নায়কের। কিন্তু জুতোর সাইজ এবার বেশ বড়। ভৃত্য জুতো পরতে দিলেন যুবক-নায়ককে। ক্যামেরা এবার দেখালেন নায়ককে। এ ছবির নায়ক ছিলেন রাজ কাপুর। জুতোর ব্যাপারে কুসংস্কারও আছে চিত্রজগতে। যেমন দেব আনন্দ সব ছবিতেই একজোড়া জুতো কমসেকম একটি দৃশ্যে পরবেনই। কারণ, দেব আনন্দের ধারণা সে জুতোজোড়া বহু লাকি। ইদানীং সে জুতোজোড়া দেব আনন্দের ভাগ্যরবিকে রৌদ্রকিরণ বিচ্ছুরণে বিশেস সাহায্য করছে বলে মনে হচ্ছে না। সে জুতোজোড়াকে ফেলে দেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ছবির কথা বলতে মনে পড়ল জেমস্ বণ্ডের একটি ছবিতে বিশাল বাথটাবে নায়িকা সুগন্ধী ফেনার পাহাড়ে নগ্ন শরীর ডুবিয়ে স্নান করছিল। বণ্ড এসে তার ভেজা ঠোঁটে একটা প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দিল। নায়িকা মদির কটাক্ষ হেনে বলল, গিভ মি সামথিং টু ওয়্যের। মানে আমাকে পরবার জন্য কিছু বস্ত্র দাও। বণ্ডস তার জবাবে কি করল বলুন তো। একজোড়া হাই হিল জুতো নিয়ে এসে বলল, ওয়্যের দিস্ এণ্ড কাম আউট। মানে—এই জুতোজোড়া পরে বেরিয়ে এসো। ভাবুন কি সখ! বিবসনার পরিধানে শুধু পাদুকা থাকবে, আর কিছু নয়। আইডিয়াটা আমারও মনঃপুত। সুন্দরী মেয়েরা কিছু পরবে না এটা হওয়ার উচিত হয়। পদকমল নগ্ন থাকা বাঞ্ছনীয় নয় মোটেই। জুতো অবশ্য পরা উচিত। আপনাদের কি মত? বিদেশী পর্ণোগ্রাফী ছবিতে নায়িকারা নগ্ন থাকেন এটা ভুল। নায়িকাদের পায়ে সব সময় থাকে হাই হিল। আর আপনারা জানের হাই হিল পাছার হিলকে বেশ সোচ্চার করে তোলে। হিলতোলা জুতো মানে বর্তুল নিতম্বকে চুম্বন, না সরি, চুম্বনযোগ্য চুম্বক করে তোলে। 'নায়েগ্রা' ছবিতে মেরিলিন মনরোর এই হাই হিল পরে হাঁটার বিখ্যাত দৃশ্য কেউ কি ভুলতে পেরেছে? মেয়েদের বটম্ যে এটমের চাইতেও শক্তিশালী হয় তার প্রমাণ মেরিলিনের ৩৬" ২২" ৩৬" ফিগারে ভারী উদ্ধত শ্রেণীর ভারত নাটাম। আর এই উদ্ধত আকর্ষণের কারণ তার জুতো—হাই হিল। মেয়েদের শরীর তো পুলিশ স্টেশন নয়, মেয়েদের শরীর হল হিল স্টেশন। সেসব হিলগুলোর তরঙ্গকে প্রকট করতে জুতোর অবদান সর্বাগ্রে। সেই জন্যই ওদের পা-তে থাকা উচিত হাই হিল। মেয়েরা সরল গাই

হলেও আমার আপত্তি নেই। চুল ডাই করলে আমার আপত্তি নেই, মেয়েরা সাই হলেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পুরুষদের কাছে যদি সুইটি পাই হতে হয়, তাহলে শরীরের হিলগুলো হাই করতে হবে।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়, কালো মেয়ের নাম শুভ্রা। তার চেয়েও অবাক লাগে ভুল নাম 'বাথরুম স্লিপার' মানে স্নানাগার চটির নাম শুনে। সত্যি করে বলুন এদেশে বিদেশে সর্বত্র কে চটি পরে স্নান করে? কেউ না। স্নান সর্বদা নগ্ন পায়ে নগ্ন শরীরে করে থাকে সবাই। তাহলে বাথরুম স্লিপাব ইউনিসেক্স। মানে উভলিঙ্গ। পুরুষ ও নারী সবাই ব্যবহার করতে পারেন। রবারের সামান্য বাথরুম স্লিপারের অসীম ভাগ্য। অনেক পুণ্য করে থাকলে আপনি বাথরুম স্লিপার রূপে জন্মাতে পারেন! কেন না নায়ক হোক বা গায়ক, দেশনেত্রী হোন বা অভিনেত্রী, সতীসাবিত্রী স্ত্রী হোক, বা সদ্য কিশোরী কুমারী, যে কর্মো-করতে এই চটি পরে বাথরুমে যায়, সেটা স্নান মোটেই নয়, সেটা শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জল বর্জন—সোজা ভাষার—হিসি করতে। নির্লজ্জ বাথরুম স্লিপার-এর কপাল দেখুন—সে সব দেখছে, এত সন্নিকটে, এত পরিষ্কারভাবে, এত সার্বজনীনরূপে ও এত সংখ্যায়! স্টুডিও পাড়ার বাথরুম স্লিপার তো যদি সাহস করে আত্মজীবনী লেখে তবে রেখা হেমা থেকে শ্রীদেবী মাধুরী সবার পর্দা ফাঁস করতে পারে! সেজন্য, এই জুতোকে পি করার সু বলে ইংরেজীতে পি-সু বলতে পারেন হিসি করার সু বলে—হিসু বা সু সু—সু।

জুতো কিন্তু ভাষা বদলে দিয়েছে। মদের চোরাকারবারীকে বলা হয় বুট-লেগিং। কথাটা এসেছে আমেরিকা থেকে। আমেরিকাতে তখন প্রহিবিশন, মানে মদ বেআইনী। তখন মদের বোতল পুলিশ ফাঁকি দিয়ে গামবুটের ভেতর ঢুকিয়ে মাফিয়ারা মদ সাপ্লাই করত। এই বুটের মধ্যে মদের চোরাকারবারের নাম হয়ে গেল বুট-লেগিং। তারপর দেখুন সস্তায় কোন ব্যবসা করলে বলা হয়—ব্যবসাটা করেছে সু-স্টিংগ বাজেটে।

জুতোর ফিতের দাম আর কতো। কমই হয়ে থাকে। সেজন্য ভাষায় কথাটা ঢুকে গেছে—সু স্ট্রিংগ বাজেট্। তারপর কাউকে তাড়িয়ে দেয়াকে বলে—সু হিম্ এওয়ে। দাম্ভিককে বলে—হি হ্যাজ বিকাম টু বিগ ফর হিজ্ সুজ। কর্মে অক্ষম হলে বলে—ইট ইজ নট হিজ্ পেয়ার অফ সুজ। অথবা—হি উইল নট ফিট ইন দিস সুজ। সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপারকে বলা হয়—ইট ইজ এবস্যুলুটলি এনাদার পেয়ার অফ সুজ। সম্পত্তি পাওয়া নিয়ে বলে—হি উইল গোয়িং টু ওয়েব ডেড ম্যানস সুজ। পিতা পুত্রকে তৈরী করার ক্ষেত্রে—আই এম মেকিং হিম রেডি টু ওয়ের মাই সুজ। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে বলে—হি ডাইড উইথ হিজ সুজ অন। আসল জায়গা ঘা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে বলে—আই টোল্ড হিম দি ট্রুথ হোয়ের দ্য সু পিন্চেস্। মানে জুতোর কাঁটা পায়ে বিঁধলে যে ব্যথা হয় সে ব্যথা পেয়ে লোকটা সত্যটা অবগত হয়েছে। আতংক মানসিক অবস্থাকে বলে—সেক ইন ওয়ানস্ সুজ। আরো ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। এছাড়া ছোটদের অনেক রূপকথায় জুতোর ছড়াছড়ি রয়েছে। কবলার বলুন, সু মেকার বলুন নানা উপকথায় উল্লেখ আছে।

বাচ্চারা ঝগড়া করলে বলে—প্রমিজ ব্রেকার,
সু মেকার।

জুতোর বাড়ির গল্প আছে রূপকথায়। বোম্বের ঝুলন্ত বাগানে মানে হ্যাংগিং গার্ডেনে সিমেন্টে বানানো ছোটদের খেলার জন্য রয়েছে সুন্দর একটা বিশাল জুতো আকৃতির ঘর। নাম—বুট হাউস।

জুতোকে পশ্চিমীরা খুব লাকিও মনে করে থাকেন। না, মানুষের জুতোকে নয়, এমনকি নারীর জুতোকেও নয়।

রাজকুমারী ডায়েনা বা ব্রুক শিল্ডের জুতোকেও নয়, ম্যাডোনা, সামন্থা ফক্স ও জুলিয়া রবার্টসের জুতোকেও নয়, জুহি, ভাগ্যশ্রী, রবিনা ট্যাণ্ডনের জুতোকে নয়। এমন কি আমাদের দেবশ্রী, মুনমুন, শতাব্দীর জুতোকেও নয়! তবে? আসলে লাকি ভাবা হয় ঘোড়ার নালকে। মানে ঘোড়ার জুতোকে যাকে ইংরেজীতে বলা হয়—হর্স সু। হ্যাঁ স্যার, দরজার সামনে হর্স সু মানে সৌভাগ্যে সূচক। হর্সের রেসে রানিংএ লাক আসে, কিন্তু হর্স সু তে কেন আসে কে জানে! কিন্তু এ চিহ্ন সমগ্র ইউরোপ আমেরিকায় খুবই জনপ্রিয়।

জুতো কথার নকসী কথার ইতিকথা অনেক করা হল। লিখতে লিখতে জুতো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। এই দেখুন, 'হাত' লিখতে গিয়ে জুতো লিখে বসেছি।

যৌন বিকারেও জুতোর বিশিষ্ট স্থান আছে। অনেক বিকারগর্স্ত পুরুষ নারীর জুতো দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। জুতো হল যৌন আকর্ষণের কারণ। ইংরেজীতে বলে—ফুট ফেটিশইজ্‌ম্। এ ধরনের পুরুষ উত্তেজিত হন—'সুজ, হাই হিল্‌ড বুট্‌স এণ্ড অনিথিং পারটেনিং টু দ্য ফিমেল ফুট।' ডাক্তার মানে যৌনবিশেষজ্ঞদের মতে—'সু ফেটিশইজ্‌ম্ ইজ ভেরী কমন'। ডাক্তাররা এও বলেন, এসেনশিয়েলি ইট ইজ দ্য উম্যান দে ওয়াণ্ট। দ্যাট্ সি মে ওয়েরিং হাই হিল্‌স ওন্‌লি হাইটেন দ্য এরায়োজল্।

মোট কথা — জুতো যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বিকারগ্রস্থকে আত্মরতিতে নিমগ্ন করে সেটার কারণ পাদুকায় আসক্তি নয়, পাদুকাধারিণীর প্রতি আসক্তি। আমি বাপু জুতো নিয়ে নিবন্ধ লিখতে রাজি আছি, কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে রাজি নই। নারীর স্বাদ কি শাড়িতে মেটে? না মশাই জুতো কি নারীর প্রতিনিধি হতে পারে? কখনোই না? জুতো যাক চুলোতে, হাই হিল নয়, আমার চাই হাই হিল বিহারিণী হরিণীকে। যার শরীরের হিলগুলো হিল্লোলিত হবে, যার 'অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল বন্দী হয়ে আছে।'

এখানেই শেষ করছি পাদুকা-পুরাণ। সর্বশেষে জানাই পাঠক পাঠিকাদের সু-প্রেম নমস্কার। না, থুড়ি, সপ্রেম নমস্কার।

॥ জল ॥

জল আমাদের জীবনের অপরিহার্য বস্তু। 'বস্তু' না বলে যদি 'অঙ্গ' বলা হয়, তাহলেও কিন্তু ভুল বলা হবে না। যে পৃথিবীতে বাস করি তার তিনভাগ জল একভাগ স্থল শুধু নয়, আমাদের এই যে নশ্বর দেহ, তারও কিন্তু পাঁচভাগের চারভাগই জল। জীবনের শুরু হয়েছিল জল থেকেই, সুতরাং 'জল'ই আমাদের জীবন। শরীরের পাঁচভাগের চারভাগই যদি জল হয় তাহলে তো 'জল' আমাদের অঙ্গই হল, তাই না? সুতরাং 'জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ' বলা খুবই যুক্তিপূর্ণ। ঈশ্বরের কত নাম! শত নাম তো শুনেই আসছি। জল ঈশ্বরের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। জলেরও নামাবলী গ্রন্থাবলীতে স্থান পাবার যোগ্য। তালিকা দিই।

জল—বারি, সলিল, উদক, অম্বু, অম্ভঃ, অপ, নীর, তোয়, পয়ঃ, পানি, অনুপ, শীকর, বাষ্প, ইলসে গুঁড়ি, বুদ্বুদ, জলাশয় (সমুদ্র, নদী, খাল হ্রদ, পুষ্করিণী, তড়াগ, বাপী, কূপ, ঝরণা, ফোয়ারা, জলপ্রপাত, নির্ঝর, নির্ঝরিণী, মহাসাগর, উপসাগর, সিন্ধু, প্রণালী, সরোবর, সরসী, দিঘি, তলাব, গোষ্পদ, ডোবা, ডিহি, দহ, পল্বল, খানা, খন্দ খাড়ি, গাঙ্, মোহনা, নয়নজুলি, বাঁধ, নর্দমা) ইংরেজীতে water, aqua উর্দুতে আব তামিলে তান্নি। আরও শত শত ভাষায় শত সহস্র নাম হবে। জলের নামও দিয়েছি আর জলাশয়ের নামও। এই নামের বন্যার সন্ধান পেয়েছি জগন্নাথ চক্রবর্তীর বাংলা-ইংরেজী দ্বিভাষিক থিসরাস 'মণিমঞ্জুষা' গ্রন্থে।

আমাদের শাস্ত্রে তো জলের দেবতা রয়েছেন। বরুণ দেব। ভারতবর্ষের সবচেয়ে পবিত্র নদী গঙ্গাকে হিমালয়-দুহিতা বলা হয়। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা-মর্তে অবতরণ করতে স্বীকৃত হন। কিন্তু পতনবেগ ধারণ করতে হয়েছিল শিবের জটায়। শিবজটা থেকে গোমুখী বেয়ে ভগীরথকে অনুসরণ করল গঙ্গা, নাম হল তাই ভাগীরথী। এই গঙ্গার জলে অবগাহন করে লোকে পাপমুক্ত হচ্ছে। হরিদ্বার থেকে কাশী, এইসব গঙ্গাতীরের শহরগুলো তাই তীর্থ হয়ে উঠেছে। তীর্থ হয়েছে প্রয়াগ, তীর্থ হয়েছে গঙ্গাসাগর। কিন্তু গঙ্গা নদী কি? নদী মানেই জলধারা, নদী মানেই জল। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন এ জীবনেও যেমন জল অপরিহার্য, ওপারের জীবনেও তার প্রচণ্ড ডিক্টেটরশীপ। জলের অসীম প্রতাপ। মুক্তো কুড়োতে চান তো জলে ডুবে সংগ্রহ করতে হবে, আবার মুক্তি কুড়োতে চান তাতেও জলে ডুবেই পাপমুক্ত হতে হবে। স্বর্গেও নদী আছে—মন্দাকিনী। মানে জল আছে। মুসলমানদের স্বর্গ, যাকে ওঁরা বেহেস্ত বলে, 'জিন্নৎ' বলে, সেখানে নদীর কথা উল্লেখ আছে। মর্তে তো আছেই। পাতালেও শুনি রয়েছে— পাতালগঙ্গা। মোটকথা, জলের প্রয়োজন, জলের উল্লেখ সর্বত্র রয়েছে। স্বর্গই হোক, নরকই হোক, পাতালই হোক, কাল্পনিক অন্য কোনো গ্রহই

হোক, মানে যে কোনো উটোপিয়া, যে কোন সাংগ্রিলা, মানুষের মনোজগতের সৃষ্ট যে কোনো ফ্যানটাসীলণ্ডই হোক না কেন জল সেখানে থাকবেই থাকবে। স্বর্গের বিবরণে সোনার গাছে হীরের ফুল না হয় বোঝা যায়, কিন্তু তারপরই থাকে দুধের নদী বা মদিরাবাহী স্ফটিকশুভ্র পাগলঝোরা, যার অর্থ, ঠিক ধরেছেন, জলের কল্পনা। মাটির পৃথিবীতে যেমন জলভাগ বেশী, তেমন আমাদের কল্পনার পৃথিবীতেও জল সর্বত্র উপস্থিত।

ছাত্রবয়সে পড়া একটি রোমান্টিক কবিতার মানে এতদিনে আমি বুঝতে পারছি। কবিতাটির অংশ বিশেষ শোনাই। অরবিন্দ গুহের লেখা।

যদিও শরীর কৃষ্ণশাড়িতে ঢাকো
সুদূর দু'চোখে কাজলের রেখা আঁকো,
নগরান্তের ঠিকানার ঘরে থাকো—
তুমি বিচিত্র তৃষ্ণার সরোবর।

. . . .

গ্রীষ্মদুপুরে তৃষ্ণা ছাড়িয়ে চলো
আমাকে জ্বালিয়ে তুমি আরো
বেশী জ্বলো
তুমি সরোবর জলে-জলে ছলো ছলো
তুমি স্বপ্নের স্বর্গের স্বাক্ষর।

দেখলেন? মেয়ে নাকি সরোবর, দেখলেই তেষ্টা পায়। পায় সত্যি কথা। মশায় আমারই গলা শুকিয়ে যায়, ফলে তেষ্টা পায়। এতদিনে বুঝেছি মেয়ে মানে চার ভাগ জল, সেজন্যই তেষ্টা পায়। কিন্তু বাকি, মানে একভাগ স্থলকেও ভোলা উচিত নয়। বলবেন মেয়েদের শরীরে স্থল কোথায় আবার? তা স্থল না থাক, স্থূল তো। সেই একভাগ স্থূলও হুলুস্থুল করার জন্য যথেষ্ট মশাই।

যাই হোক এখন একটা কথা আপনাদের মানতেই হবে। যে জগতে আপনার বাসা ও ভালোবাসা দু'টোই সজল। হ্যাঁ মশাই, সজল। জলপূর্ণ বলেই মেয়ে দেখলেই অনেকের গলা শুকিয়ে যায়, যেমন আমার। তেষ্টা পায়। আবার মেয়ে দেখলে অনেকের মুখে জল আসে। যেমন আমার বন্ধু ধর্মেন্দ্র। মেয়ে দেখলেই তাঁর ধর্মবোধ লুপ্ত হয়ে যায়, সুপ্ত ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে ও তাঁকে দেবরাজ ইন্দ্র বানিয়ে দেয়! তখন সে আর নরম থাকে না, শরম রাখে না, তখন সে হয়ে ওঠে 'গরম ধরম'! কিন্তু এ মহাশয় আমার আলোচনার বিষয় ন।, আমার বিষয় হল জলাশয়। বিজ্ঞানবীদরা যাই বলুন মেয়ে দেখলেই আমার কিন্তু প্রথম জলের কথা মনে হয় না, আমার মনে হয় মেয়েরা জল নয়, গজল।

কাজল পরা কোমলতনু কোনো যুবতী উজ্জ্বল হতে পারে, প্রাঞ্জল হতে পারে, কিন্তু শুধু জল কখনোই নয়। ইমপসিবল! জল নয়, জলকন্যা বলুন আপত্তি করবো না। যুবতীরা দুগ্ধবতী হয়, সুতরাং দুগ্ধকন্যা বলুন তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু স্রেফ প্লেইন ওয়াটার? বোগাস্। কিন্তু আপনি যদি খুব বেশী চেপে ধরেন তবে জলভরা কন্যাকে জলভরা সন্দেশ বলতে পারি। সন্দেশের দু'টো মানে। খাদ্য ও সংবাদ। দু'টো মানেই চলতে পারে। কেননা সবাই জানে নারী মাত্রই সুখাদ্য, নারী মাত্রই সুসংবাদ। এবার আসুন প্রসঙ্গান্তরে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এত বড় কবি হয়েছেন কি করে? তাঁর কবিতা লেখার প্রেরণা এসেছিল কোত্থেকে?

উত্তর হল— জল। বিশ্বাস হচ্ছে না? খাঁটি সত্যি কথা বলছি। 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে 'শিক্ষারম্ভ' শীর্ষক অনুচ্ছেদে— "কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন

পড়িতেছি 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না— তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটা লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যর মধ্য জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" জীবনস্মৃতি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এবার জবাব দিন। ঠিক বলেছি কিনা। 'জল' না হলে আদিকবি কি করে লিখতেন যে— 'জল পড়ে'? তিনি তো লিখতে পারতেন, ঢিল পড়ে, শীল পড়ে বা কিল পড়ে? কিন্তু তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হতেন? মোটেই না। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে হয়েছিলেন মুগ্ধ আকর্ষিত। সেজন্য তাঁর "চৈতন্যর মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" দেখলেন জলের ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ এর পর যে ছড়া শুনে মুগ্ধ হযেছিলেন সেটাও জলাশ্রয়ী। সেটা হল 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'।

দেখতেই পাচ্ছেন জলের শক্তি। যে জল থেকে আজকাল এত পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে সে জলই রবীন্দ্রনাথের মানস পৃথিবীতে এত বড় বিদ্যুৎ-প্রতিভার সৃষ্টি করবে এতে আর সন্দেহের কারণ কি থাকতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, চিত্রে, গল্পে ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মে জলের আধিপত্য খুবই স্পষ্ট। নদী, সাগর ও বিশেষতঃ বর্ষা ঋতুর কত চর্চাই না উনি করেছেন তাঁর নানাবিধ সাহিত্যসাধনায় অজস্র। সাহিত্যসাধনার শুরুতেই উনি 'নদী' বলে কাব্যপুস্তক লিখেছিলেন যাঁর শুরু হল—

"ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে।
শোন্ চলচল ছলছল
সদাই গাহিয়া চলেছে জল।"

জলও গাইছে, তাঁর চেয়ে বেশি গেয়েছেন স্বয়ং কবিগুরু। বর্ষাবন্দনার কবিতা ও গানগুলো যেমন জলপ্রিয় তেমনই জনপ্রিয়। কারণ স্বাভাবিক। বর্ষার রিমঝিম জল পড়া সবাইকেই রোমান্টিক করে তোলে। কালিদাস পুরো কাব্য রচনা করেছেন বর্ষার জলভরা মেঘকে দূত বানিয়ে তাঁর অমরকাব্য 'মেঘদূত'এ,— সঙ্গীতজ্ঞরা এই জলের ঋতুর ওপর রাগ বানিয়েছেন 'মেঘমল্লার'। পৃথিবীর সব সাহিত্যে বিশেষতঃ কাব্যে জল অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। নারীর অশ্রুকে কবিরা কখনো মুক্তো বলেছেন, কখনো হীরে। কিন্তু চোখের জলকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাজমহল। অবশ্য আমার বৌ বা আপনার বোনের অশ্রু নয়, কালের অশ্রু। কিন্তু অশ্রু তো বলেছেন। দেখুন—

"শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে
শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

দেখতেই পাচ্ছেন জল আগ্রাতেও, আর জল নায়েগ্রাতেও। কবিরা ঝর্ণা, প্রপাত, নদী, সাগর, বর্ষা, অশ্রু সব নিয়েই কাব্য রচনা করেছেন। বর্ষা নিয়ে ব্যর্থ প্রেম, সার্থক প্রেম, গভীর বিরহ, কতশত বিষয় নিয়ে উৎফুল্ল ও বিষণ্ণ হয়েছেন তার শেষ নেই।

বনফুল ব্যঙ্গ কবিতাও লিখেছেন, বর্ষাকালে স্ত্রীর বিরহে অতিকাতর এক স্বামী, স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনে নিজের ও বর্ষা ঋতুর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করেছিলেন। প্রথমে স্ত্রীর বিরহে বর্ষা ঋতুর সিডাক্‌সন—

গগন ভরিয়া নেমেছে বাদল
মাদল বাজিছে মেঘে,
পবন পূরবী কেতকী-সুরভি
বহিয়া আনিছে বেগে।
মত্ত দাদুরি পাশের পুকুরে
মুখরিছে চারিদিক—
সুযোগ বুঝিয়া বিরহ আসিয়ে
চাপিয়া ধরিল ঠিক!

তারপর স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনে বিরহ মদিরার নেশাভঙ্গের আক্ষেপ— দিন দুই পরে আসি অমিয়া নিজেই কহিলেন যাহা, তার সারমর্ম এইঃ

"সস্তায় বিক্রি ছিল দুল জড়োয়ার
তারি তরে হয়েছিল জরুরি দরকার
পঞ্চাশ টাকার!"
হাসিমুখে করিল বর্ণন!
এবং তখনি ঠিক ঘন ঘোর করিয়া গর্জন
গগনেও নামিল বরষা!
পূরবী পবন পুন কেতকীরে করিল
সরসা!
পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে যতেক দর্দুর
জমাইল বরষার সুর।
চীৎকারিয়া কহিলাম—"এদেরই ধাপ্পায়
হয়েছি বেকুব আমি হায়!
ইচ্ছে করে জুতো মেরে মেঘফেঘ চুরমার
করি!"
কিন্তু তাহা অসম্ভব স্মরি
সগর্জনে কহিলাম ডাকি চাকরেরে,
"ডোবার এ ব্যাংগুলো তাড়া তো
মেরে মেরে।"

কবিতার শীর্ষ- 'মানে গল্পই'— বনফুল

সুতরাং জল নিয়ে চতুরঙ্গ কবিতা, জবরজঙ্গ কবিতা থেকে ব্যঙ্গ কবিতা সবই লেখা হয়েছে।

দেশী কবিতার নমুনা দিয়েছি, বিদেশীর নমুনাও তো দেয়া দরকার। আমার প্রিয় ও এ যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত রোমাণ্টিক কবি রড ম্যাকক্যুইনের দু'টো কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 'জল' এখানে উপস্থিত বৃষ্টি রূপে। স্মৃতি-মন্থনের সময় হল বর্ষা ঋতু।

Where were we
When the coming of rain.

The mind is such a junkyard ;
it remembers candy bars
but not the Gettysberg Address.
Frank Sinatra's middle name
but not the day your best friend
died.
If in your mind there is some corner
not yet occupied with numbers
you never need,
remind of your memory of the day
We turned to watch the rain
that we belong to each other.

— Listen to the warm

আরেকটি কবিতা যার নামকরণেই জলঝরা জলধারা বৃষ্টির উল্লেখ। বলতে পারেন কবিতার নাম— 'জল পড়ে'। ইংরেজী হল it's raining. শুনুন—

It's raining
See the leaves go flying past the
window
We can sit inside and just do
nothing
Wo ldn't it be nice to touch
each other
gently, gently.

স্পর্শসুখের নিমন্ত্রণ। বৃষ্টি। নরম টাপুর-টুপুর। নরম হাত। গরম সুখ। তারপরই কিন্তু রামধনুর স্বপ্ন। নির্ভয় আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি। বজ্র ভয়ভীতাকে সাহসী পুরুষের প্রেম-প্রতিজ্ঞা। শুনুন—

It's raining
Like the tears of angels down the
window
if we wait there's sure to be a
rainbow
I am here now ; don't be afraid of
thunder any more.

বর্ষার মাধুরীতে, বর্ষার মদিরাতে প্রেমের ঢং বদলায় হয়তো, কিন্তু রং বদলায় না। মানে কবিতায়, স্বদেশী হোক বা বিদেশী, মিলনের কবিতায় বা বিরহের কবিতায় 'জল' আছেই। বৃষ্টির জল, ঘামের জল (বিশেষতঃ মিলনে) বা চোখের জল (বিরহে) এক জাতীয় জল থাকতে বাধ্য।

দেখুন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরেক মহামানব মহানেতা হতেই পারতেন না যদি না 'জল' কাছেপিঠে না থাকতো। আমি জওহরলাল নেহেরুর কথা বলছি। নেহেরুর পদবী হল কউল। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি নেহেরু যে স্থানে পৌঁছেছেন, কউল হলে আর পৌঁছতে হতো না! কিন্তু নেহেরু কি করে হলেন? নেহেরুজীর আত্মজীবনীতে

রয়েছে তাঁর এক পূর্বপুরুষ, যাঁর নাম ছিল রাজ কউল, কাশ্মীর থেকে দিল্লী এসেছিলেন মোগল বাদশার আমন্ত্রণে। সেটা আঠারো শতাব্দী, আওরঙজেবের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লীর সিংহাসনে তখন বসেছেন ফারুকসায়ার। মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য তখন অস্তমিত প্রায় বললেই চলে। যাই হোক, এই বাদশা কাশ্মীর গিয়ে রাজ কউলের সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা দেখে দিল্লীতে আহ্বান জানালেন। ১৭১৬ সালে রাজ কউল দিল্লী এলেন। বাদশা তাঁকে দিল্লীর নিকট মস্ত এক জাগীর দিলেন। জাগীরের মধ্যে প্রাসাদোপম বাড়িটা ছিল একটা খালের, মানে ক্যানেলের ধারে। মানে জলের ধারে। খালকে হিন্দীতে বলা নাহার। এবার জওহরলালজীর ভাষায় শুনুন—

A jagir with a house situated on the banks of a canal had been granted to Raj Kaul, and from the fact of this residence "Nehru" (from nahar, a canal) came to attached to his name.

Kaul had been family name ; this changed to Kaul-Nehru ; and in later years, Kaul dropped out and we became simply Nehrus.

Page : 1- Jawaharlal Nehru
an autobiography.

দেখলেন, জলের পাশে থেকে থেকে কউল হয়ে গেল নেহেরু। এই জলযোগের জন্য নেহেরুর বরাতে জুটেছিল এই রাজযোগ বা বলুন রাজভোগ। জানি বলবেন রাজতন্ত্র ছিল না, গণতন্ত্র ছিল। কিন্তু জনগণেশের, মানে জনতাজনার্দনের রাজাই ছিলেন উনি। যা সুনাম ও যশ জুটেছিল তাঁর কপালে সব জলের কল্যাণে এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনারা মানুন আর নাই মানুন।

জল দিয়ে অনেক কথা আমাদের বাংলা ভাষায় প্রচারিত। যেমন—জলপাই, জলচৌকি (সম্ভবতঃ বসে স্নান করার জন্য ব্যবহার হতো এই নাম), জলপান, জলযোগ ও জলখাবার এই তিনটে কথার মানে একই, snacks-এর তিনটি ভাষান্তর। তারপর জলপানি (স্টাইপেণ্ড এর বাংলা হল জলপানি। কেন এই নাম আমি বলতে পারব না। ভাষাবিদরা please বিশ্লেষণ করুন।)

তারপর জলছবি। ছোটবেলায় অনেক বইতে লাগাতাম। অর্থ নামেই আছে। জলছবির জগত থেকেই আমি ছায়াছবির জগতে চলে এসেছি। সে যাক, প্রসঙ্গে আসা যাক। জল দিয়ে আর কি কথা আছে? হ্যাঁ, জলকন্যা। যদি জ্যান্ত পেতাম উর্ধ্বাঙ্গ নিয়ে প্রেম করতাম আর নিম্নাঙ্গ, যা আসলে মৎস্যপুচ্ছ, সে অঙ্গটাকে নিয়ে মাছের কালিয়া বানিয়ে খেয়ে নিতাম। কিন্তু চোখেই পড়েনি আজ পর্যন্ত! জল নিয়ে একটি বাদ্যযন্ত্র আছে—জলতরঙ্গ। জল নিয়ে দুটো রোগের নাম জানা আছে। জলাতঙ্ক আর জলবসন্ত। হ্যাঁ, জ্বালাময়ী পাতা আছে, জলবিছুটি। এছাড়া, রানী থেকে কেরাণী, সবাইকে যে তিনটে করতে হয় সেটা তো খুবই সহজবোধ্য। সে ত্রয়ীর নাম—তৃষ্ণা পেলে জলপান, আর শরীরের জন্য একান্ত প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর। বাকি দুটো কাজ হল — জলত্যাগ ও জলাশৌচ। বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। জলত্যাগ নিয়ে থিসিস লেখার মত সংগ্রহ আছে আমার কাছে। আপাততঃ উহ্য থাকলেও এড়িয়ে যাবার কোনো অভিপ্রায় নেই আমার। পরে দীর্ঘ আলোচনা করব। সে অনুচ্ছেদটি রোমাঞ্চক লাগবে কি রোমহর্ষক লাগবে আগে থেকে বলতে পারছি না। অপেক্ষায় থাকুন।

এখন আমি আলোচনা করব জল কথার নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থে জল ব্যবহৃত হয়। জলের ব্যবহার অনেক প্রবাদবাক্যে চলে আসছে

কতকাল থেকে। ফর্দ বানালে চমকে যেতে হয়। খাদ্য বা পানীয় বা যৌন-আকর্ষণের উল্লেখ করে বলা হয়, দেখে জিভে জল এসে গেল বা মুখে জল এসে যায়। বাজে খরচ হলে বলে, টাকা জলে গেল। অপাত্রে কন্যাদান করলে বলা হয়, মেয়েটাকে জলে ফেলে দিলি? বা জলে ভাসিয়ে দিলি? ধড়িবাজ লোককে বলা হয়, লোকটা গভীর জলের মাছ। নিষ্ঠুর লোক সহানুভূতির অভিনয় করলে বলা হয়, কুমীরের অশ্রু ফেলছে বা কুমীরের কান্না কাঁদছে। উভয় সঙ্কটকে বলে, বিপদ একেই বলে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ! অতি সহজকে বলা হয়, জলের মতো সোজা।

অতি চালাকের কর্মচাতুরীকে বলা হয়, এমন চাল চেলেছ যে যাকে বললেন, ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। অতি অভিজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে বলা হয়, আমাকে বোকা বানানো সহজ নয় মশাই, আমি সাত ঘাটের জল খেয়েছি! অপ্রিয় বিষয় নাড়াচাড়াকে বলা হয়, জল ঘোলা করা। অতি কান্নাকে বলা হয়, কেঁদে জল হাওয়া; খুব ভঙ্গুর নম্র প্রকৃতির লোক সম্পর্কে বলা হয়, জলের ছিটেয় গলে যাওয়া। যা স্থায়ী কোনো চিহ্ন রাখে না তার সম্পর্কে বলতে গেলে অনেকে বলেন, জলে আঁক কেটে লাভ কি? অগভীর সাহিত্যরচনা বা শিল্পকর্ম সম্পর্কে অনেক সময় সমালোচক লেখেন, প্রেমকাহিনীটা একেবারে জোলো রচনা বা শিল্পকর্মটি নেহাৎই জোলো! হিন্দীতে লজ্জাবতী মেয়ের (ছেলেরও হতে পারে তবে লজ্জা মেয়েদেরই ভূষণ) প্রেমাস্পদকে দেখে ঘেমে নেয়ে ওঠাকে বলে, ম্যায় তো শরমসে পানি পানি হো গই। হিন্দীতে একটি গালি হল, তুমকো চুল্লুভর পানিমে ডুব মরনা চাহিয়ে। মানে, তোমাকে এক অঞ্জলি জলে ডুবে মরে যাওয়া উচিত। এখানেও দেখুন, জল! এবার বাংলা কিছু প্রবাদ শোনাই যা জল নিয়ে বর্ণিত। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী বোঝাতে বলা হয়, অল্প জলের মাছ ফরফরানি বেশি। রকমফেরে—আধগাগরী জল, করে ছলছল। বিপরীতধর্মী মানুষ বা বস্তু কখনো মিশতে পারে না তার প্রবাদ হল, তেলে জলে মেশে না। যে কোনো সময়ে রূপ বদলে যেতে পারে যে তিনটি অবিশ্বাসযোগ্য চরিত্র তার প্রবাদ হল—

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী,
এ তিনে না বিশ্বাস করি।

রকমভেদে—

জল, আগুন মন
বশে যতক্ষণ।

দাপট না রাখতে পারলেই আপনার বশ্যতার বাইরে।

এছাড়া কয়েকটি প্রবাদ আছে, যার বিশ্লেষণ অপ্রয়োজন। নেহাৎই সহজবোধ্য। যেমন—জল, জোলাপ, জোচ্চুরি, এ তিন নিয়ে ডাক্তারী। তারপর—দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী। আরেকটা—ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল।

লাস্ট প্রবাদ শোনাই—জল জল ইন্দ্রের জল, বল বল বাহুবল। ইন্দ্র মানে মেঘ। মানে বৃষ্টির জলের আরতি হচ্ছে।

দেখুন শচীন ভৌমিক কত রিসার্চ করেছে। আপনাদের জন্য এই লেখার রসদ সংগ্রহ করতে এত খাটতে হয়েছে আমার যে খেটে খেটে রক্ত জল হয়ে গেল। এই দেখুন এখানেও জল নিয়েই প্রবাদের উপযোগ করেছি। খেটে খেটে রক্ত জল হয়ে যাওয়া! এ অনুচ্ছেদটি এখানেই সমাপ্ত করছি।

এবার আসুন ধর্মকর্মে। প্রায় সব ধর্মেই জলের স্থান বেশ প্রধানই বলা যায়। খৃষ্টধর্মে ব্যাপটিজম্ করার জন্য জলের ছিটে দিতে হয়, মুসলমানদের অজু করার জন্য জলের দরকার আর হিন্দুদের তো প্রথমেই স্নান করে পুজো করতে হয়, পুজোতে

শান্তিজল ছিটোন হয়, চরণামৃত মানেই জল (অতীতে স্বামীর বুড়ো আঙ্গুল ডুবিয়ে সেই জল সতী স্ত্রীরা পান করতেন। যাকে বলা হয়—পাদোদক) আর গঙ্গাস্নান করতে ভক্তরা হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর কত কত তীর্থেই না ঘুরে বেড়ায়। মৃত্যু-পথযাত্রীর মুখে গঙ্গাজল দেয়া হয় আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্যে। শাস্ত্রে বলে মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পেরিয়ে যেতে হয়। মোটকথা মৃত্যুর প্রাণ থেকে মুক্তি হলেও জল থেকে মুক্তি নেই! মোট কথা আমাদের ধর্মাচরণের পদে পদে জলের প্রয়োজন, সব অনুষ্ঠানে জল হল অপরিহার্য। আমাদের কেষ্ঠঠাকুর তো কি করতেন? জল দেখলেই খল হয়ে উঠতেন। জলের ঘাটে রাধাকে কম নাস্তানাবুদ করেছেন? মাটির কলস ফুটো করে রাধাকে ভিজিয়ে একসা করে দিতেন। দোল খেলার মানে কি? রাধা ও অন্যান্য গোপীদের জল দিয়ে ভিজিয়ে তাদের সিক্তযৌবনকে উদ্ধত করে তোলা। তফাৎ শুধু এই সাদা জলের বদলে রঙিন জলের ব্যবহার।

শ্রীকৃষ্ণ দোলের চেয়ে বেশী মেয়েদের ঘোল খাইয়েছেন তাঁর বস্ত্রহরণের পর্বে। সব পুরুষদের যা সত্যিকারের ইচ্ছে তা উনি চাক্ষুষ করে দেখিয়েছেন। ভগবানের লীলা বলে কেউ। কেউ বলে জলকেলী। আসলে বস্ত্রহরণ করে যুবতীদের নগ্নস্নানের দর্শনই হল আসল উদ্দেশ্য। যে ইচ্ছে আমার আপনার সবাইর। মেয়েদের নগ্ন দেখার সুপ্ত বাসনা আপনার নেই যদি বলেন তবে আমি বলব আপনি মশাই পুরুষমানুষই নন। এ যুগে মেয়েদের বস্ত্রহরণ করার প্রয়োজন হয়না, নিজেরাই বস্ত্রবর্জন করে প্রায় নগ্ন হয়ে স্নান করে থাকে। অঙ্গে সাঁতারের পোষাকের নামে যা থাকে, তা লজ্জাকে লুকোয় কম, প্রকাশ করে বেশী। সেজন্য আমি সমুদ্রের ধারে বা সুইমিং পুলের কাছে থাকতে ভালোবাসি। বিনি পয়সায় সুইমিং কসটিউম্ পরা আধুনিকাদের দেহবল্লরীর রূপসুধা পান করা যায়। ফ্রয়েড বলবেন—দর্শনকাম, কিন্তু এ প্রদর্শনী না থাকলে আমার জীবনে অনেকটা void থেকে যেতো। সব জলেরই লীলাখেলা। জল না থাকলে সাঁতার থাকতো না। সাঁতার না থাকলে কোথায় থাকতো সাঁতারের পোষাক! সুন্দরী মেয়ে + সাঁতারের পোষাক + জল = কি হয়? হয়—আগুন। জলে আগুন অবিশ্বাস্য? না, দেখবেন, অনুভব করবেন, এই তিনের কম্বিনেশনের নেট্ রেজাল্ট্—ফায়ার। আর তারপর—ফিভার।

জ্বরের কথা থাক। ফিরে আসুন জলের কথায়।

জলের ধারে থাকে জলের ঘাট। নদীতেও থাকে, থাকে পুকুরেও। ঘাট মানুষ সৃষ্টি করেছে নিজের প্রয়োজনে। কলসী ভরে জল তুলতে, স্নান করতে, বাসন মাজতে। যেখানে জলের কল নেই সেখানে ঘাট একটি অতি প্রয়োজনীয় স্থান। মেয়েদের গসিপ কর্ণার হল এই ঘাট। ঘটনার চাইতে রটনাতে বেশি নির্ভরশীল এই সব আলোচনা বা আড্ডার আদর্শ স্থান জলের ঘাট। পি. এন. পি. সি. মানে পরনিন্দা পরচর্চার ঢেউ এই সব ঘাটে জলের ঢেউ এর চাইতে বেশি উচ্চরোলে চলত। পুরনো দিনের নিউজসেন্টার। কোন মেয়ে কার সঙ্গে পালানো, কোন বিধবা পেট খসিয়েছে গোপনে, কার সঙ্গে কার ইয়েটিয়ে চলছে সব কিছু রসালো আলোচনার শুরু-ক্ষেত্র ছিল ঘাট। বলা বাহুল্য এই শুরু-ক্ষেত্র থেকে কুরুক্ষেত্র হতে দেরি হত না। তবে একটা কথা ঠিক এই কর্মকাণ্ড মেয়েদের একচেটিয়া বলতে পারেন। ওনলি ফর লেডিস। জলের ঘাট কথা বলতে পারলে অনেক কিছুই বলত।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ ঘাটের মুখে কথা দিয়েছিলেন তাঁর একটি অপূর্ব গল্পে। নাম 'ঘাটের কথা'। গল্প নয়। মুক্তো। রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন, "পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস, মনোযোগ দিয়া

জল-কল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।" কুসুম নামে একটি মেয়ের শৈশব। বিবাহ, নিষ্ঠুর বালবৈধব্য, তরুণ এক সুকুমার সন্ন্যাসীর প্রতি তার হৃদয়দৌর্বল্য এবং অতঃপর ব্যর্থ প্রেমের মর্মান্তিক লজ্জায় মেয়েটির আত্মহনন—এই হৃদয় বিদারক কাহিনীটি উনি ঘাটের কথায় এত নিপুণভাবে রচনাশৈলীর যাদু লেখায় বর্ণনা করেছেন যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। একটি মহৎ রচনা। এখন বলতে পারব না, কিন্তু অতীতে, দুঃখী বাঙালী মেয়েরা অন্যান্য প্রক্রিয়ায় আত্মহত্যা করার চাইতে জলে ডুবে মরার পক্ষপাতিত্ব বেশি দেখিয়েছেন। জলময় বাংলাদেশ, সুতরাং সুযোগের সহজলভ্যতার জন্যই হয়তো এ প্রক্রিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য হত। শুনতে খারাপ লাগলেও সংখ্যা বিজ্ঞানবিদদের মতে এটা ছিল নগ্ন সত্য। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঘাটকে আরেকজন মহাপুরুষ অমর করেছেন তাঁর কথামৃতে। ঠিক ধরেছেন। তিনি হলেন পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। জল দিয়ে উনি খুবই বড় কথা বুঝিয়েছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলতায়। উনি বলেছেন, "যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নেই যে যাকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়, তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম, তার হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্চে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরের অনেকগুলি ঘাট আছে, হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, কলসী করে, বলে 'জল'। মুসলমানরা আর এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, চামড়ার ডোল করে, তারা বলছে 'পানী'। খৃস্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে, তারা বলছে 'ওয়াটার'। যদি কেউ বলে, না জিনিসটা জল নয় পানী, কী পানি নয়, ওয়াটার, কি ওয়াটার নয় জল, তাহলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মতান্তর, ঝগড়া, ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি, এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্চে, আন্তরিক হলেই ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-২য় ভাগ- পৃষ্ঠাঃ ১০৪

চুলের মতো জলের স্থান পরিবর্তনে নামের পরিবর্তন হয়। বুঝলেন না? যেমন চুল। মাথার চুলকে কেশ, চোখের ওপরের চুলকে ভুরু, ঠোঁটের ওপরের চুলকে গোঁফ, গালের চুলকে দাঁড়ি, শরীরের চুলকে লোম, কোমরের নীচে কটিতটের চুলকে, থাক, নাই বললাম! চুল আমার আলোচনার বিষয় নয়, বিষয় হল জল। সুতরাং জল নিয়ে সজল হওয়া যাক। জলেরও স্থানভেদে নামভেদ হয়ে থাকে। চোখে জল এলে বলা হয় অশ্রু, নাকের জলকে বলা হয় নাকের ফোঁটা, মুখের জলকে লালা বলা হয়, থুতু বলা হয়, প্রখর গ্রীষ্মে শরীর যে জলে ভিজে ওঠে তাকে বলে ঘাম। আর কিডনি পরিশ্রুত ব্লাডার নিষ্কাসিত জলকে বলা হয়, না এইবার এড়িয়ে যাবার কিছু নেই। বলা হয়, —মূত্র।' জলপান করা ও জলত্যাগ করা শরীরের ধর্ম। নেতা হোক বা অভিনেতা, রাজা হোক কি প্রজা, রানী বা মেথরানী, নায়িকা বা গায়িকা, বিশ্রীদেবী হোক বা শ্রীদেবী, সাধু ব্যক্তি হোক বা অসাধু, লেখিকা হোক বা পাঠিকা—সবাইকেই এ কর্ম করতে হয়। হিসি করতেই হয়, মুত্রপাত করা, বলতে পারেন, বাধ্যতামুলক শুধু মানুষের নয়, কোনো জীবজন্তুরই এই জলবর্জনের হাত থেকে নিস্তার নেই। ডাক্তারী শাস্ত্রে এই মূত্র পরীক্ষা করে অনেক রোগের লক্ষণ ধরতে পারা যায়। মেয়েদের সন্তান সম্ভাবনার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া যায় মুত্র পরীক্ষায়, যাকে র‍্যাবিট্ টেস্ট বলে। এছাড়া বহুমূত্র, কিডনি ইনফেকশন ক্যালিকুলা মানে পাথর আছে কিনা ও আরো হাজারো রোগের সিমটম জানিয়ে দেয় পেচ্ছাপ।

মেয়েদের হিসি কিন্তু আমাদের যৌনজগতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। শুনতে

খারাপ লাগলেও এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। রিয়ালিটি থেকে চোখ সরিয়ে রাখলে রিয়াল হওয়া হয়ে যায় না। পুরুষদের যৌনজীবনে মেয়েদের হাসির অবদানের চেয়ে হিসির অবদান বেশি। শকড হবেন না, মূত্রপান (ঔষধ হিসেবে মোরারজী দেশাইর ইউরিন থেরাপীর কথা বলছি না। বেশ কিছু সংখ্যক লোক এ থেরাপীর ওপর আস্থাবান। সেটা আমার আলোচ্য নয়) করা থেকে মূত্র স্নান করা যৌনক্রিড়ার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয় আজকাল। শকিং? মূত্রপান? ছিঃ। মূত্র স্নান? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ছিঃ ছিঃ করুন, আর সি সি ই করুন. দুটোই মিথ্যে নয়।

ছেলেদের একটা বয়েস থাকে, সদ্য কৈশোর বলা চলে তাকে. সে বয়েসে মেয়েরা, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েরা বা শ্রদ্ধেয়া মেয়েরা মলমূত্র ত্যাগ করে এটা কিছুতেই ভাবা যায় না। তখন সব মেয়েদেরই মনে হয় দেবী আর দেবীরা শুধু প্রাতঃস্মরণীয়া হতে পারেন. প্রাতঃকৃত্যকরণীয়া হতেই পারেন না। তারপর কয়েকটি বছর গত হলেই সে বয়েস. সে সরল বয়েস পেরিয়ে যায়। এইবার আসে গরল বয়েস। বিপরীত লিঙ্গ সম্পর্কে তখন মনে আসে অপার কৌতূহল। নারীপুরুষের প্রভেদ তখন নবঅর্জিত জ্ঞান। সুতরাং দেখার তখন দুর্বার ইচ্ছে জেগে ওঠে। ভয়েরিজম বলুন. বা বাংলায় বলুন দর্শনকাম। এতে অস্বাভাবিকতা বিন্দুমাত্র নেই। বয়োঃবৃদ্ধির সুস্থতারই লক্ষণ এটা।

এই উদ্যমে বয়ঃসন্ধির কাল সকলেই পার হয়ে আসতে হয়েছে। শরীরের ভেতর সে জন্তুর যন্ত্রণা সবাইকে শুনতে হয়েছে। সে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। সে এক দুঃসহ আনন্দ. সে এক অতি আনন্দের দুঃখ। অদ্ভুত সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। এটা যৌনজাগরণের বয়েস। না, এটা সরল বয়েস নয়। এটা বুঝেও না বোঝার চেষ্টা. জেনেও পুরোনো এক মিথ্যে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস। আসলে বালক নয় আর সে। এখন সে সাবালক। যৌবন আগত, তবু কৈশোরের বিদায় নেবার অনিচ্ছা। কিন্তু বিদায় সে নেবেই। তখন দর্শনকামের শিকার সবাই। আমি. আপনি, রাম, রহিম, রবার্ট, অমর, আকবর. এণ্টনি সবাই। কো-এডুকেশন কলেজ, সিনেমা হল, দূরযাত্রার ট্রেন বা প্লেন. মোটকথা যে সব জায়গায় নারীপুরুষের যথেষ্ট ভীড়. সে সব জায়গায় কোনো মেয়ে বাথরুমে গেলেই সব পুরুষের চোখ বাথরুমের দরজার দিকে থাকে। সবাই মনশ্চক্ষে মেয়েটি যে নির্দোষ ও প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যকর কাজ করছে সেটা দেখার চেষ্টা করছে। জলত্যাগের মতো একটি গোপনীয় কাজের, একটি অতি সাধারণ কাজের, এত অসাধারণ জনপ্রিয়তা! এ কৌতূহল কি অস্বাভাবিক? বিকারগ্রস্ত মনের লক্ষণ? আগে তাই ভাবা হতো, কিন্তু যৌনবিশারদদের মতে কনসেন্টিং এডাল্টস্‌য়ের মধ্যে এসব কিছুই বিকার নয়. অপরাধ নয়। মানে দু'পক্ষ (স্ত্রী ও পুরুষ) রাজি থাকলে এটা কোনো গর্হিত কর্ম নয়, যৌনআনন্দেরই একটি রকমফের। আসলে পরস্পরের লিঙ্গলেহন যাকে ইংরেজীতে বলে ওরাল্ সেক্স (পুরুষের ক্ষেত্রে ফেলাশিও ও রমণীর ক্ষেত্রে কানিলিংগাস) নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। শুধু যা একান্ত নিষিদ্ধ গোপনীয়। ভাবা হত গত যুগে তা এখন সাহসের সঙ্গে প্রকাশিত। সাহিত্যে শিল্পে ও জীবনে এ নিয়ে আজকাল লুকোচুরি নেই। পুরুষ ও রমণীর রমণপূর্ব অনুরাগ পর্বে. এসবের. যাকে বলে ফোরপ্লে. বেশ বড় ভূমিকা আছে। তৃপ্তির শীর্ষে পৌঁছুতে সাহায্য করে এই শরীরের সুখের খেলা। রুচি অনুযায়ী যার যার নিজস্ব ভঙ্গী থাকে যা একান্ত ব্যক্তিগত. কিন্তু অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে শিল্পে সেক্সকে বাস্তবতার সঙ্গে মেনে নেওয়া হয়েছে। কামশাস্ত্র থেকে খাজুরাহো ও কোনারকে অনেক প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু ওদেশে ডি. এইচ. লরেন্স 'লেডী চ্যাটারলিস লাভার' লিখে বদনাম কুড়িয়েছে। তিনিই অগ্রদূত। আদিরসকে সাহিত্যে বাস্তবসম্মত করেছেন লরেন্স কামরসেও জলাংশ অনেকটা। এই

জলাংশও পুরুষপিপাসার তৃষ্ণানিবারক। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কয়েক মুহূর্ত' কবিতায় তার সোচ্চার স্বীকৃতি।

'তোমার দ্বিধার মধ্যে চলে যেতাম
ভয় নেই ১০৮ চুম্বনের দাগ
থাকবে না সকালে ওই বুকের ভিতরে
মণি চুরি যায়নি
বুক শুধু মুখের গরমে
কিছুক্ষণ ডুবে ছিল যোনির ভিতরে
জিভ লবণের স্বাদ ছাড়া আর
কিছুই আনেনি তবু অসম্ভব
ভালবাসাবাসি হোল অসম্ভব
এই নিয়ে তোমাকে আমার
একুশটা পুনর্জন্ম দেওয়া হোল
এত মৃত্যু মানুষেরও জানা ছিল'।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ পৃষ্ঠাঃ ৮৪

বিখ্যাত মার্কিন যৌনবিশারদ লেখিকা ন্যান্সী ফ্রাইডে পুরুষদের গুপ্তস্বপ্ন সংগ্রহ করে বই ছেপেছেন যার নাম 'Men in love'. তাতে একটি সম্পূর্ণ বিভাগের নামকরণ করেছেন—water sport সে পরিচ্ছেদে অনেক পুরুষদের রমণীর মুত্র পান ও স্নান করার সত্য ও স্বপ্ন দু'টোর বর্ণনা আছে। হ্যারল্ড রবিন্স-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'কার্পেটবেগারস'-এর একজন হলিউড প্রযোজকের বর্ণনা রয়েছে যে পার্টিতে মদ্যপানে তপ্ত হওয়ার পর বাথটবে নগ্ন হয়ে শুয়ে সুনামী ও অনামী চিত্রতারকাদের 'সোনালী ধারা'য় স্নান করে যৌনসুখ অনুভব করতেন। সবচেয়ে বড় কথা এ চরিত্রটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়, বাস্তব চরিত্রের ভিত্তিতে রচিত। প্রসঙ্গতঃ 'ফ্রিডম্ এট মিডনাইট্' গ্রন্থে লেখকদ্বয় লিখেছেন হায়দ্রাবাদের নিজামবাহাদুর তাঁর অতিথিশালায় প্রত্যেক বাথরুমে গোপন ক্যামেরা রেখে ছবি তুলতেন। অনেক নামজাদা রাজা, রানী, সাহেব, মেমসাহেবের জলত্যাগ ছবি তাঁর অশ্লীল-যৌনসামগ্রী সংগ্রহের শোভা বর্ধন করেছে! এরল ফ্লিনের আত্মজীবনীতে তাঁরও এরূপ সংগ্রহের উল্লেখ আছে। সুতরাং হলিউডের প্রযোজকের ঘটনা মিথ্যে নয়।

রক্ষণশীল মানসিকতার পাঠক, বিশেষ করে পাঠিকাদের কাছে এসব অবিশ্বাস্য লাগতে পারে। বিকার মনের রোগ বলে ঘৃণ্য মনে হতে পারে। কিন্তু এ বিকার নয়, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। শুধু হ্যারল্ড রবিন্স নন, জন আপডাইক (বিশ্বাস না হয় 'দি কাপলস্' উপন্যাস পড়ে দেখবেন), সিডনি সেলডান্ থেকে নারী লেখিকা জুডিথ ক্রানজ্ ও জ্যাকি কলিনসের লেখায় দেখবেন এ সত্যের সাহসী বিবরণ। চিত্রজগতে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। হার্ডকোর পর্নোগ্রাফীর উল্লেখ করছি না। ধরুন বিখ্যাত পরিচালক বার্নারডো বার্তুলুসির বিখ্যাত ছবি—'লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যারিস' ছবিটি। এক সময়ে আলোড়ন তুলেছিল এ ছবি। নায়ক মার্লন ব্রাণ্ডো ও নায়িকা ছিলেন মারিয়া স্নেভার। দৃশ্যটি উপন্যাসের পাতা থেকে তুলে দিচ্ছি—

"She stepped out into the corridor, and walked back towards the bathroom....Jeanne paused to pat her hair, and to glauce at her make-up in the mirror. Then, in a sudden daring moment, she pulled down her pants, raised her coat and skirt, and sat on the toilet. She knew it was an out ragious thing

to do without locking or even closing the door, that he might walk into the room at any moment, and yet that possibility exhitarated her."

– Last Tango In Paris
Robert Alley
Page : 10

এ দৃশ্যে কি পেলেন ? নায়িকা নিজে প্রদর্শন করার জন্য উৎসুক। সুতরাং পুরুষ রমণী দু'পক্ষই এ খেলার খেলোয়াড়। সোনালী ধারার জলকেলীতে পুরুষরা উৎসাহী তো মেয়েরাও উদাসীন নন! প্রশ্ন উঠতে পারে কেন ? কেন জলত্যাগের মত একান্ত স্বাস্থ্যকর কর্মের জন্য এত দর্শন-পিপাসা, পান-পিপাসা আর স্নান-পিপাসা ? ন্যান্সি ফ্রাইডে এই কেন'র উত্তর দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করার সময় যথেষ্ট সংক্ষেপ করার চেষ্টা করেছেন আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ফাংশান। এক অঙ্গে বহু কর্মক্ষমতার শক্তি দিয়েছেন। যেমন ধরুন হাত। কত কাজ করে এই হাত। সৌজন্য প্রকাশ করার জন্য করমর্দন, যুক্ত করে নমস্কার করে হাত, ভোজন করে, লেখে, টাইপ করে, আত্মরক্ষা করে, আক্রমণ করে, উন্মুক্ত হস্তে ভিক্ষা করে, উদ্যত মুষ্টিতে প্রতিবাদ করে, নারীর কামাঙ্গে হাত বুলিয়ে গরম করে আবার ক্রন্দনরত শিশুর পিঠে হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করে। আরও অনেক কাজ করে এই হাত। মুখেরও অনেক ফাংশান। খাওয়া, কথা বলা, আদর করা। কিন্তু যৌনাঙ্গের অবস্থান সৃষ্টিকর্তা বড় বেশি স্বল্প পরিসরে সৃষ্টি করেছেন। মুত্রদ্বার, যৌনদ্বার ও গুহ্যদ্বার এই তিন অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গত্রয়ীকে এত বেশি সন্নিকটে সন্নিবদ্ধ করেছেন যে এরকম সহ অবস্থান দেখে অবাক হতে হয়। আমরা ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও সিংহল একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারি না। অথচ দেখুন, এই তিন অঙ্গের কি শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। একেবারে কোলাকুলি গলাগলি করে রয়েছে! আসলে মূল নলী ও যোনিকে একই অঙ্গ বলা উচিত। দু'টো ফাংশান। ছেলেদের, বলাবাহুল্য, দ্বিধাহীন একই অঙ্গ। এই নৈকট্যের জন্য যত গোলযোগ। ইংরিজী স্লাং ভাষায়— Pee-hole, She-hoke, Ass-hole, যৌনাঙ্গের সন্নিকবর্তী বলেই এই তিন বিবরই পুরুষের আকর্ষণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবচেতন মনের শৈশবই এই জল উৎসবে অংশগ্রহণ করায় পুরুষের। বিশ্লেষণের অধিকন্তু নেহাৎই অপ্রয়োজনীয়। এবার আসুন আমাদের তৃষ্ণার জল সম্পর্কে একটু আশাবাদী পর্যালোচনা করা যাক। জলকষ্টে এ দেশে প্রচুর জনহানী হয়। একঃ একেবারেই জল না পাওয়া। দুইঃ দূষিত জল পান করে রোগগ্রস্থ হওয়া ও প্রাণহানী। দু'টো খুব বড় সমস্যা। ওয়ার্লড হেলথ অর্গানাইজেশন জানাচ্ছেন প্রতি বছর। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন পদ্ধতির জন্য। পৃথিবীর ৮০% রোগও হয় এই কারণে। খুব আশাজনক পরিস্থিতি নয়। কিন্তু সব দেশে এ সমস্যা নিয়ে সব জনকল্যাণী সরকার, বুদ্ধিজীবী ও বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করছেন। সমাধান নাগালের বাইরে নয়। এখন এ দেশের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। ওপার বাংলার এক কবি মহাদেব সাহা লিখেছেন—

'ভীষণ পিপাসা এইখানে। জল চাই
মানুষের পিপাসার জল চাই
মিউনিসিপ্যালিটির এই বড় বড়
ট্যাঙ্কের তলায়
বালি আর কঠিন কাঁকর জমে আছে।
আমাদের বিশুদ্ধ গলায়

টুঁট লায়া হুঁ ওহী,
গীত ম্যায় তেরে লিয়ে।"

অপূর্ব ছিল সেই গানটি।

জনপ্রিয় ইংরেজী একটি পপ্ গান ছিল যার শুরু হয় "ক্রিং ক্রিং ক্রিং ইট্স্ দা সিণ্ডিকেট্ স্পিকিং"—তারপর ফোনে আসে মাফিয়ার ভয়াবহ নির্দেশ। গানটি জনপ্রিয় ছিল। ইতিহাসে যেমন রুজভেল্টের দ্বিতীয় যুদ্ধের সংবাদ এসেছিল টেলিফোন মারফৎ সেরকম আরেকটি ভয়াবহ টেলিফোনের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। সেটা হল দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়কারই ঘটনা। হিটলারের নাজি বাহিনী হেরে যাচ্ছিল। পিছু হটতে হটতে রাশিয়া থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে জার্মান সৈন্যসামন্ত। এবার প্যারিস ছাড়তে হবে। হিটলার ফ্রান্স দখল করেছিল বি'শ যুদ্ধে, গুলিবোমা দিয়ে প্যারিসের কোনই ক্ষতি করা হয়নি। ফ্রান্স অতি সহজে পরাজয় মেনে নিয়েছিল। কিন্তু হিটলার যখন হেরে যাচ্ছিল তখন ফ্রান্স ছেড়ে পালাবার সময় প্যারিসের জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল প্যারিসে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দাও। কিন্তু জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ হিটলারের সে আদেশ অমান্য করেছিলেন। তখন হিটলার ঘন ঘন ফোন করেছেন সে সৈন্যাধ্যক্ষকে। তাঁর ছিল একটাই প্রশ্নঃ IS PARIS BURNING ? প্যারিস কি জ্বলছে ? পরবর্তীকালে হিটলারের এই ঐতিহাসিক ফোনবার্তার উপর বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছেন FREEDOM AT MIDNIGHT এর লেখকদ্বয় ল্যারি কলিন্স্ ও ডেমিনিক ল্যাপারী। বইটার নামই হলঃ IS PARIS BURNING. এই পুস্তকের আধারে হলিউড ছবিও প্রস্তুত করেছিল। দেখলেন তো ফোনের ঐতিহাসিক অবদান কত রয়েছে ? আজকাল সব দেশের প্রধানের কাছে টেলিফোনের হট লাইন থাকে। সেটা তুলে ফোনের একটা নির্দেশে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ শুরু হতে পারে। উল্টোটাও হতে পারে। মানে যুদ্ধ চলাকালীন হটলাইনের এক ফোনে যুদ্ধবিরতিও হতে পারে।

সিনেমায় ফোনের কথা বলছিলাম একটু আগে। হলিউডে টেলিফোন নিয়ে অনেক ছবি হয়েছে। যেমন বিখ্যাত একটি ছবি হয়েছিল যার নাম ছিল "I KNOW WHO YOU ARE. I SAW WHAT YOU DID." ক্রাইম থ্রিলার ছবি। গল্পটি একটি ছোট ১০/১২ বছরের দুষ্টু মেয়ে যে কোন ফোন নম্বর ঘুরিয়ে একথা বলতো— I know who you are, I saw what you did বলেই ফোন রেখে দিতো। যার কাছে ফোন যেতো সে যদি পরকীয়া করে থাকে বা অন্য কোন কুকর্ম গোপনে করে থাকে, সে চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই মেয়েটি এই কৌতুক করার ফোন করে মিছে ভয় দেখাতো। বেশ মজা পাচ্ছিল মেয়েটা। তারপরই হল বিপদ। ফোনটা ঘটনাচক্রে পৌঁছে গেল একজন খুনীর কাছে। সদ্য খুন করে এসেছে। ফোন পেয়ে প্রমাদ গুনলো। তারপর ঠিক করলো এই ফোন যে মেয়েটি করেছে সে নিশ্চয়ই তার খুন করার প্রত্যক্ষদর্শী। সুতরাং এই সাক্ষী মেয়েটিকে পুলিশে খবর দেয়ার আগেই খতম করে দিতে হবে। খুনী মেয়েটির পরিচয় পেয়ে যায়। তারপর শুরু হয় আতংক। মেয়েটির উপর অনবরতঃ হামলা হতে থাকে। হত্যার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ভীতা মেয়েটি মরতে মরতে বেঁচে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাহায্যে মেয়েটির প্রাণ বাঁচে ও হত্যাকারী গ্রেপ্তার হয়। কৌতুক ফোনের এই হল শেষ পরিণাম। দারুণ ছবি ছিল এই "আই নো হু ইউ আর, আই স হোয়াট্ ইউ ডিড্"।

আরেকটি হরার-ক্রাইম ছবি আছে ফোনের উপর। ছবিটার নাম— "DID YOU CHECKED THE CHILDREN ?" ভয়াবহ এক সাইকোপ্যাথের গল্প। মানসিক রোগগ্রস্ত হিংস্র শিশু হত্যাকারীর কাহিনী। সে তাকে তাকে থাকতো যে বাড়িতে কর্তা গিন্নি বেবিসিটারকে বাচ্চাদের দেখার জন্য রেখে বাড়ির বাইরে খেতে বা অন্য কোন

will give you a ring at 4'30. মেয়েটি মহাচালু, জবাব দিয়েছিলঃ I will appritiate that. See that you select a good diamond ring for me. বুঝুন মেয়ের চালাকি। ফোনের রিং পেতে চায় না সে, পেতে চায় অন্য রিং, ডায়মণ্ড রিং, মানে হীরের আংটি! মেয়েরা ভালো করেই জানেঃ Flower for an hour but diamonds are forever. মানে ফুল দিও না ফুল একঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে যাবে। উপহার দিতে চাও হীরে দিও। কেননা Diamonds are forever. হীরে হল চিরস্থায়ী। সোজা কথায় ফোন, ফুলে বা বিরহের কান্নায় মেয়ে বসনমুক্ত হবে না। সেজন্য চাই সোনাদানা, হীরে, চুনী পান্না। যতোই আপনি কান্না কাঁদুন, রেস্তোরাঁয় ভালো রান্না খাওয়ান, মেয়ে কিছুতেই লজ্জাত্যাগ করে শয্যাগ্রহণ করবে না, তার জন্য চাই জরিপার আব জড়োয়া, হীরে চুণী পান্না। বুঝেছেন? সুতরাং ফোনের রিং করে "দার্জিলিংএ জনতা আছে মানুষ নেই" জাতীয় "শেষের কবিতা"র লাইন শুনিয়ে নারীবিজয় আজকের দিনে অসম্ভব হয়ে গেছে। পদ্য শুনিয়ে পদ্মআঁখি কোন "নাটোরের বনলতা সেন" পাবেন না। আলিপুরের মুনমুন সেনকেও পাবেন না। সে আশায় বলি। সে যুগ অতীত হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, ফোনের কথায় আসুন। ফোন আবিষ্কৃত হবার পর কবির অভাব হয়নি ফোনের স্তুতি গাইবার জন্য। বেঞ্জামীন ফ্র্যাংকলিন টেলর পুলকিত চিত্তে এই কাব্যকুসুমকলির অঞ্জলি দিয়েছিলেনঃ—

"The Far is near. Our flubist whisper fly where cannot falter, thunders faint and die your little song, the telephone can float As tree as fetterns, as bluebird's note."

প্রথমে গ্রাহাম বেল ভেবেছিলেন টেলিফোনে কথা শুরু করা হবে Hoy Hoy বলে। জাহাজের নাবিকদের ভাষা Ahoy থেকে উনি এই Hoy শব্দের প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন। Hoy থেকে পরে অবশ্য Hello কথাটার উৎপত্তি হয়েছে। সর্বত্র Hello বলে ফোনের বার্তালাইন শুরু হয়। সর্বত্র বলা ভুল। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন Hello র প্রতিশব্দ হয়ে গেছে। যেমন জাপানীরা বলে "খুসি খুসি"। রাশিয়ানরা বলে "স্লসাইয়ু", ইতালীয়ানরা বলে "প্রণ্টো" (যার মানে 'তৈরী'), চীনেরা বলে উইই—উইই। 'উইই' পরে দীর্ঘ যতি তারপর দ্বিতীয় "উইই"। এর কোন মানে নেই। ফোনের জন্য একধরনের সম্বোধন আর কি।

তাহলেই দেখলেন তো ফোনের কতো সম্বোধন-ধ্বনি? ফোন করার জন্য বলবার ভাষাও বিভিন্নতায় ভরা।

কেউ বলবেঃ Please phone me.
কেউ বলবেঃ I will expect your Hello.
কেউ বলবেঃ Just give me a ring.
কেউ বলবেঃ Don't forget to call me.
কেউ বলবেঃ Give me a tinkle.

হিন্দী ছবিতে ফোনের ব্যবহার প্রচুর। আগে ফোনে একটি ছবিতে গানও গেয়েছিলঃ

"মেরা পিয়া গিয়া রেঙ্গুন
ওহাঁসে কিয়া টেলিফুন" ইত্যাদি।

যাঁরা বিমল রায়ের 'সুজাতা' দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন নায়ক সুনীল দত্ত নায়িকা নূতনকে ফোনে একটি সম্পূর্ণ তিনমিনিটের গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। তালাদ মেহমুদের কণ্ঠে সে গানটির শুরু ছিলঃ

"জ্বলতে হ্যায় জিসকে লিয়ে,
তেরি আঁখোকি দিয়ে

তারপর ১৭ই মে বোস্টন শহরে, হোমস্ পরিবারে পাঁচটি ব্যবসাকেন্দ্রে ফোন লাগানো হয়েছিল সুইচবোর্ড সহ। সুইচবোর্ড লাগানো এটাই প্রথম। তখন টেলিফোন অপারেটর মারফৎ ব্যবহার প্রথা ছিল। ছেলেরা এ কাজ প্রথম পেয়েছিল। কিন্তু অনেক প্রতিবাদ এলো যে নারীকণ্ঠ হলেই অপারেটর পুরুষরা নোংরা ভাষায় অশ্লীলতা করতো। তখন টেলিফোন কোম্পানী ঠিক করলো ছেলে নয়, শুধু মেয়েদের অপারেটর হিসেবে রাখা হবে। তাই হল। ১৮৭৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর প্রথম যে নারী অপারেটর হয়ে টেলিফোন কোম্পানীতে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর নাম হল—এখানাট্। আপনারা জানের স্টক্ এক্সচেঞ্জে কিরকমভাবে ফোনের ব্যবহার হয়। এ ব্যবসা অচল হয়ে যাবে ফোন ছাড়া। এবার শুনুন প্রথম যে স্টক্ এক্সচেঞ্জে ফোন লাগানো হয়েছিল সেটা হল নিউ ইয়র্ক স্টক্ এক্সচেঞ্জ। সেটা ছিল ১৩ই নভেম্বর, ১৮৭৮ সালে। প্রথম দিকে টেলিফোন অপারেটরদের টেলিফোনগ্রাহকদের নাম স্মরণে রাখতে হতো। কোন নম্বরের ব্যবস্থা ছিল না। সংখ্যা বাড়বার পর সেটা অসম্ভব হয়ে দাড়ালো। তখন, ১৮৭৯ সালে প্রথম নম্বরের ব্যবস্থা হল।

টেলিফোন যন্ত্রের মালিকদের আলাদা আলাদা নম্বর দেওয়া হল। তার অনেক পরে টেলিফোন ডিরেকটরী ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। পাবলিক টেলিফোন, যেখানে খুচরো কয়েন দিয়ে টেলিফোন করা যায়, সেটা আবিস্কার করেছিলেন উইলিয়াম গ্রে, ১৩ই আগস্ট ১৮৮৯ সালে। প্রথম পাবলিক টেলিফোন লাগানো হয়েছিল আমেরিকার কানেক্টিকাট্ শহরে। অপারেটর ছাড়া, ডিরেক্ট ডায়াল টেলিফোন আবিস্কার করেছিলেন এলমন স্ট্রোজার ১৮৯১ সালে, ১০ই মার্চ।

প্রথম আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাঁর টেবিলে এ যন্ত্র ব্যবহার শুরু করেছিলেন ১৯২৯ সালে ২৭শে মার্চ। সেই প্রেসিডেন্টের নাম ছিল হার্বাট হুভার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবর ফ্র্যাংকলীন রুজভেল্ট পেয়েছিলেন প্যারিস থেকে এক ফোনে যাতে তাঁকে খবর দেয়া হয়েছিল যে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে। সেই বিখ্যাত দিনটি ছিল ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সাল, সময় ছিল দুপুর দুটো বেজে চল্লিশ মিনিট। টেলিফোনের দৌলতে পৃথিবীটা কতো ছোট হয়ে গেছে দেখুন। সেজন্যই জন ব্রুক্স্ বলেছেন টেলিফোন সম্বন্ধেঃ Man, instead of making himself heard a few hundred yards away with a shout, can make himself heard around the world with a whisper.

টেলিফোনের জন্মকথা বিস্তারিত ঠিকুজী শোনালাম। কিন্তু জ্ঞান যখন দিচ্ছি আধাজ্ঞান দিয়ে কি লাভ? এবার আসুন শোনাই আমাদের দেশে, ভারতে কখন এ যন্ত্র এসেছিল ও ধীরে ধীরে কিভাবে এ রোগের বিস্তার ঘটেছিল! শুনুন টেলিফোন চরিত মানস।

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কারের পাঁচ বছর পরই ১৮৮২ সালে বোম্বেতে ফোর্ট অঞ্চলে ইংরেজ শাসক শ্রেণী প্রথম টেলিফোন কোম্পানী চালু করেছিলেন বোম্বেতে। নাম ছিল বোম্বে টেলিফোন কোম্পানী। তার ঠিক এক বছর পর ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজ ও কোলকাতায় টেলিফোন চালু হয়েছিল।

ভারতে টেলিফোনের উল্লেখযোগ্য তথ্য হল ৭০০ লাইনের প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১৯১২ থেকে ১৯১৪ সালে বৃটিশ সরকার স্থাপন করেছিল তৎকালীন গ্রীষ্মের রাজধানী সিমলা শহরে। অধিক দূরত্বের তার মারফৎ সংযোজন করা হল প্রথমে (যাকে ইংরেজীতে বলা হবে "লং ডিসটেন্স কনেকশন্" লাহোর থেকে লায়লাপুর। এই দুটো শহরই দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে পাছারের অংশ হয়ে গেছে। ১৯৬০ সালে এস. টি. ডি. (মানে "সাবসক্রাইবার ট্রাংক ডায়ালিং" শুরু হয় এদেশে কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ শহরে। নভেম্বর, ১৯৬০, মানে মাত্র ত্রিশ বছর আগের ব্যাপার। তারপর এস. টি. ডি. এখন সারা ভারতে সব শহরেই ছড়িয়ে গেছে।

১৯৪১ সালে ইন্টারন্যাশানাল কল্ স্যাটিলাইট মারফৎ দ্রুত যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। পুণার নিকটবর্তী আরভি অঞ্চলে বিক্রম আর্থ স্টেশন স্থাপন করা হয় প্রথমে। এখন অবশ্য সব বিদেশী কল্ (আই. এস. ডি) স্যাটিলাইট মারফৎ তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে দেয়। ১৯৪৩ সালে এদেশে ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ এসে যায়। সুতরাং পৃথিবীর যে কোন প্রগতিশীল দেশের সঙ্গে ভারতের আর দূরত্ব রইল না। টেলিফোনের অতি আধুনিক যে কোন আবিষ্কার এখন ভারতের আয়ত্বে। কর্ডলেস্ বলুন, আর সেলুলার ফোনই বলুন (১৯৪৬ থেকে শুরু হবে)। বিশ্বভ্রমণের প্লেনে বসে ফোন করতে পারেন। চলন্ত ট্রেনে বসেও ফোন করতে পারবেন (১৯৪৫ এ শেষাশেষি)। সুতরাং আমরা এখন যে কোন দেশের মতোই গতিশীল ও সমতুল্য।

যাক, টেলিফোনের তথ্যবহুল ইতিহাসের জ্ঞান তো অনেক দেয়া গেল, এবার বলি টেলিফোনের সম্পর্কে আমার থিসিস, আমার অভিজ্ঞতার পাঁচালী।

টেলিফোন হল বেনারসের লাড্ডু। যে খায় সে পস্তায়, যে না খায় সেও পস্তায়। ইংরেজীতে একটা আয়রনির কথা প্রচলিত আছে। সেটা হল এই। সিনেমায় অভিনয় করতে নামার সখ প্রায় সবাইকার রয়েছে। উদ্দেশ্য আমি একজন উত্তমকুমার, একজন দেব আনন্দ, একজন অমিতাভ বচ্চন হয়ে উঠি। সবাই জানুক, সবাই চিনুক—এই হল স্বপ্ন ও সাধনা। কিন্তু আইরনিটা হল বাই চান্স যে মুহূর্তে আপনি নামকরা নায়ক হয়ে উঠলেন, তক্ষুনি আপনার ইচ্ছেটা হয়ে যায় বিপরীত। মানে আপনি তখন কালো চশমার আড়ালে চোখ ঢেকে নিজেকে নেপথ্যে রাখতে চান, ইচ্ছেটা হল, আপনাকে কেউ যেন চিনতে না পারে, আপনার যেন সাধারণ লোকের মতো ফ্রিডম থাকে। কেননা, চিনলেই ঘিরে ধরবে, অটোগ্রাফ চাইবে, ছবি তুলতে চাইবে, মবড্ হবেন। প্রথমে পরিচিত হবার বাসনা, পরে অপরিচিত থাকবার অপচেষ্টা। বলুন, আইরনি নয়? টেলিফোনও তাই। প্রথমে নতুন নতুন এলে আপনার ইচ্ছে ফোন আসুক, বেল বাজুক, আপনি প্রাণ খুলে কথা বলতে চান। পরে ফোন বাজলেই আপনার রাগ হয়। মনে হয় কি জ্বালাতন বাবা, অনবরতঃ বেজে বেজে বিরক্ত করছে! মনে হয় আপনার কোন প্রাইভেসি নেই। ফোন এলে অসময়ে বেজে ওঠার অভ্যেস থাকে তার। গার্লফ্রেণ্ডের ঠোঁটে চুমু খাবার সময়, খেতে বসার সময়, বাথরুমে তিনটে প্রয়োজনীয় কর্ম করার সময় (বলা বাহুল্য সে তিনটে হচ্ছে ছোট বাথরুম, বড় বাথরুম, আর স্নান) কখনো কখনো যৌনমিলনের ক্লাইম্যাক্স এর একান্ত গোপনীয় সময়েও! কি জ্বালাতন বলুন তো? বিরক্তিকর টেলিফোন অবহেলা করার সভ্য প্রক্রিয়া হলো ফোনকর্তাকে বলা, —যে আপনি বাথরুমে রয়েছেন, পরে যেন ফোন করা হয়।

এ প্রক্রিয়া আবার আপনাকে রসিকতার পাত্রও বানাতে পারে। যেমন দেবযানী চওবল বলে 'স্টার এণ্ড স্টাইল' পত্রিকার একজন মহিলা সাংবাদিক অনবরতঃ হৃষী কাপুরকে ফোন করে একটাই জবাব পেয়েছেন,—সাহেব এখন বাথরুমে আছেন। চান করছেন। বার বার একটাই অজুহাত দিয়ে হৃষী কাপুর সাংবাদিককে অবহেলা করেছে। তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন দেবযানী চওবল। পরে সংখ্যায় 'স্টার এণ্ড স্টাইলে' লিখেছিলেনঃ Rishi Kapoor must be the cleanest man in the whole of film industry. Because he is the only actor who takes bath from 8' o clock in the morning to 12' o clock noon. I have checked this fact on telephone.

বুঝুন কি সেয়ানা মেয়ে। হৃষী কাপুর যে মিথ্যে বলেছে সেটা দেবযাত্রীর অজ্ঞাত নয়। সুতরাং কলমের খোঁচা দিয়ে বলেছেন,— "যে চার ঘণ্টা ধরে ফোনে শুধু জবাব দেয় "সাহেব বাথরুমে চান করছেন" সে নিশ্চয়ই সব নায়কদের মধ্যে cleanest man হবে!" ভাষার দোষে মেয়েদের পটানোর জন্য ফোন করার ঝামেলা রয়েছে। আমি একবার একটি মেয়েকে ফোন করেছিলামঃ কথার শেষে বলেছিলাম, —Tomorrow I

।। টেলিফোন ।।

আধুনিক জীবনে টেলিফোন বিশিষ্ট অপরিহার্য-অঙ্গ। পুরুষের কাছে নারীর সঙ্গ যেমন কাম্য, সেরকম টেলিফোনও প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। নারীর সঙ্গে সমতুল্যও বটে। মাসে একবার, সপ্তাহে একবার, কারুর কারুর আবার প্রতিদিন একবার শরীরের তাগিদে নারীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। তখন, সে সময়ের জন্য, নারী অপরিহার্য। বাকি সময়, বলা বাহুল্য- অসহ্য। টেলিফোনও তাই। মাসে একবার, সপ্তাহে একবার বা দিনে একবার আপনার হয়তো টেলিফোনের প্রয়োজন হয়। অন্যসময় আপনার ইচ্ছে হয় টেলিফোন থেকে আপনার দূরত্ব থাকুক কয়েক যোজন। তখন তার ঝংকারকে মনে হয় ক্ষ্যাপা মহেশ্বরের টংকার। মনে হয় এ গর্জন বর্জন করতে পারলেই ভালো! তখন টেলিফোনকে ফান্ মনে হয় না, ফানিও মনে হয়না, মনে হয় ফনী। সাপ। নারীর সঙ্গে কত মিল দেখুন। নারীকে সময়বিশেষে অমৃত মনে হয়, আর অন্য সময় বিষ। টেলিফোনকে হুবহু তাই। বিয়ের আগে প্রেমিকার ফোনের ঘণ্টাকে মন্দিরের ঘণ্টার মতো শ্রুতিমধুর লাগে, আর বিয়ের পর বৌ-এর ফোনের ঘণ্টার সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির ঘণ্টার সঙ্গে, নতুবা জেলখানা-পাগলাঘণ্টার সঙ্গে! টেলিফোনের তিনটে ভালো গুণ রয়েছে—তিনটে সুসংবাদবাহী ফোন, মানে অর্থপ্রাপ্তিসংবাদ, সন্তানপ্রাপ্তিসংবাদ ও প্রেমপ্রাপ্তিসংবাদ। এই তিন ফোন আকর্ষণীয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে তিন বস্তু খুব লোভনীয়। মুখ (যাতে একজোড়া ঠোঁট রয়েছে চুমু খাবার জন্য), স্তন ও যোনি। বাকি সব অখাদ্য। মাথা (যাতে কুবুদ্ধির ব্রেন থাকে) পিঠ ও পাছা। এসবকে কি আর বলবেন—আগাছা? এত সব বিশ্লেষণ করে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শচীন ভৌমিকের আবিস্কার কি করেছে? ফোনের লিঙ্গবিচার। বুঝেছেন? শচীন ভৌমিক প্রমাণ করে দিল ফোনের লিঙ্গ। ফোন পুংলিঙ্গ নয়। স্ত্রী লিঙ্গ। এই মহান আবিষ্কারের জন্য শচীন ভৌমিকের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত!

১৮৭৬ সালে ৭ই মার্চ আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল্ আমেরিকান পেটেন্ট নাম্বার ১৭৪ ও ৪৬৫ নম্বরের যে দূরধ্বনি যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন সেটার নামই হল—টেলিফোন। বেল্ সাহেবের সে যন্ত্র, অন্যের কথা জানি না। আমার জীবনকে রীতিমতো হেল্ বানিয়ে দিয়েছে। টেলিফোন সম্পর্কে প্রথমে আপনাদের কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করি। সোজা কথায় আসুন আপনাদের কিছু জ্ঞান দান করি।

জনসাধারণের প্রথম যার বাড়িতে টেলিফোন লাগানো হয়েছিল তাঁর নাম ছিল আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্ এর চার্লস উইলিয়াম। তাঁর কোর্টনস্থিত অফিস থেকে নিজের বসতবাড়িতে এ যন্ত্র লাগানো হয়েছিল। এ যন্ত্রটি ১৮৭৭ সালে ৪ঠা এপ্রিল লাগানো হয়েছিল।

এক বিন্দু শীতল জলের স্বাদ দিতে
পারে এমন প্রকৃত কোনো হ্রদ নেই
কাছে কিংবা দূরে যেখানেই
তাকাই কেবল আজ চোখে পড়ে ধোঁয়ার কফিন
সাগর আর নদীর জল প্রতিদিন
বাষ্পীয় জাহাজে চড়ে যায় দূরবর্তী
চাঁদের শহরে
সেইসব প্রাণশূন্য ঘরে
বসে পৃথিবীর শ্যামল জলের বাজার
থরে থরে গজায় বৃষ্টিবারি, লোকালয়
এখানে হাজার
মরে পিপাসায়, জল নেই শহরে কোথাও
শহরে কোথাও আজ শান্তি নেই, যদিও
অনর্গল শান্তির ডংকা পেটাও
খুলে দাও জলছত্র, তবু হায়
এ শহরে মরে লোক ভয়ে
জলশূন্যতায় আর
পিপাসায়।'

জলছত্রঃ মহাদেব সাহা

খুবই বিষাদপূর্ণ দুঃসহজনক চিত্র।

একটি সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা হবে ৬৩০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার। সেটা বেড়ে দাঁড়াবে ৭৭০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার। ('যাদের কথা নদীর জলে'—বশিষ্ঠ বসু 'দেশ'। জল-বিশেষাঙ্কঃ ২১ জুন ১৯৯৬) লোকসংখ্যাও অনেক বাড়বে। তাহলে? কিন্তু সরকার শুরু করেছেন। গঙ্গা পরিশোধন পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাঁধ বেঁধেছেন কয়েকটি, খাল কেটে জলগতি নিয়ন্ত্রণ করছেন অনেক জায়গায়। নলকূপ, মিউনিসিপাল ওয়াটার সিস্টেমের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জানি বলবেন, সমস্যার তুলনায় সমাধান পর্যাপ্ত নয়। জানি পর্যাপ্ত নয়। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের একটি প্রধান ভূমিকা আছে। জল সঞ্চয় করা, অপচয় বন্ধ করা, জল শোধন করে (গরম করে, ফিল্টার করে) পান করা ও সবচেয়ে বড় কর্তব্য জলকে বিশুদ্ধ রাখা মানে নদীনালা সাগরকে পলিউট মানে নোংরা না করা। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত কর্তব্য শুধু নয়, বড় বড় কলকারখানার মালিকরাও আবর্জনা যেন জলে বিসর্জন না দেন। আমাদের শহরের মলমূত্রবাহী সব হিউম্যান ওয়েস্টকে নদী বা সমুদ্রে (যে শহরের যা নিকটে) ফেলা হয়। এই ওয়েস্ট ডিসচার্জ সিধে না ফেলে ট্রিট্ করে ফেলা যায়। পশ্চিমে তাই করছে। ওয়েস্ট থেকে এনার্জি তৈরি হচ্ছে। তারপর অক্ষতিকর বাকি অংশ জলে ফেলা হয়। এদেশে, সর্বপ্রথম বোম্বেতে এ পরিকল্পনা কার্যকরী করা শুরু হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজে নিজের কর্তব্য করুন। তাহলে আশাবাদী হওয়ার দোষ নেই। মনে রাখবেন, জলই জীবন। জীবনকে বাঁচাতে হলে জলকেও বাঁচাতে হবে। জল বাঁচলে আপনিও বাঁচবেন। আর, সত্যি বলতে, লেখাটা শেষ করে আমিও বাঁচলুম!

এপয়মেন্ট রাখতে চলে যান। বেবিসিটার সময়মতো বাচ্চাদের খাইয়ে তাদের ঘরে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতো। ঘুমোবার পর বাতি নিভিয়ে মেয়েটি হয়তো হলে বসে টি.ভি দেখছে আর কর্তা গিন্নির জন্য অপেক্ষা করছে। ঠিক তক্ষুনি ঝন-ঝন করে বেজে উঠতো ফোনের ঘন্টা। Have you checked the children ? মেয়েটা প্রশ্ন করতো আপনি কে কথা বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোন কেটে যেতো। এবার সে মেয়েটি ধীরে ধীরে বাচ্চাদের ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলেই যে দৃশ্য দেখতো সেটা হল নিষ্ঠুরভাবে বাচ্চারা ছুরিকাঘাতে মৃত পড়ে আছে। রক্তে বিছানা ভেসে যাচ্ছে। মেয়েটি মুর্ছা যেতো। তারপর বাপমার প্রত্যাবর্তন, পুলিশ, এম্বুলেন্স, সংবাদপত্র। এ ছবিটির চিত্রনাট্য ছিল অসাধারণ। সর্বশেষে অবশ্য একজন অবসরপ্রাপ্ত ডিটেকটিভ অফিসার হত্যাকারী গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হন। খুব চমকপ্রদ ছবি ছিল এই "DID YOU CHECKED THE CHILDREN ?"

ফোনের দারুণ সুন্দর ব্যবহার ছিল সিডনি পয়েটারের একটি বিখ্যাত ছবিতে। নাম "SLENDER THREAD". কাহিনী ছিল একটি জীবনযুদ্ধে পরাজিতা নায়িকা আত্মহত্যা করার জন্য বেশী পরিমাণে বিষ পান করেছেন, তারপর, নিউইয়র্কে এক ফোন অপারেটর সিডনি পয়েটরকে ফোন করে বললেন,—আমি বিষ খেয়েছি। আত্মহত্যা করছি। বড়জোর আধঘণ্টা আমার আয়ুকাল বাকি আছে। ফোন অপারেটর মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্য নানাভাবে নানা ছুতোয় তাকে কথা বলাতে লাগলো যাতে মেয়েটি সহজে জ্ঞান না হারায়, আর অন্যদিকে পুলিশকে খবর দিল যাতে এম্বুলেন্স ডাক্তারসহ মেয়েটির ঘরের ঠিকানায় পৌঁছে যায়। ছবিতে দেখানো হয়েছিল মেয়েটির জীবন পাতলা সুতোর উপর নির্ভর করছিল কিন্তু ঠিক সময়ে পুলিশ এম্বুলেন্স নিয়ে পৌঁছে যায় ও মেয়েটিকে বাঁচাতে সাহায্য করে। SLENDER THREADও অপূর্ব ছবি, যেটা সম্পূর্ণ একটি মৃত্যুকামী মেয়ের একটি ফোন-কলের উপর রচনা করেছিল কাহিনীকার ও পরিচালক।

"জিজি" বলে একটি ফরাসী ছবিতেও ফোনকে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স দেয়া হয়েছিল। নায়িকা ছিলে লেসলি ক্যারন। পতিতা-জীবননির্ভর কাহিনী। এ ছবিতে বাড়িতে প্রথম ফোনযন্ত্রের আগমনের উপর প্রচুর কমেডির সৃষ্টি করা হয়েছিল

কুরুসোয়ার বিখ্যাত ছবিতে "HIGH AND LOW"তে ফোনের সুন্দর ব্যবহার ছিল। ভিলেন ফোন করেছে তাতে পেছনে ট্রেনের চলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এই ট্রেনের আওয়াজকে ম্যাগনিফাই করে পুলিশ চলে যায় একজন অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ইঞ্জিন-ড্রাইভারের কাছে। সে ট্রেনের আওয়াজ শুনে বলে দেয়, এটা কোন ট্রেন, আর কোন স্টেশন থেকে কোন স্টেশনে যাবার সময় এরকমের আওয়াজের গতিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। ফলে পুলিশ খলনায়কের ফোন করার গোপন আস্তানার ঠিকানা পেয়ে যায় ও তাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। দেখলেন তো ফোনের নাটকীয় উপস্থাপনা ? কুরুসোয়া অপূর্ব প্রয়োগ চকরেছেন এই বিখ্যাত ছবি High And Lowতে। এ ছাড়া, টেলিফোনের উপর সবচেয়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র যেটি তার নাম সবাই জানেন। সেটা হল হিচ্‌ককের বিখ্যাত ছবি "ডায়াল এম্ ফর মার্ডার"। অবিস্মরণীয় চিত্র। টেলিফোন, একটি প্রেমকাহিনীতে, যা সত্য ঘটনা, বিশেষে স্থান অধিকার করেছে। ঘটনাটি যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে বইটার নাম "WIND AND ROSES". ঘটনাটি হল এই। ১৯৪০/৪২ সালের ঘটনা।

একটি মেয়েকে দুটি ছেলে ভালোবাসতো। ত্রিকোন প্রেম কাহিনী আর কি। মেয়েটি কাকে বিয়ে করবে কিছুতেই স্থির করতে পারছিল না। একসময়ে একটি ছেলে কর্মোপলক্ষে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চিকাগোতে গিয়েছিল। অন্য ছেলেটি সে সময় মেয়েটাকে চেপে ধরলো যে তাকে ফাইনাল কথা দিতে হবে বিয়ে করবে কি করবে না। ছেলেটা আলটিমেটাম দিলঃ আর অপেক্ষা সম্ভব নয়। তুমি কোন বর কে গ্রহণ করবে এক্ষুনি

মনোনীত করে বলো। মেয়েটি তখন জবাব দিল,— ঠিক আছে। চিকাগোর ছেলেটা আজ ছদিন হল চিকাগো গেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত মেয়েটিকে একটিও ফোন করেনি। বলেছিল ফোন অবশ্য করবে। আগামী ৪ দিনের মধ্যে যদি ছেলেটি চিকাগো থেকে একবারও ফোন না করে তবে মেয়েটি এই নিউইয়র্কস্থিত ছেলেটিকেই বিয়ে করবে। ছেলেটি এই শর্তে মেনে নিল। ৪ দিনে কোন ফোন এলো না। সুতরাং মেয়েটি তার কথামতো পঞ্চম দিনে বিয়ে করে নিল তার প্রেমিকাকে। ওদের বিয়ে হয়ে গেল। বিবাহের রজত জয়ন্তী বছরে স্বামী স্ত্রীকে সত্যি ঘটনা খুলে বললো। বলল, — আমি তোমাকে বিয়ে করার জন্য পাগল ছিলাম সুতরাং তুমি যখন শর্ত রাখলে যে চিকাগোর ছেলেটা আর ৪ দিনে একবারও ফোন না করলে তুমি আমাকে বিয়ে করে নেবে তখন রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি চুপচাপ বসে ছিলাম না "ফোন যাতে না আসে" সে প্রার্থনা নিয়ে। না। আমি একটা কারচুপী করেছিলাম। ফোন কোম্পানীর অপারেটরদের কর্তাব্যক্তি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাকে বললাম,— তোমার নম্বরে চিকাগো থেকে কোন ট্রাংক কল এলে যেন না দেওয়া হয়। বন্ধুটি আমার কথামতো কাজ করেছিল। ফোন ইচ্ছে করে দেয় নি। সত্যি ঘটনা হল চিকাগো থেকে সে ছেলেটা সেই চারদিনে তিনবার ফোন করেছিল। মেয়েটি সব শুনে নির্বাক। ২৫ বছর বিয়ের পর এই সত্য তথ্যের মূল্য আর কি! দেখলেন তো টেলিফোন এ বিয়েতে কিরকম ভিলেনের পার্ট প্লে করেছিল! নিঃশব্দ টেলিফোনকে খলনায়িকা বলা সত্যিকথা হবে না। ভিলেনি অবশ্য করেছিল স্বয়ং স্বামীবাবাজী। তবে কথা আছে না, — ALL IS FAIR IN LOVE AND WAR. সুতরাং প্রেমিকের এই শঠতা, চতুরতা, ক্ষমার যোগ্য। আসুন আমরাও প্রেমপাগল প্রেমিককে মাফ করে দিই।

আরেকটি উপন্যাসে ফোনের একটি প্রয়োগ খুব চাতুর্যপূর্ব ছিল। বইটার নামঃ "RECOIL". সেখানে নায়ক, যাকে মাফিয়া ডন সপরিবারে নিধন করতে চায়, পাগলের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও ফোন করতে ভয় হয় কেননা মাফিয়ার লোক সর্বত্র রয়েছে। ফোনবিভাগে, পুলিশবিভাগে, সর্বত্র। ফোন করলে সে ফোন ট্যাপ্ কর। হয় আর কিছুক্ষণ পরেই যে স্থান থেকে ফোন করা হয়েছিল সেখানে বোমাগুলির আক্রমণ হয়। দু'বার সে ভয়াবহ আক্রমণ থেকে নায়ক কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। এবার নায়ক স্থির করলো আর সে পালিয়ে বেড়াবে না, এবার সে একটা গোষ্ঠী বানিয়ে মাফিয়া থেকে পালানোর বদলে নিজের মাফিয়াকে আক্রমণ করবে। অফেনসিভ হবে, ডিফেনসিভ আর থাকবে না। কিন্তু মাফিয়া তো ফোন ট্যাপ কররে তার গোপন আবাসস্থল জেনে নেবে? নিজের নম্বর ও যে বন্ধুর সাহায্য সবচেয়ে মূল্যবান তার নম্বর কি উপায়ে গোপন রাখা যায়? নায়কের বুদ্ধি খেলে গেলো। সে এক বন্ধুকে ফোন করলো পাবলিক ফোনবুথ থেকে। বললঃ শোন, আমার নাম নিস না, আমাদের বন্ধু আছে না একজন যার হাঁপানী রোগ আছে? তার ফোন নম্বরের প্রথম নম্বর থেকে ২ বিয়োগ কর, তারপর প্রফেসর মার্টিন যিনি হাইয়ার ম্যাথমেটিকস্ পড়ান তাঁর প্রথম নম্বর থেকে ৫ বাদ দে, আমাদের কলেজে যে মেয়েটি আমরা প্রেটি উইম্যান বলে ডাকতাম তার ফোন নম্বরে দ্বিতীয় অংক থেকে ১ বাদ দে, এবার কলেজের ফুটবল টীমের ক্যাপটেন এর ফোন নম্বর এর তৃতীয় নম্বর থেকে ৭ বাদ দে, লিখে চল্। এবার তোর বড়দার ফোন নম্বরের প্রথম অংক থেকে ৪ বাদ দে, এবার অল্ নাইট পিৎজা স্টোরের তৃতীয় নম্বর থেকে ৫ বাদ দে, লিখেছিস, এবার হোমোসেক্সুয়াল ছেলেটি যাকে আমরা প্যান্সী বলে ডাকতাম, তার ফোন নম্বরের লাস্ট

সঙ্গে সঙ্গে এ ভি এম'-এর পরবর্তী হিন্দি ছবি 'লেড়কী'-র জন্য স্বাক্ষর করালেন কিশোরকে। একরকম জোর করেই। "লেড়কী" হিট্ ছবি হল। নতুন কিশোরের জন্ম হল।

গায়ক-অভিনেতা। বাকি তো ইতিহাস। তবে মনে রাখার মতো কিশোর অভিনীত ছবি কমই। মানে সঙ্গীত সাগরের তুলনায়। "হাফ টিকিট", "বন্দী," "ভাই ভাই", "চলতি কা নাম গাড়ি", "নিউ দিল্লি", "পড়োশান", "লুকোচুরি" (বাংলা) একয়টি উল্লেখযোগ্য ছবি বলা যেতে পারে। এছাড়া কিশোর নিজে যে কয়টি ছবি করেছেন তার মধ্যে "দূর গগনকে ছাও মে" "দূর কে রাহী" চলনসই। বাকিগুলি ('সাবাস ড্যাডি', 'বাড়তি কা নাম দাড়ি' ইত্যাদি) সখের পায়রা ওড়ানো। কিন্তু একথা মানতেই হবে কমেডি অভিনয়ের স্বতস্ফূর্ত ক্ষমতা ছিল কিশোরের। জীবনেও তার ছাপ ছিল। শুটিং না করার জন্য মাথা কামিয়ে প্রডিউসারকে বলতেন, ন্যাড়া হিরো তো চলবে না, তাই শুটিং ক্যানসেল করুন। চুল গজাক তারপর শুটিং করবো। প্রযোজকের কপালে হাত। কিন্তু পরামর্শ করে ওরা পরচুলার ব্যবস্থা করলেন। কিশোরকে শুটিং করতেই হয়েছিল। একবার ইটালিয়ান আর্কিটেক্ট এসেছিল কিশোরের বাড়ির প্ল্যান সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য। কিশোর বললেন, দোতলা হবে কিন্তু নো স্টেয়ারকেস।

ভদ্রলোকঃ সিঁড়ি থাকবে না?

কিশোরঃ না। দড়ি থাকবে। আর নিচে জল। জলে নৌকো। দড়ি ধরে উপরতলা থেকে সুইং করবো টার্জানের মতো 'ইয়া হু' বলে চিৎকার করে। সোজা দড়ি থেকে বসবো নৌকোতে। নৌকো যাবে মোটর কারের দরজা পর্যন্ত। তারপর বোট থেকে বসবো কার-এ। গাড়িতে যেন জল না যায়। তারপর আর্কিটেক্ট পাইপ খেতেন। শুনেছি পাইপ ফেলে উনি পালিয়েছিলেন আর পরে খবর পাঠিয়েছিলেন যে এমন বদ্ধ পাগলের বাড়ির প্ল্যান উনি কখনোই বানাবেন না!

গানের জগতে কিশোর মাঝখানে খানিকটা জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। সেটা ষাটের দশকে। হিসেবে দেখুন, ১৯৭০ সালে মহম্মদ রফি গেয়েছিলেন ২৯২৬টি গান, মুকেশ ৬৪৭টি গান আর কিশোর মাত্র ৩৩৮টি গান। কিন্তু এখানেই শুরু। আসলে ঠিক এক বছর আগে। ১৯৬৯ সালে। তিনজনের জীবনের মোড় ঘুরে গেল একটা ছবিতে। ছবির নাম "আরাধনা"। তিনজন হলেন নায়ক রাজেশ খান্না, গায়ক কিশোরকুমার ও লেখক—আমি মানে এ অধম শচীন ভৌমিক। দেব আনন্দ দিয়ে শুরু আর রাজেশ খান্না দিয়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে আরোহণ। তারপর আর কোনদিন পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি কিশোরকে।

দেশে-বিদেশে সর্বত্র কিশোরকুমারের জয়জয়কার। কোলকাতার নেতাজি স্টেডিয়াম হোক বা বোম্বের সম্মুখানন্দ হল, লণ্ডনের রয়েল এলবার্ট হল হোক বা নিউ ইয়র্কের ম্যাডিশন স্কোয়ার গার্ডেন কিশোর মানেই ফুল হাউস। কিশোর ছিল গানের অলরাউণ্ডার। চপল গান, দরদ ভরা গভীর হৃদয়স্পর্শী গান, সব গানেরই যাদুকর ছিলেন কিশোর। ইদানিং একখানা গানের জন্য পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা চার্জ করতেন। লতাজির পারিশ্রমিক আর কিশোর পারিশ্রমিক ছিল এক। সত্যি বলতে মুকেশ ও মহম্মদ রফির মৃত্যুর পর কিশোরই ছিলেন একমাত্র একচ্ছত্র অধিপতি। ব্যক্তিগত জীবনেও কিশোর রুমা দেবীর বিবাহ বিচ্ছেদের পর (মধুবালার অকালমৃত্যু যোগিতা বালীর সঙ্গে হঠাৎ বিয়ে ও হঠাৎ বিচ্ছেদের পর) ইদানিং লীনা চন্দ্রবারকরকে বিয়ে করে ও দ্বিতীয় পুত্র লাভের পর বলতে গেলে বেশ সুখেই ছিলেন। দেখে বা কথাবার্তা বলে আমার মনে হয়েছে ওর মনে কোন দুঃখ নেই বেশ সুখী। যদিও লতা মঙ্গেশকার বলেন যে কিশোর মনে মনে সুখী ছিলেন না। ওর মনে বৈরাগ্য দেখা

ডেকেছিলেন। কোনদিন না। বোম্বে দূরদর্শন সাতটায়, কিশোরকুমারের পুরনো একটা প্রোগ্রাম শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে পেশ করেছিলেন। সর্বশেষ গানটা ছিল "সফর" ছবির গান।

জীন্দগী কা সফর
এ ক্যায়সা সফর
কোই জানা নেহী
পহচানা নেহী।

গানের দর্শন সবাইকে উদাস করে ফেলেছিল। হঠাৎ এই মৃত্যু কেউ ভাবতেই পারেনি। কিছুদিন আগেই আমার এক আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে লস্ এঞ্জেলেস্-এ 'কিশোরকুমার নাইট' শো করার সব কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল। সে শো আর কোনদিন হবে না। খাণ্ডোয়ার উকিল কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলি ও তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবীর সর্বশেষ সন্তান যাঁর আসল নাম ছিল আভাসকুমার গাঙ্গুলি। যে কিশোরকুমার নামে বিশ্ববন্দিত ছিলেন, তাঁর ইতি হয়ে গেল। গৌরী-কুঞ্জ (মা ও বাবার নামে বাড়ির নাম রেখেছিলেন কিশোর) অন্ধকার হয়ে গেল। বোম্বের সঙ্গীতজগতের ত্রিমূর্তি ছিলেন—রফি, মুকেশ ও কিশোর। তিন সূর্যের তৃতীয় সূর্যও আজ অস্তমিত হয়ে গেল। এ ক্ষতিপূরণ কোনওদিন হবে না।

১৯৪৭ সাল। মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া শহরে বোম্বে টকিজের বিখ্যাত অভিনেতা অশোককুমারের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা কিশোরকুমার বাবা-মা'র সঙ্গে থাকতেন। সখ হল বোম্বে আসার। চিত্রজগতের মায়াতে নয়, সঙ্গীতজগতের ধ্রুবতারা কুন্দনলাল সায়গলের সান্নিধ্য লাভের লোভে। ইচ্ছে অনুযায়ী কর্ম। কিশোরকুমারের সেই প্রথম পদার্পণ বোম্বেতে। সায়গলের সঙ্গে যোগাযোগ হল না—হল অভিনয় জগতের সঙ্গে সঙ্গীত জগতের সঙ্গে। বোম্বে টকিজের সঙ্গীত পরিচালক সরস্বতী দেবীর সুরে মান্না দে গেয়েছিলেন "মশাল" ছবিতে বিখ্যাত গান "উপর গগন বিশাল" গানটি। সে গানে কোরাস ভয়েসের একজন ছিলেন কিশোরকুমার। কিশোর কোন ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নেননি। কিন্তু তাঁর সুর তাল জ্ঞান ছিল স্বোপার্জিত। সুরকার ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ দেখতে পান প্রথম যে কিশোরকুমারের কণ্ঠ পার্শ্ব গায়কের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। বোম্বে টকিজের "জিদ্দি"তে (১৯৪৮) সালে নির্মিত) কিশোর প্রথম প্লেব্যাক গেয়েছেন দেব আনন্দের জন্য। গানটি ছিল, "মরনেকো দুয়া কিঁউ মাঙ্গু"। সে ছবির জন্য প্রথম ডুয়েট গাইলেন লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে। গানটি ছিল—"এ কৌন আয়া রে, করকে সোলা সিঙ্গার"। সেই হল সূত্রপাত। তারপর ক্ষেমচাঁদ প্রকাশের সুরেই "রিমঝিম" ছবিতে গাইলেন সুপারহিট গান—"জগমগ জগমগ"করকে নিকলা, চাঁদ পুণমকা প্যায়ারা। অভিনেতা কিশোক সাহুর মুখে। কিন্তু কিশোরের সঙ্গীতজগতে জনপ্রিয়তার জন্য সব চেয়ে বড় অবদান স্বর্গীয় শচীন দেব বর্মণের সুরে গাওয়া গানগুলো। শুরু ১৯৫০ সালে "প্যায়ার" (রাজ কাপুর অভিনীত ছবিতে) দিয়ে। অভিনয় জগতে আসারও ঘটনা আছে। অভিনেতা হবার কোন স্বপ্ন ছিল না কিশোরের। কিন্তু সবই যোগাযোগের ব্যাপার। এ ভি এম মাদ্রাজের "বাহার" ছবির (করণ দেওয়ান ও বৈজয়ন্তীমালা) গান গাইছিলেন কিশোর। ছবির পরিচালক উপস্থিত ছিলেন রেকর্ডিং থিয়েটারে। গানটি হলঃ

"কসুর আপ্‌কা হুজুর আপ্‌কা
মেরা নাম লিজিয়ে না,
না মেরা বাপ্‌কা।"

কমেডি গান। গান করার সময় কিশোরের অঙ্গভঙ্গী দেখে পরিচালক এম ভি রমণ সেখানেই অভিনয় করার আমন্ত্রণ জানালেন কিশোরকে। কিশোর গররাজী। কিন্তু রমণ

ভদ্রলোক (থতমত খেয়ে)। O. K. Your Highness, I will call you later when you will be not be occupied like now. Sorry.

ফোনটা রেখে ঘামতে লাগলেন ভদ্রলোক। গণ্ডগোল হয়েছে ভাষার জন্য। চীন দূতাবাসের উত্তরটা ভদ্রলোক এম্বেসেডর মহাশয় স্বয়ং করেছেন বলে ধরে নিয়েছেন! আর I am Fu king, the secretary, কথাটা আত্মপরিচয় না ভেবে, ভেবে নিয়েছেন সেক্রেটারিটী কোন নারী, আর এম্বেসেডর তার সঙ্গে শরীরী কোন অপকর্ম করছেন! বুঝুন কাণ্ড। একেই বলে এক জায়গার বুলি, অন্য জায়গায় হয়ে যায় গালি!

অনেক রোমান্স ফোনে ঘনীভূত হয়েছে। মানে ফোন ঘটকের কাজ করেছে। শাম্মি কাপুর ও শর্মিলা ঠাকুরের প্রেম এককালে জমেছিল দু'জনের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে বার্তালাপ করে। গুলজার—মীনাকুমারীও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে প্রেমালাপ — বিলাপ-প্রলাপ বকতো। বিয়ের আগে ঋষী কাপুর—নীতু সিং এরও ঐ একই কাহিনী। ফোনের একটা ট্র্যাজিক দিকও আছে। মরার আগে শেষ ফোন। এ ধরনের ফোন আত্মহত্যার আগে করা হয়ে থাকে। যেমন মেরিলিন মনরো ফোন করেছিলেন মরবার কিছুক্ষণ আগে। গুরু দত্ত করেছিলেন মরবার খানিক আগে তাঁর জীবনের শেষ ফোন, রাজ কাপুরকে। আর. ডি. বর্মন হার্ট এটাকের যন্ত্রণাদগ্ধ কণ্ঠে শেষ ফোন করেছিলেন আশা ভোঁসলেকে।

বিদেশে ফোনের অপপ্রয়োগ রয়েছে যা বিরাট সেক্স এর ব্যবসায়ের একটি বিশেষ অঙ্গ। সেটা হল সেক্স ফোন। পয়সা দিয়ে ফোন করলে অপর দিকে কোন মেয়ে নোংরা অশ্লীল ভাষায় আপনার সংগমসঙ্গীনীর মতো কথা বলবে, নানারকম শৃঙ্গার মুখের সংগমতৃপ্তির আওয়াজ বার করবে। ফলে আপনার এক ধরনের বিকারগ্রস্ত যৌন সুখের বির্যস্খলন হয়ে যাবে। এই সেক্স-ফোন আজকাল এ দেশ থেকেও করা যায় লণ্ডন ও হংকংএ। এই বিকারবাণিজ্য ভারত সরকারকে বন্ধ করতে হবে। নইলে এই নোংরামী সমাজকে ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলতে পারে।

যাই-বলুন না কেন, ফোন ছাড়া এখন পৃথিবী অচল হয়ে যাবে। ফোন ছাড়া জীবন ভাবাই যায় না। ফোনে গার্লফ্রেণ্ড, ফোনে বৌ, ফোনে ডাক্তার, ফোনে পুলিশ, ফোনে ফায়ার ব্রিগেড, ফোনে সুসংবাদ, ফোনে দুঃসংবাদ; মনে হয় প্রতি পদক্ষেপে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হল ফোন। ভালো লাগুক, মন্দ লাগুক ফোন ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। Loan ছাড়া আপনি জীবন চালিয়ে যেতে পারবেন, বোন না থাকলেও জীবন চলে যাবে, কিন্তু ফোন ছাড়া জীবন চলবে না। বোন না থাকুক, কিন্তু spinal bone না থাকলে আপনি কি বাঁচতে পারবেন? পারবেন না। সে রকমই টেলিফোন ছাড়াও পারবেন না। Spinal bone আর টেলিফোন, এই দুই সমমূল্যমানের বস্তু অপরিহার্য্য জীবনে। Spinal Bone এর জন্য আপনি দাঁড়িয়ে আছে আর টেলিফোনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে আজকের সমাজ ও সভ্যতা। একটাকে বলা হয় দণ্ড, মেরুদণ্ড। অন্যটাকে বলতে পারেন দন্ত। বলতে পারেন মেরুদন্ত। বিজ্ঞানের এত বড় প্রগতি আমাদের দন্ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

টেলিফোনের বন্দনা শেষ করে এইবার শচীন ভৌমিক কি করে? আপনারা বলবেন কলম বন্ধ করবে। সে তো করবেই। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা জিনিষ বন্ধ করবে। সেটা হল টেলিফোন। হ্যাঁ মশাই, ক্র্যাডেল থেকে দুটো টেলিফোনই নামিয়ে রাখবো। এখন শুধু অলসতার বিলাস। এ সময়ে টেলিফোন যন্ত্রের যন্ত্রণা আর কার ভালো লাগে বলুন। সুতরাং ওম শান্তিঃ, শান্তিঃ শান্তিঃ।।

।। কিশোর কুমার ।।

আটান্ন বছরের কিশোর মারা গেলেন। কিশোর চিরকিশোরই ছিলেন। ওঁর শরীরের বয়স বেড়ে ছিল, কিন্তু মনের বয়স কোনদিন বাড়েনি। ১৩ অক্টোবর কোন গানের রেকর্ডিং রাখে নি কিশোর। ১২ তারিখ বাপি লাহিড়ির সুরে গান গেয়েছেন মেহবুব রেকর্ডিং থিয়েটারে। ১৩ তারিখ দাদামণি অশোককুমারের জন্মদিন। প্ল্যান ছিল সারাদিন বিশ্রাম। রাত্তিরে স্ত্রী লীনা ও দ্বিতীয় পুত্র সুমিতকে নিয়ে দাদামণির বাড়ি চেম্বুরে ডিনার। বড় ছেলে অমিত গেছে কানাডার টোরেন্টোতে। ফেরার দেরি আছে। দুপুরে ভিডিওতে ছবি দেখছিলেন, সুমিতের সঙ্গে খেলেছেন, ড্যানিকে ফোন করেছেন আড়াইটা নাগাদ। বলেছেন বিকেলে ছ'টা নাগাদ এসো। কাজ আছে। নতুন বেডরুম ফার্নিচার বানানো হয়েছিল সেগুলো আগেপিছে করে সেটিং ঠিক করলেন। পরপর আবার ভিডিও ছবি দেখা। তিনটের সময় ডান হাতে ব্যথা হয়। লীনা বলল, কি, ডাক্তার ডাকবো ? কিশোর বললেন, না। সোফা টানাটানি করেছি। সেজন্য হয়তো একটু ব্যথা হচ্ছে। কিছু না। চারটে বাজলো। ব্যথাটা আবার হচ্ছে। হাতেই। খানিকবাদে, সাড়ে চারটা হবে, লীনাকে ডেকে বললেন, সর্বিট্রেট টেবলেট দাও। খেলেই কমে যাবে। ব্যথাটা বুকের দিকে। টেবলেট রাখলেন জিভের নিচে। বুকে ব্যথা। আনচান। অজ্ঞান। লীনা ডাক্তার ডাকলেন। এলোও। ই সি জি। ডায়গনসিস ম্যাসিভ হার্ট এটাক। ওটা থার্ড। পাঁচটা বেজে বিশ মিনিটে সব শেষ। জ্ঞান হারাবার পর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ—কিশোর নেই। শুটিং, রেকর্ডিং সব বন্ধ হয়ে গেলো। রাহুলদেব বর্মণ, আশা ভোঁসলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, ছুটে এলেন কিশোরের জামাইবাবু শশধর মুখার্জি ও তাঁর ছেলেরা রণো, জয় . সোমু, দেবু। ছুটে এলেন অশোককুমার ও মেয়ে ভারতী। ভারতী-কন্যা অনুরাধা প্যাটেল, অশোক-কন্যা রূপা ও তাঁর স্বামী দেবেন ভার্মা, অশোক অনুজ অনুপকুমার আর চিত্রজগতের ও সঙ্গীতজগতের বড় বড় রথী, মহারথীগণ। ছুটে এলেন ড্যানি। মৃত্যুসংবাদ পাননি। উনি এসেছেন কিশোরর ফোনের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখতে। এসে জনৈক যন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, কী ভাই, কিশোর কি পাহাড়ী রাগ শোনার ইচ্ছে যে. আমাকে ডেকেছেন ? যন্ত্রী বললেন, জলভরা চোখে, — কিশোরদাদা নেই।

বিশ্বাস করতে পারছে না ড্যানি। কিশোরের বাড়ি "গৌরীকুঞ্জে" দরজা ধরে নিজেকে না সামলালে ড্যানি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে পরে ড্যানি বলেছিল, কোনদিন আমি জানতে পারবো না কিশোরদাদা কেন আজকে ছ'টার সময়

ফোন করবে সাবধানে। যদি বাবা বাই চান্স ফোন ধরে তাহলে ঘুণাক্ষরে টের পেতে দিও না যে তুমি আমার বয়ফ্রেণ্ড ফোন করছো। ছেলেটি জবাব দিল, ডু নট্ ওয়ারি। আমি পাড়ার সবচেয়ে মস্তান ছেলে। তোমার বাবার ক্ষমতা নেই আমাকে পাকড়াও করে। মহাঘুঘু ছেলে আমি।

কিন্তু অঘটন ঘটল। ছেলেটি তার গার্লফ্রেণ্ডকে ফোন করলো। তুলেছেন মেয়েটির বাবাই। এইবার শুনুন তাদের কথোপকথন।

ছেলেটিঃ হ্যালো

কন্যার পিতার জলদগম্ভীর কণ্ঠঃ হ্যালো।

অবস্থা বুঝে ছেলেটি বললঃ এটা কি ০০০ ০০০ নম্বর?

পিতাশ্রীঃ ইয়েস। বলুন।

ছেলেটিঃ না মানে, এটা মনে হচ্ছে রং নম্বর।

পিতাশ্রীঃ না, নম্বর ঠিকই আছে।

ঘাবড়ে গিয়ে প্যাণ্টে হিসি করার মতো অবস্থা ছেলেটির।

বললঃ মানে এটা কি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ি?

পিতাশ্রীঃ হ্যাঁ, আমিই বিদ্যাসাগর। কি বলার আছে বলুন।

ছেলেটিঃ না, মানে আমি আমির খান কথা বলছি। আমির, ওখানে কি শতাব্দী রায় আছেন?

পিতাশ্রীঃ দেখো জ্যাঠা ছেলে। আমার মেয়ের সঙ্গে যদি তুমি আর কখনো দেখা করার চেষ্টা করো তাহলে আমিরই হও বা কুমীর, আমি তোমার গায়ের চামড়া তুলে নেবো আর গায়ের মাংস দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে কাক চিল আর শকুনকে খাওয়াবো। এমন খাওয়ান খাওয়াবো যে সারা কোলকাতার শকুনরা এ শতাব্দী কেন, আগামী শতাব্দীতেও মনে রাখবে। বুঝলে হারামজাদা কুকুরের বাচ্চা।

ছেলেটি ঝট্ করে ফোন রেখে দিল। মাথা ঘুরে অজ্ঞান হতে বাকি ছিল। এরকম মেয়ের বাপের চেয়ে সাংঘাতিক বিষাক্ত কেউটে সাপও ভালো।

পরে মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাত হতেই ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে নিল। মেয়েটি আবদার করাতে বললো,—বাপরে বাপ। তোমার বাপের পাল্লায় আর পড়ছি না। কি সাংঘাতিক লোক। তোমার সঙ্গে বাই বাই। আমি নাপিতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে রাজি, মুচীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে আপত্তি করবো না, কিন্তু মরে গেলেও কোন কসাই-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করবো না। তোমার বাবা ফোনে কি বলেছে জানো? মেরে মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেবে। দা দিয়ে আমার মাংস কেটে কেটে কাক চিল শকুনকে খাওয়াবে। তোমার বাপটা যে একজন কসাই সে কথা তো তুমি আগে আমাকে বলোনি? কত গুলতাপ্পি মেরেছি যাতে উনি ফোনটা ছেড়ে দেন, কিন্তু বুড়ো মহাশেয়ানা, ছাড়বেই না ফোন, ঠিক বুঝেছেন যে আমি, মানে তোমার বয়ফ্রেণ্ড ফোন করছি। তারপর আমার কি হেনস্থাই হয়েছে। শোন, বিয়ের পর আমি চাই একজন বিশুদ্ধ শ্বশুরমশাই, চাই না কোন ক্রুদ্ধ অসুরমশাই। তোমার বাবার নাম রামচন্দ্র মিত্র কখনোই হতে পারে না, আসলে হওয়া উচিত রাবণ চন্দ্র শত্রু। আমি পালাই বাবা। বলেই ছেলেটি সেখান থেকে হাওয়া। দেখলেন, ফোনের বিরূপ চেহারা? ছেলেটির কাছে ফোন শুধু ফনী নয়, সম্পূর্ণ ফনীমনসার গাছের জঙ্গল! ফোন দূরধ্বনি নয়, ফোন হল তার কাছে মহাশনি।

এবার আরেকটি জোক। এটা সাউণ্ডের উপর প্লে করা জোক। ভাষাবিভ্রাট, উচ্চারণ-ভঙ্গীর দৌলতে আদির সাত্ত্বিক রূপ নিয়ে ফেলেছে। জোকটা হল এই।

চীন দূতাবাসে একজন ফোন করেছে। দূতমহাশয়ের সেক্রেটারী ফোন তুলেছেন।

ভদ্রলোকঃ May I speak to Chu King, the Ambassador?

জবাব এলঃ I am Fu king the secretary.

নম্বর থেকে ৩ বিয়োগ কর। এবার দেখ ৭ নম্বরের একটা ফোন নাম্বার হয়েছে। মুখে উচ্চারণ করিস না। এই নম্বরে ফোন করলে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ফোন নম্বর পাবি। তাকে ফোন করে বল তার ডিভোর্স স্ত্রীর রেস্তোঁরায় আসতে পরশু পাঁচটায়. আমি ওয়েট করবো।

এতটা বলে ফোন রেখে দিল নায়ক। মাফিয়ারা সত্যি ওর ফোনটা ট্যাপ করছিল, কিন্তু নায়কের প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্ত্বার কুশলতায় বন্ধুটির ফোন নম্বরটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারলো না। ফলে হিরো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করলো নির্দিষ্ট সময়ে। ওদের প্ল্যানের ব্লুপ্রিণ্ট তৈরী হয়ে গেল এবং দারুণ কর্মকুশলতায় মাফিয়া ডনের গর্ভবতী স্ত্রীকে ওরা কিডন্যাপ করলো। এবার জয় হিরোর হাতে। মাফিয়াকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। 'RECOIL' বইটাতে ফোনের দারুণ প্রয়োগ করা হয়েছে। পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। লেখককে তারিফ করতেই হবে. কি বলুন ?

ফোন কিডন্যাপারদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। ফোনেই সর্বদা অপহরণকারীরা র‍্যানসাম চেয়ে ধমক দিয়ে থাকে। অপহৃত ব্যক্তির আর্তনাদ শোনায় তারপর মোটা টাকার দাবী করে। ফোন না হলে ওদের ব্যবসাই বানচাল হয়ে যেতো, কি বলুন ?

ফোনের আমি ফ্যান নই। ফোনকে আমার ফান্ মনে হয় না। তার চেয়ে ফাক অনেক ভালো। ফাক মানে কর্মব্যস্ততার মাঝে ফাক (মানে অবসর). ঝাউগাছের ফাক দেখতে ভালো লাগে, যখন গাছের ডালে আধখানা চাঁদ দেখা যায় সেই ফাকে। ভালো লাগে যখন জানালার ফাকে এক টুকরো আকাশে গোটা পাঁচেক তারার জোনাকী দেখা যায়, আর সবচেয়ে ভালো লাগে সঙ্গীনী কোন কোমল নারী শরীরের পদসন্ধির গোপন রহস্যময় মাংসল বিভক্ততার ফাকের চুম্বক। বুজরুকি নয়. কোন ফাঁকি নয়। ফোনের কোন ফনী নয়, Phoney'ও নয়, আমার জয়ঢাক তোলা রইল ঈশ্বরের অসামান্য এক রমণীর রমণীয় মৌচাকের জন্য, সে মৌচাকই হল বংকিম অঙ্গের লজ্জাকুণ্ডলে আবৃত হৃদ্দরহস্যের এই ফাক।

কবিত্ব থাক। ফাক-সাহিত্য ছেড়ে এবার দূরধ্বনির মহারাণীর বিষাদবানী শোনানো যাক। বিষাদবানী পছন্দ না হলে আসুন বলা যাক বিশদবানী. না কি বলবো বিশেষ বানী। ছোটবেলায় একটি কবিতা পড়েছিলাম ফোন নিয়ে। কবিতাটি হল ভৃত্য ফোন ধরেছে বলা বাহুল্য জীবনে এই প্রথম ফোন ধরা। সুতরাং নারীকণ্ঠ যখন ওপারে বলতে শুরু করলোঃ হ্যালো হ্যালো। ভৃত্য জবাব দিলঃ

"দিদিমনি কেবলই বলছেন হেলো হেলো,
হেলবো কতো. হেলতে যে আমার কোমর গেলো।"

ভেরী ফানী। হেলাফেলার কথা নয়. রীতিমতো কোমর ভাঙার ব্যাপার। অর্থোপেডিক্ ডাক্তার ডাকার মতো গুরুতর সমস্যা হতে পারে। সুতরাং হেলার কবিতাকে অবহেলা করবেন না।

এবার বলি ফোন নিয়ে অনেক কৌতুকী রয়েছে। তার কিছু নমুনা শোনানো যাক। এটা শুনুন।

প্রশ্নঃ WHAT IS MORE DIFFICULT THAN SPLITTING AN ATOM ?

জবাবঃ A TEENAGE GIRL AND TELEPHONE

কথাটা সর্বাংশে সত্যি। যাদের ঘরে কিশোরী মেয়ে আছে তাঁরা ভালোভাবেই জানেন মেয়ে ফোন একবার ধরলে ছাড়বার নামই করে না। এ রোগের নাম ফোনাশক্ত. PHONE ADDICTTION. এ রোগের ওষুধ নেই। একমাত্র মুক্তির উপায় মেয়ের বয়েসের বৃদ্ধি, আরো কোন দাওয়াই নেই।

আরেকটি কৌতুকী। মেয়েটি বললো,— আমার বাবা ভয়ানক কড়া। আমাকে

দিয়েছিল। শেষ ইচ্ছা ছিল জন্মস্থান খাণ্ডোয়াতে গিয়ে বাকি জীবন কাটাবেন। সেখানে সায়গলের নামে একটা বড় মিউজিক ইনস্টিটিউট ও হল বানাবার স্বপ্নও ছিল ওঁর। সেটা আর হল না। লতাজি, যিনি কিশোরকে ভাইফোঁটা দিতেন ও রাখী বাঁধতেন। তাঁর কাছে কিশোর মন খুলে নিজের দুঃখের কাহিনী ও শেষ ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। লতাজির সঙ্গে মাঝে ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছিল। সেটাও কিশোর এ বছরই একটা চিঠি লিখে মিটিয়ে নিয়েছিলেন। কিশোর বোধহয় তাঁর আসন্ন মৃত্যুর আভাষ পেয়েছিলেন। কেননা লতাজি ছাড়া, পরিচালক মনোমোহন দেশাইর সঙ্গেও কিশোর তাঁর পুরনো ঝগড়া মিটিয়ে নিয়েছিলেন ও মনোমোহন দেশাইর ছবি "তুফান" এ (অমিতাভ অভিনীত) গানও গেয়েছেন। প্রায় একযুগ পরে কিশোর মনোমোহন দেশাইর ছবিতে গান গাইলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর কিশোর মারা গেলেন। ১৪ আমার সঙ্গে ড্যানির কথা হচ্ছিল। ড্যানি বলল, ১৩ তারিখ বেলা তিনটের সময় আমি কিশোরের ফোন পেলাম। আমি ভিডিওতে ছবি দেখছিলাম, কিশোর বললেন, একবার আসতে পারো ড্যানি, ছ'টা নাগাদ সন্ধ্যাবেলা ?

জবাব দিলাম, কেন ?

কিশোর বললেন, কথা আছে। ছটাতেই এসো, দেরি করো না। আজ দাদামণির জন্মদিন রাত্তিরে আমি, লীনা, সুমিত সবাই চেম্বুরে যাবো দাদামণির বাড়ি, রাত্তিরে খাবো। সেজন্য ছ'টা নাগাদ এসে যেও।

বললাম, আসবো।

ছটায় ড্যানি কিশোরের বাড়ি পৌঁছে গেলো। দেখলেন গম্ভীর মুখ অনেক যন্ত্রবাদক ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেহারার উদাসীনতায় কোন সন্দেহ হল না ড্যানির। হাসিমুখে বলল, কি ভাই, কিশোরদা ডেকে পাঠিয়েছে কেন আমাকে ? কোন পাহাড়ী ধুন শোনার জন্য কি ? ফোক্ গানের ব্যাপার স্যাপার ?

যন্ত্রবিদ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর বলল, ড্যানিসাব, আপনি জানেন না ? কিশোরদাদা তো নেই।

ড্যানি বিশ্বাস করতে পারছিল না। লোকটা আবোলতাবোল কী বকছে ? তারপর বুঝতে পারলো এই নিদারুণ সত্য। কিশোর ইহলোকে নেই। অনেক কষ্টে অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা থেকে ফিরে এলো ড্যানি। আমাকে বলল, এখন আর কোনদিন জানতে পারবো না কিশোরদা আমাকে কী কথা বলার জন্য ডেকেছিলেন! এ প্রশ্নের জবাব মিলবে না কোনদিন।

কল্যাণজি আনন্দজি বললেন, কিশোর ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেননি বলে মনে মনে হীনম্মন্যতা রোগে ভুগতেন। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এর শিকার ছিলেন কিশোর। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাবিত সুরের গান হলে ভয় পেতেন বলতেন, এ গান মহঃ রফি বা মান্না দেকে দিয়ে গাওয়ান। কল্যাণজি বললেন, অমিতাভ অভিনীত "মুকদ্দর কা সিকন্দর" ছবিতে "সেলামে ইস্‌ক্ কবুল কর লো" গানটি শুনে বললেন, না এ গানের আলাপ আমার দ্বারা হবে না, মান্নাকে দিন গান। এছাড়া সঙ্গে লতা মঙ্গেশকর গাইবেন, বাপ্‌রে বেসুরো হয়ে যাবে। কিন্তু কল্যাণজি নাছোড়বান্দা। গেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। অপূর্ব গেয়েছিলেন। সুপারহিট হয়েছিল। যদিও কিশোর হাল্কা গানে নাম করেছিলেন কিন্তু সিরিয়াস মেলোডির প্রতিই ঝোঁক ছিল ওঁর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনেক অনুরোধে উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন। ভয় ছিল বাংলা উচ্চারণে বিভ্রাট হবে। হয়নি। হীনম্মন্যতায় ভুগলেও গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল যেমন, তেমন ছিল গুণীজনের প্রশংসায় আনন্দে বিগলিতভাব। সত্যজিৎ রায় ছবিতে গান গাইয়েছেন বলে খুব গর্ববোধ করতেন। শ্রদ্ধা করতেন রফি সাহেবকে, মান্নাদাকে, শচীন দেব বর্মণ ও নৌশাদকে। কিশোরের খুব একটা অন্তরঙ্গ বন্ধু কেউ ছিল না। পঞ্চমকে খুব ভালোবাসতেন। মানে

অন্যদের চাইতে পঞ্চম মানে রাহুলদেব বর্মণ অনেক কাছের লোক ছিল। ওঁদের দ্বৈত উদ্যোগে খুবই সুন্দর গানের ফসল সৃষ্টি হয়েছে। প্রাদেশিকতার দোষ চাপালেও বলবো কিশোর কিন্তু মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন। বাঙালিদের পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর যথেষ্ট। বোম্বের বাঙালি পরিচালক প্রযোজকদের কাছে পয়সা কম নিতেন আর কোলকাতার সুরকারদের জন্য কি ছবিতে কি প্রাইভেট রেকর্ডে, বাংলা গান গেয়েছেন অজস্র। বাংলা ছবিও করেছেন—"লুকোচুরি", "লেড়কী" ছবিতে যেমন অনায়াসে আবোলতাবোল গানঃ

ইনা মীনা ডীকা
ডায় ডাম নিকা
রোলা রিকা রিকা
ইনা মীনা ডায় ডাম রোলা রিকা
ফিকা টিকা মাকা
নাকা মাকা নাকা

এরকম সৃষ্টিছাড়া গান কিশোরই গাইতে পারেন। যেরকম গেয়েছিলেন—"সিন সিনাকি বুবলা বু" ছবিতেও। কিন্তু "ফান্টুস" ছবির স্যাড সঙ—"দুখী মন মেরে/ শুন মেরা কহনা / যাঁহা নেহী চায়না / ওঁহা নেহী রহনা।"

এই গানটিই ছিল সেসময়ে ওঁর প্রিয় গান। আমাকে সেসময় কতবার এ গানটি শুনিয়েছেন তার হিসেব নেই। ওঁর মনের টেস্ট কী এতেও বোঝা যায়। বোঝা যায় ওঁর রুচির কথা। "দূর গগন কি ছাও মে" ও "দূর কে রাহী"ও ছবি দু'খানাও কিশোরের মনের গভীর দিকটার প্রতিই আলোকপাত করে। লতাজি বলেন, "কিশোর আসলে বড্ড একা ছিল, দুঃখী ছিল।" কিন্তু আবার হাস্যরসের রসগোল্লা ছিলেন; কৌতুক-গ্যাসের বেলুনও ছিলেন। নারীসঙ্গ কামনাও করতেন আবার নারীবিদ্বেষীও ছিলেন। তবে কি স্পিলট্ পার্সোনালিটি? মনোবিজ্ঞানীরা বিবেচনা করতে পারেন, আমি পারি না। ঘরোয়া বাঙালি বৌ খুব পছন্দ ছিল। ভ্রাতা অনুপকুমারের স্বর্গীয়া স্ত্রী ধীরা দেবীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন, ধীরাবৌদি হলে আদর্শ গৃহিণী, এরকম মহিলা জীবনকে স্বর্গ বানাতে পারেন। শচীন দেব বর্মণের পত্নী মীরা বৌদিকে শ্রদ্ধা করতেন। লতা মঙ্গেশকরকে ভগ্নীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মহিলা সংক্রান্ত কৌতুকীর বহরে নারীবিরূপতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন কিশোর প্রেমপত্র লিখেছেনঃ

"প্যায়ারী রসমালাই, তুম্ মেরা দিলকা জেলিবী হো, মেরা কলিজা কা কুলপী।" ইত্যাদি। এ চিঠি কি রোমান্টিক? প্রেমিকা হল রসমালাই। হৃদয়ের জিলিপী, কল্জের কুলপী! বুঝুন কোন মেয়ে সিরিয়াসলি নেবে ও প্রেমপত্র? এ কৌতুকের মানে কী? সত্তরের দশকে কিশোর বিদেশ থেকে হুইসল্ ব্যাগ নিয়ে এসেছিলেন। চেয়ার বা সোফার কুশনের নিচে রেখে নায়িকা বা পত্রিকাব মেয়ে রিপোর্টারদের কিশোর বসতে বলতেন। বসলেই ব্যাগ নিচে থাকায় এমন একটা আওয়াজ বেরুতো, যা শুনে নায়িকা বা রিপোর্টার লাফিয়ে উঠতো আর সেই লজ্জাকর আওয়াজের জন্য বিব্রত হয়ে, মুখচোখ লাল হয়ে, কী করবে ভেবে পেতেন না মহিলালা। কিশোর তখন গম্ভীর হয়ে বলতেন, দাদামণি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে নিনি। গ্যাসট্যাস একেবারেই হবে না। লজ্জার কী আছে? আপনার কী দোষ, খাবার টাবারে গণ্ডগোল হবে আর কী। ভাববেন না, সেরে যাবে।

মহিলারা কেঁদে ফেলবার আগে কিশোর সে ব্যাগ কুশনের তলা থেকে বার করে দেখাতেন আর হো হো করে হেসে উঠতেন বোকা বানাবার আনন্দে। আসলে কখনো শিশু, কখনো কিশোর-মনের পরিচয় দিতে কিশোর যুবকের নয়, প্রৌঢ়ের ত নয়ই। কিন্তু ইদানিং লীনাকে বিবাহ ও দ্বিতীয় পুত্র সুমিতের জন্মের পর, কিশোর ম্যাচিওর হয়ে গিয়েছিলেন। দায়িত্বশীল সংসারী হয়ে উঠেছিলেন। নারীবিরূপতার ছিটেফোঁটাও ছিল না অবশিষ্ট। মনে হয়েছিল কিশোর এবার সুখী। ঘর ও ঘরণী সন্তানসুখ ও নাম আর যশ সব ছিল ওঁর আয়ত্তে। কিন্তু মনে হচ্ছে এত সুখ সহ্য করার মতো জোর ছিল না হৃদয়ে। প্রথম হার্ট এটাক্ কোলকাতায়। কারণ ব্যক্তিগত দুঃখ ও অপমান। দ্বিতীয় বোম্বেতে। তখনও মন অশান্ত। তারপর যখন উনি সুখ ও শান্তির শিখরে, তখন হল তৃতীয় হার্ট এটাক। এরপর যবনিকা। সব শেষ। কিশোরের শবদেহ ওঁর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শেষকৃত্য ওখানেই সমাধা হল। বেঁচে থাকলে কিশোর তাঁর শেষ জীবন খাণ্ডোয়ায় প্রকৃতির কোলে কাটাবার ইচ্ছে ছিল। গাছপালা ক্ষেতখামারের প্রতি শেষ জীবনে কিশোরের আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার যোগ অনুভব করতেন তিনি। এই নিয়ে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটা এই রকম। সিনেমা পত্রিকার একজন মহিলা সাংবাদিক কিশোরকুমারের ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলেন গৌরীকুঞ্জের বাড়িতে। তখন কিশোর একা থাকতেন। মহিলা প্রশ্ন করলেন, আপনার জীবনটা খুব লোন্‌লি, তাই না? একা একা থাকেন কী করে?

কিশোর জবাব দিয়েছিলেন একা? মোটেই না। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে এখানে, চলুন আলাপ করিয়ে দিই। কিশোর মহিলাকে বাড়ির বাগানে নিয়ে এলেন, তারপর এক একটা গাছ দেখিয়ে বললেন, দেখুন এর নাম হল নিরঞ্জন, এর নাম রঘুনন্দন, আর এ গাছটির নাম জনার্দন। আর ঐ যে ছোট গাছটা দেখছেন, ও হল নিরঞ্জনের ছেলে, মুন্না, ভালো নাম এখনো রাখিনি। সে মহিলা কিশোরের গম্ভীর মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছিলেন আর পরে কাগজে এ ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছিলেন, কিশোরকুমার হলেন একজন বদ্ধ পাগল। কিশোরের কৌতুকে প্রকৃতি-প্রীতির মনোভাবের পরিচয় পাননি ভদ্রমহিলা। সেন্স অফ হিউমারের জন্য উচ্চতম আই কিউ এর প্রয়োজন হয়।

দেখতে দেখতে কিশোর মৃত্যুর পর অনেক দিন কেটে গেল। কেটে যাচ্ছে যাবেও। এই সেদিন শ্রাদ্ধশান্তিও সমাধা হয়ে গেল। সে শোকসভায় ভজন গাইলেন অনুপ জলোটা, শোকগীতি গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কিশোর নেই, কিন্তু বেঁচে থাকবে তাঁর কণ্ঠ। তাঁর গানই তাঁর স্মৃতি।

শচীন কর্তা

শচীন কর্তার কথা মনে হলেই ঈশ্বরের উপর রাগ হয়। আমাদের তাঁর গান শোনার ভাগ্য ভগবানের বুঝি সহ্য হচ্ছিল না। স্বর্গের সঙ্গীতসভায় গাইবার জন্য তাঁকে তাই ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন উনি। তাঁর মরমী কণ্ঠস্বর শোনার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম আমরা। এখনও ভুলতে পারি না গায়ক শচীনদাকে, ভুলতে পারি না মানুষ শচীনদাকে। ভুলতে পারি না চিরশিশু শচীনদার নির্মল হাসি, তাঁর ভালোলাগার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাধ্বনি। ওয়ানডারফুল, তাঁর অভিজাত রাজকীয় চেহারা, তাঁর ব্যবহারের উষ্ণতা, তাঁর আতরের সুগন্ধ, তাঁর অর্থসম্পর্কে নির্লিপ্ততা, তাঁর ফুটবল ভক্তির অন্ধতা, তাঁর চুনট করা ধুতি, নাগরা জুতো, কাশ্মিরী শাল আর পান খাওয়ার সৌখিনতা, ভালো কৌতুকী শুনে তাঁর প্রাণখোলা হাসির উদ্দামতা, তাঁর এক-আকাশ হৃদয়ের এক-বর্ষা মমতা। না কিছুই ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবোও না। অন্তিম রোগশয্যায় পঙ্গু হবার আগে পর্যন্ত কত বিভিন্ন জায়গায় গানের মজলিস জমে উঠত শুধু তাঁর একক কণ্ঠের সুরলহরীতে। কানে এখনও তার রেশ লেগে আছে। চোখে ভেসে ওঠে হারমোনিয়াম সামনে গান গাইছেন শচীনদা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন স্ত্রী মীরা দেবী আর তবলায় সঙ্গত করছে পুত্র রাহুল দেববর্মণ। সঙ্গীতসাধক একটি পরিবারের মনোরম চিত্র। সফল শিল্পী-জীবনের একটি আদর্শ প্রাচীর পত্র যেন।

শচীনদার ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও অকৃপণ স্নেহে ধন্য হয়েছিলাম আমি। তাঁর শিশুসুলভ সরল ও নির্মল কৌতুক-মনের কয়েকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। মানুষ শচীন দেববর্মনের একটা রূপ তাতে আপনারা দেখতে পাবেন।

শচীনদা মনে প্রাণে ছিলেন খাঁটি বাঙালী।

কিন্তু ফুটবল দর্শক হিসেবে উনি ছিলেন প্রথমে বাঙাল, তারপর বাঙালী! বোম্বেতে রোভারস কাপ খেলায় কলকতার সব টিমগুলোর খেলা দেখতে উনি আসতেনই। এমনকি রেকর্ডিং থাকলে ভালো খেলার জন্য সেটা উনি ক্যানসেলও করে দিতেন। সত্যিকারের খেলা-পাগল বলতে পারেন। শচীনদার দুর্বলতা ছিল বলা বাহুল্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উপর। কিন্তু কোন কারণে ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে উনি চাইতেন মোহনবাগান যেন জেতে। আর মোহনবাগানও যদি হেরে যায় তাহলে শচীনদার একমাত্র প্রার্থনা হত— যেন কলকাতার যে কোন টিম রোভারস কাপ জিতে নিয়ে যায়। মোট কথা বাংলার টিমকে জিততে হবে। যেবার যে টিম শচীনদার ইচ্ছাপূরণ করে, শচীনদা সে টিমকে তাঁর গান রেকর্ডিংয়ে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে নানাভাবে আদর আপ্যায়ন করবেন। সে কি খাতির। যেন এটা ফুটবল খেলার টিম নয়, যেন এরা সব এক একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার। লতা, আশা, রফি, মান্না, কিশোর যে শিল্পীর গানই থাকুক শচীনদা প্রতিটি

খেলোয়াড়কে সেই কণ্ঠ-শিল্পীর সঙ্গে সগর্বে পরিচয় করিয়ে দেবেন, তারপর শুরু হবে ফটো তোলার হিড়িক। ভালো গান গাইবার পরও শচীনদাকে সচরাচর এত খুশী হতে দেখা যেত না।

শচীনদার খেলার শখ অনেক পুরোনো। সাহিত্য সংসদের প্রকাশনায় বাংলা সাহিত্যে অমূল্য গ্রন্থ সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধানে শচীনদা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ওঁরা লিখেছেন— " তিনি বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীও ছিলেন। প্রথম জীবনে পূর্ববাংলায়, বিশেষ করে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া ও আগরতলায় একজন উৎকৃষ্ট রেফারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।"

খেলার নেশা ছাড়া শচীনদার আরেকটা হবি ব' নেশা ছিল—মাছ ধরা। এই মৎস্য-শিকারেও আমার একটা ছোট্ট ভূমিকা ছিল। ঘটনাটা একবারই ঘটেছিল, কিন্তু তাতে শচীনদার চরিত্রের একটা দিক উন্মোচিত হয়েছিল আমার কাছে। বিশ্বাসের সততার যে সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় দিয়েছিলেন শচীনকর্তা, সেটা তাঁর মনের শিশুটার সারল্যকেই জ্যোতির্ময় করে তুলেছিল। ঘটনাটা শুনুন। বোমবের শহরতলীতে একটা হ্রদ আছে। নাম, 'পাওয়াই লেক'। কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে যে এই হ্রদের উদারহৃদয় মাছগুলো আপনার বড়শীতে আত্মহত্যা করার জন্য অত্যধিক উদগ্রীব। সুতরাং একদিন শচীনদা আমাকে বললেন— 'চলো শচীন, পাওয়াইতে যাবো মাছ ধরতে। তুমি সঙ্গে চলো'। উল্লসিত সম্মতিদান করলাম। থালার মাছ সম্পর্কে আমার মৎস্যজ্ঞান সীমাবদ্ধ। জলের মাছ সম্পর্কে আমার বিদ্যা—শূন্য। সুতরাং জ্ঞানার্জনের স্পৃহায় আমি ছিপ, সানগ্লাস আর স্ট্রহ্যাট্ ইত্যাদি নিয়ে শচীনদার সঙ্গে পৌঁছে গেলাম পাওয়াই লেকে। প্রচেষ্টা অশ্বডিম্ব প্রসব করেছিল। পর পর দু'দিন লাফিং বুদ্ধুর মতো বসে থেকে খালি হাতে ফিরতে হল। সম্ভবত মাছেদের অনশন ধর্মঘট চলছিল। তৃতীয় দিনে আটঘাটে বেঁধে তৈরী হচ্ছিলাম, হঠাৎ মোহন সায়গলের ফোন এসে গেল। জরুরী কাজ আমার উপস্থিত অনিবার্য। গেলাম। মোহনজীকে প্রশ্ন করলাম,—কি এমন কাজ স্যার? বললেন,—কোন কাজ নেই। বর্মনদাদা ফোন করে বলেছিলেন তোমাকে যেন আজ আমি ডেকে নিই। কেন ভগবানই জানেন।

রহস্যের সমাধান করে দিয়েছিল শচীনদার পুত্র আমার বন্ধু রাহুল, যার ডাকনাম পঞ্চম।

পঞ্চম বললো,—বাবার ধারণা পর পর দুদিন মাছ পাননি আপনার জন্য। আপনি হলেন অপয়া। এক খাপে যেমন দুটো তলোয়ার থাকতে পারে না, তেমনি এক লেকে দুটো শচীন অচল। মোহনজীকে ফোন করে আপনাকে বাবা তাই মাছধরা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

মনটা বেশ দমে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতেই মুড আমার ঠিক হয়ে গেল। যে সংবাদটা শুনে আমার বিষন্নতার উপসম হয়েছিল সেটা হল এই যে সেদিনও শচীনদা পাওয়াই থেকে খালি হাতে ফিরেছেন। দুই শচীনকে না, এক শচীনকেও মাছেরা পাত্তা দেয় নি। ওরা বেপাত্তা থেকে আমার বদনামটা ঘুচিয়ে দিল।

হবির কথা বলতে গিয়ে আরেকটা হবির কথা বলতে হয়। শচীনদা কুকুর পুষতে ভালোবাসতেন। বিলিতি কুকুর নয়, দেশী কুকুর। একবার রাস্তা থেকে একটা বাচ্চা কুকুর তুলে এনেছিলেন। পরদিন উনি বাজারে গিয়ে বেবি-কট্, নেটের মশারী সব কিনে আনলেন। কেন? কারণ সেই বাচ্চাকুকুরটাকে নাকি মশায় কামড়েছে! কুকুরের বাচ্চা বেবি-কটে শুচ্ছে নেটের মশারীর নীচে— কি রাজকীয় ব্যবস্থা দেখলেন তো। শাপগ্রস্থ রাজপুত্র ব্যাঙ হয়েছিল শুনেছিলাম, কিন্তু কখনও সারমেয়রূপধারণ করেছিল কোনদিন শুনিনি!

একবার শচীনদা আমাকে বলেছিলেন—জীবন কত প্রশংসা কত পুরস্কার, কত সম্মানই না পেয়েছি ; কিন্তু প্রথম জীবন ঢাকাতে এক ভক্ত আমাকে যে উচ্চপ্রশংসা করেছিল তার কাছে কোন প্রশংসাই দাঁড়ায় না।

কৌতূহল-কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম,—কি বলেছিলেন সেই ভক্ত ?

উনি বললেন—ঢাকাতে গানের মজলিস শেষ হতেই সেই ভক্ত আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন আবেগে, তারপর মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন,—কি গলাই পাইছেন কর্তা, মনে হইতেছে গলাটার মধ্যে যেন কোকিলে হাইগ্যা থুইছে। বাইচ্যা থাকেন কর্তা, বাইচ্যা থাকেন। বলো, এর চেয়ে বেশী আর কোন প্রশংসা হয় ?

শুনে আমি তো হেসে কুটি কুটি। কেননা আমি ঢাকার ছেলে, জানি ঢাকার কুট্টিদের প্রশংসার ভাষাটা এই ধরনেরই হয়! কোকিলের বিষ্ঠাত্যাগেই যে শচীন-কণ্ঠ এমন কিন্নর কণ্ঠ হয়েছিল সে-বিষয়ে সেই ভক্তের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। প্রশংসার ভাষা দিয়ে তাঁর সততাকে বিচার করবেন না যেন! যাই বলুন, প্রশংসাবাচনে ওরিজিন্যালিটি আছে।

দাদা হিন্দী বলতেন খুবই ভুল। সে সম্পর্কে উনি সচেতনও ছিলেন না। বোম্বের চিত্রজগতে দাদার ভাষা-বিভ্রাটের গল্পটা সর্বজনবিদিত। গানপাগলা আপনভোলা মানুষটাকে সেজন্য কেউই ভুল বুঝতেন না। ভাষার গণ্ডগোলটা হল এই—হিন্দী গানকে বাংলা গানা। কিন্তু উনি সর্বদা হিন্দী বলতে গিয়ে গানাকে বাংলা গানই উচ্চারণ করতেন। উনি বলতেন,—আশা, তুম্ জলদি আনা। তুমহারা গান ইজি হ্যায়। জলদি লে লেঙ্গে। বাদমে লতাকা গান লেঙ্গে। হারড গান হ্যায় লেনেমে টাইম্ লাগেগা। বাংলা মানে হল— আশা, তুমি তাড়াতাড়ি এস। তোমার গানটা সহজ, তাড়াতাড়ি নিয়ে নেব। পরে লতার গানটা নেবো। শক্ত গান তাই ও গানটা নিতে সময় লাগবে।

দাদার ঐ গানকে গান বলাটাই বিপজ্জনক। কেননা ধ্বনিগতভাবে বাংলা গান কথাটা হিন্দী অশ্লীল একটা কথার সঙ্গে মিলে যায় যার বাংলা হল—পায়ু। এইবার দেখুন সমস্ত ভাষণটার কিরকম কদর্থ হয়ে গেল! ফলে দাদার নেপথ্যে এই নিয়ে প্রবল হাসাহাসি হতো। কিন্তু লতাজি বা আশাজী বা অন্য কেউ এই নিয়ে কোনদিন দাদাকে ভ্রমসংশোধন করতে চেষ্টাও করেননি।

দাদার সেন্স অফ হিউমার ছিল চমৎকার।

একবার বলেছিলেন—বোম্বেতে নতুন এসেছি। প্রথম ছবি 'শিকারী'-র উদ্বোধন রজনীতে ছবি দেখতে গেছি। অনেক নামীদামী ফিলম স্টাররাও এসেছেন। ফলে সিনেমা হলের গেটের কাছে প্রচণ্ড ভিড়। আমার গাড়ি পৌঁছুতেই ভিড় ঘিরে ধরল গাড়িকে। ওরা ভেবেছিল কোন স্টার হবে। আমাকে দেখে হতাশ হয়ে একজন বলে উঠল—কোই নেহি হ্যায় রে, এ কোই ফালতু হ্যায়। বুঝলে শচীন, ওদের কাছে আমি হলাম—ফালতু। স্বভাবতঃই দর্শকভক্তেরা সাধারণত পর্দার পেছনের গুণীজ্ঞানী কলাকুশলীদের কমই চেনেন। ফলে এঁরা হলেন ফালতু!

একবার গীতিকার শৈলেন্দ্র এসেছিলেন দাদার কাছে। বললেন—আসাম বন্যার জন্য একটা চ্যারিটি ফাংশান হবে আপনাকে গাইতে হবে।

শচীনদা বললেন—যাবো। ভালো উপলক্ষ্য, নিশ্চয়ই যাবো।

শৈলেন্দ্র বললেন—এছাড়া আপনাকে কিছু চাঁদাও দিতে হবে।

শচীনদা বললেন—শৈলেন, তেরা মুখড়া আচ্ছা থা, লেকিন্ অন্তরা বহোৎ খারাপ হ্যায়।

শৈলেন্দ্রজী এ রসিকতায় হেসে ফেলেছিলেন।

একবার আমি ও শচীনদা রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছিলাম। ঠাকুরের মন্দিরে ঢোকার

আগে বাইরে জুতো রেখে ঢুকতে হয়। শচীনদাকে দেখলাম এক পাটি জুতো একদিকে রাখলেন, অন্য পাটিটা বেশ কিছু দূরে অন্য অনেক জুতোর পেছনে এক কোণে রাখলেন।

প্রশ্ন করলাম,—দাদা, একটা জুতো এদিকে, অন্যটা এত দূরে ওদিকে রাখলেন কেন ?

শচীনদা বললেন— তুমি জানো না শচীন, আজকাল বড্ড বেশী জুতো চুরি হচ্ছে।

• বললাম— শচীনদা, চোর যদি খুঁজে খুঁজে দুটো পাটি নিয়েই পালায় ?

শচীনদা বললেন— বেটা যদি এত পরিশ্রম করে তবে জুতো জোড়া ওর নিয়ে যাওয়াই উচিত।

শচীন দেববর্মণ সম্পর্কে এবার কিছু প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশন করা যাক। জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। জন্মঃ আশ্বিন মাসে, কুমিল্লার পৈতৃক বাড়িতে দুর্গাপূজার আনন্দের ভেতর মহাঅষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম। ইংরেজী তারিখ— ১লা অক্টোবর, ১৯০৬ সাল। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের ভেতর সর্বকনিষ্ঠ।

পিতাঃ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ত্রিপুরার মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর।

শৈশব ও কৈশোরঃ ললিত কলার দেশ ত্রিপুরার গ্রামে, মাঠে, ঘাটে, তিতাস-মেঘনা-গোমতীর জলে, ময়নামতী-গাজী-ভাটিয়ালীর সুরের মাঝে কেটেছে তাঁর বাল্য ও কৈশোর আগরতলা ও কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে। পিতাও ভালো গায়ক ছিলেন। রাজদরবারে তদানীন্তন বড় বড় গায়ক ও বাদকের সঙ্গীতের আসর বসত। শৈশব কৈশোরে সঙ্গীতানুরাগ ও শিক্ষার শুরু হয়ে যায়। পিতার কাছে ধ্রুপদ সঙ্গীত, ওস্তাদ কেরামতুল্লার ভাইপো ওস্তাদ ওয়ালীউল্লা খাঁর কাছ থেকে এসরাজ, শ্রীউমেশ দাস ও ওস্তাদ আলী আহম্মদ খাঁর কাছে তবলা শিক্ষায় গোড়াপত্তন। কৃষ্ণচন্দ্র দের প্রভাবে কণ্ঠসঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেন। কুমিল্লায় অজয় ভট্টাচার্য, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, সুবোধ পুরকায়স্থ, মহম্মদ খশ্রু এসব গুণীজনের সংস্পর্শে ছিলেন। হুমায়ুন কবির ছিলেন তাঁর স্কুলে সিনিয়র ছাত্র ও বন্ধু। বিখ্যাত মঞ্চবিদ সতু সেন ছিলেন সতীর্থ ও অন্তরঙ্গ। কুমিল্লায় অনেক মহাজনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন ও আশীর্বাদ ধন্য হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য হল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট।

শিক্ষাঃ কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ পাশ করেছেন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র এম. এ পাশ করে বিলেত গিয়ে আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করুক ও রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করুক। কিন্তু এম. এ ফিফ্থ ইয়ার পড়তে পড়তে সঙ্গীত-পাগল শচীনদা সঙ্গীতসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন উনি থাকতেন বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে। ওস্তাদ বাদল খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে—এঁদের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। এছাড়া আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁর সংস্পর্শে এসেও সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন।

কর্মজীবনের শুরুঃ পিতার মৃত্যুর পর বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের রাজবাড়ি ছেড়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে নাট্যমন্দিরের নাটকের সঙ্গীত পরিচালক করলেন দাদাকে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রথম যে দুটি নাটকে সুরারোপ করেছিলেন সে দুটির নাম ছিল 'সতীতীর্থ' ও 'জননী'। এই সময়ে উনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে পরিচিত হলেন অন্তরঙ্গভাবে। এছাড়া রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত হয়ে বন্ধুত্ব হল প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারু রায়, দিলীপকুমার রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী ও দুর্গাদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এছাড়া প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেব, ঠুংরী গায়ক জমিরুদ্দিন খাঁ, সারেঙ্গী বাদক ছোটে খাঁ সাহেবের সঙ্গে। শচীনকর্তার বড়বৌদিদির ভাই বিখ্যাত শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও তাঁর ছোড়দা লেফটেনেন্ট কর্নেল রাজকুমার কিরণকুমার দেববর্মণ শচীনদাকে সঙ্গীত সাধনায় প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য করেছেন। পিতৃদেব শচীনকর্তাকে এই সময়ে বিলেতে রাজ্যের প্রশাসন শিক্ষালাভের জন্য পাঠানো স্থির করলেন— কিন্তু সঙ্গীতপাগল পুত্র সে পিতৃআজ্ঞা পালন করলেন না। এই সময়ে 'সুর মন্দির' নামে গানের স্কুল খুললেন। ডি এম লাইব্রেরী তাঁর একটি স্বরলিপির পুস্তকও প্রকাশ করলেন। উদয়শঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল খুব। মধু বসু ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। ফলে চিত্রতারকা সাধনা বসু অনেককাল শচীনদার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। নাটোরের মহারাজা কর্তার গানের অনুরাগী ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি জসীমউদ্দিনের সঙ্গে ছিল প্রেমের সম্পর্ক। ক্রমে শচীন দেববর্মণ তাঁর নিজস্ব স্টাইল সৃষ্টি করলেন। বাংলা রাগ সঙ্গীত, কাব্য সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের চর্চা করে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিলেন তিনি। শুরু হল তাঁর রেডিও ও রেকর্ডে নিত্যনতুন গানের ফসল। বাঙালী মাত্র শচীন দেববর্মণের নামে পাগল হয়ে উঠেছিল। জয়-জয়কার পড়ে গেল শচীনকর্তার।

প্রথম বেতার সঙ্গীতঃ কলকাতা বেতার কেন্দ্রে গান গেয়েছেন প্রথম ১৯২৩ সালে। প্রথম পারিশ্রমিক ছিল দশ টাকা।

প্রথম রেকর্ডঃ 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহারে'— গীতিকার হেমেন্দ্রকুমার রায়। উল্টোদিকে ছিল—'এই পথে আজ এস প্রিয়া'—গীতিকার শৈলেন রায়। হিন্দুস্থান কোম্পানির কর্ণধার স্বয়ং চণ্ডী সাহা রেকর্ড করেছিলেন গান দুটি।

প্রথম খুব জনপ্রিয় হয়েছিলঃ 'ও কালো মেঘ বলতে পারো কোন দেশেতে থাকো' গানটি।

শচীন দেব বর্মণের রেকর্ডের গানের সংখ্যাঃ হিন্দুস্থান গ্রামোফোন কোম্পানিতে মোট ৬০ খানা গান গেয়েছেন। ৬০ খানা বাংলা গান। এই কোম্পানির তরফ থেকে হিন্দি গানের সংখ্যা হল—মোট ১৬ খানা।

এইচ এম ভি কোম্পানিতে গানের সংখ্যা হল মোট বাংলা—৩৯ খানা। হিন্দি—১৩ খানা।

শচীনদেব বর্মণের সঙ্গীত ছাড়া অন্যান্য 'হবি' ফুটবল, মাছধরা ও টেনিস। প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গে তিনি অনেক টেনিস খেলছেন।

শচীনদার অবিস্মরণীয় একটি স্মৃতিঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে গান শোনানো। দিলীপকুমার রায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে শচীনদার গান শুনিয়েছিলেন। কর্তা রাগপ্রধান ও লোক-সঙ্গীত গাইলেন। স্নিগ্ধ হেসে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন,—'শচীনবাবু, আপনার গান বড় শ্রুতিমধুর। আমার বড় ভালো লেগেছে।' এ প্রশংসা শচীনদা বাঁচিয়ে রেখেছেন রক্ষাকবচের মতো। কোনদিন ভুলতে পারেননি।

চলচ্চিত্রে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনাঃ বাংলা—'রাজগী' ছবিতে। ১৯৩৭ সালে। এর পর মোট ১৩ খানা বাংলা ছবিতে সুরারোপ করেছেন। উল্লেখযোগ্য— অভয়ের বিয়ে, মিলন, কলংকিনী, জজসাহেবের নাতনী 'মাটির ঘর' ছদ্মবেশী, প্রতিকার ইত্যাদি। ফলে চিত্রজগতে ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, বড়ুয়া ও সায়গল আর পংকজ মল্লিকের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়।

প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা— হিন্দী ছবিঃ ফিল্মিস্তানের 'শিকারী' ছবিতে। ১৯৪৫ সালে।

প্রথম হিন্দী ছবিতে জনপ্রিয় সুরঃ 'দো ভাই' চিত্রে গীতা দত্তের গাওয়া 'মেরা সুন্দর স্বপ্না বিৎ গয়া'।

হিন্দী ছবিতে প্রথম সুনাম অর্জনঃ দেব আনন্দের 'বাজি' ছবিতে।

যে ছবির রেকরড সবাধিক বিক্রি হয়েছেঃ শক্তি সামন্তের 'আরাধনা' ছবির। (ঘটনাচক্রে এ ছবির কাহিনীটি এই নিবন্ধ-লেখকেরই রচনা।)

সুরযোজনায় তাঁর চারটি সর্বশ্রেষ্ঠ ছবিঃ গাইড, তেরি সুবৎ মেরি আখেঁ, আরাধনা ও অভিমান।

সম্মান ও পুরস্কারঃ ১৯৫৯ সালে লণ্ডনে এশিয়ান ফিলম সোসাইটি 'পিয়াসা' ছবির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনার পুরস্কার দিয়েছেন.

ফিলমফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার— ১৯৫৩ সালে 'ট্যাকসি ড্রাইভার' ছবির জন্য, ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয়বার 'অভিমান' ছবির জন্য।

১৯৫৮ সালে উনি সঙ্গীত নাটক একাডেমীর অ্যাওয়ারড পেয়েছেন।

১৯৬৪ সালে 'ক্যয়সে কহু' চিত্রে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রয়োগের জন্য বোমবে সুরশিংগার সংসদ কর্তৃক স্বামী হরিদাস পুরস্কাব লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে 'তিন দেবীয়াঁ' ও ১৯৬৬ সালে 'গাইড'-ছবির সুররচনার জন্য সাংবাদিকদের কাছ থেকে বছরের শ্রেষ্ঠ সুরকারের পুরস্কার পান।

লোকসঙ্গীতঃ সিম্ফনিক মিউজিক চর্চার জন্য ১৯৫১ সালে ভারত সরকার তাঁকে সোভিয়েট রাশিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। ফিনল্যানড অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় উনি জুরী মনোনীত হয়েছিলেন।

ভ্রমণঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন হিল স্টেশন ও ইউরোপে সফর করেছেন বেশ কয়েকবার।

স্মৃতিলেখনঃ 'দেশ' পত্রিকায় উনি সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর সাধনা ও অভিজ্ঞতার মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন একমাত্র প্রকাশিত স্মৃতিচিত্র 'সরগমের নিখাদ' নামক ধারাবাহিক রচনায়।
শচীন ভৌমিকপরিবারঃ সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-শিল্পী মীরা দেবী তাঁর স্ত্রী ও বোমবের স্বনামধন্য সুরকার রাহুলদেব বর্মণ তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তান।

লোকসঙ্গীতের সফল প্রযোগের নমুনাঃ মেরা গোরা অংগ লেইলে (বন্দিনী) সুন্ মেরে বন্ধু রে (সুজাতা), জানু জানু রে (ইনসান জাগ্ উঠা) বা বাংলা স্বকণ্ঠে গীত— ওরে সুজন নাইয়া, নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভ্রমরা, পদ্মার ঢেউ রে, রঙিলা রঙিলা রে, বাঁশী শুনে আর কাজ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবীন্দ্র-সুর-ভাণ্ডার থেকে সফল প্রয়োগঃ যাঁয়ে তো যাঁয়ে কাঁহা (ট্যাকসি ড্রাইভার), জলতে হ্যায় জিস্কে লিয়ে (সুজাতা), জানে ও ক্যায়সে লোগ থে জিসকো প্যায়ারকো প্যায়ার মেলা (প্যায়সা), তেরে মেরে মিলন কি এ রয়না (অভিমান), নয়না দিওয়ানে, জিয়া নেহি মানে (অফসর) ইত্যাদি।

শাস্ত্রীয় সংগীতের সফল প্রয়োগঃ স্বকণ্ঠে— আমি ছিনু একা, মালাখানি ছিল হাতে, বাজে না বাঁশী গো ও হিন্দী ছবিতে ঝন্ ঝন্ পায়েল বাজে (বুজদিল), পুছো না ক্যায়েসে ময়নে রয়েন বিতাই (তেরি সুরৎ মেরী আঁখে), পবন দিওয়ানী (ডাঃ বিদ্যা) ইত্যাদি।

মৃত্যুঃ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৫ সাল।

শচীন-জীবনী সংক্ষিপ্ত ঘটনা বিন্যাসের এখানেই ইতি টানছি। কিন্তু আমার স্মৃতিচারণের ইতি নয় কিন্তু। শচীনদার বাংলা-হিন্দী নিজস্ব[illegible]গাওয়া ও সুবসংযোজিত গানের নাম নিবাচিত একটা তালিকা দিতে চাই। যারা তার ভক্ত তাঁদের এ তালিকাটা ভালো লাগবে। অনেকেই স্মৃতির আয়নায় খুঁজে পাবেন এই সব গানের রোমাণ্টিক ছায়াছবি। যাঁরা ভক্ত নন তাঁরাও এই অলিকার কিছু গান সংগ্রহ করে শুনতে পারেন।

শচীন-কর্তার গাওয়া নিচের বাংলা গানগুলো তুলনাহীন। সঙ্গীতপ্রিয়দের কাছে অমূল্য সম্পদ।

১। ও কালো মেঘ বলতে পারো কোন দেশেতে থাকো
২। আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে
৩। ঝুলনে ঝুলিছে শ্যাম রায়
৪। ওরে সুজন নাইয়া
৫। জ্বালায়ে চাঁদের বাতি, জেগে রব সারারাতি
৬। মালাখানি ছিল হাতে ঝরে তবু ঝরে নাই
৭। বাজে না বাঁশী গো
৮। প্রেম যমুনার পারে মোর হিয়া কেঁদে মরে
৯। রঙিলা রঙিলা রঙিলারে
১০। আঁখি দুটি ঝরে হায়
১১। ঘুম ভুলেছি এ নিশীথে
১২। মন দিল না বঁধূ মন নিল যে শুধু
১৩। প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল
১৪। বাঁশী শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশী
১৫। তুমি আর নেই সে তুমি
১৬। মধু বৃন্দাবনে দোলে রাধা কৃষ্ণ সনে
১৭। ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায়
১৮। ও জানি ভ্রমরা কেন কথা কয় না
১৯। শুনি তাকদুম্ তাকদুম্ বাজে, বাজে ভাঙ্গা ঢোল
২০। আলোছায়া দোলা
২১। চোখ গেল চোখ গেল
২২। বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে জোয়ার এসেছে আজ
২৩। কাঁদিব না ফাগুন গেলে
২৪। মেঘলা নিশি ভোরে
২৫। পথ চেয়ে রব
২৬। নিশীথে যাইও ফুলবনে

এবার হিন্দী শচীনদার স্বকণ্ঠে গাওয়া গানের নির্বাচিত তালিকা দিই—

১। শুন্ মেরে বন্ধু রে, শুন মেরে মিতুয়া (সুজাতা)
২। ও রে মাঝি (বন্দিনী)
৩। ওহা কৌন্ হ্যায় তেরা, মুশাফির, যায়েগা কাঁহা (গাইড)
৪। কাহে কো রোয়ে, হোনা যে হোয়ে, সফল হোগী তেরে আরাধনা (আরাধনা)
৫। মেরি দুনিয়া হ্যায় মা তেরা আঁচল (তালাশ)
৬। ডোলিমে বেঠাকে কাহার (অমর প্রেম)
৭। পিয়া তুনে কেয়া কিয়া (জিন্দগী জিন্দগী)
৮। পিলে পিলে হরিনাম কা প্যায়ালা (প্রাইভেট গান)
৯। ধীরেসে আনা বাগিয়ানেমে রে ভঁমরা(")
১০। গুণধাম হামারে গান্ধীজী (")

এই হল নিজকণ্ঠে গাওয়া তাঁর জনপ্রিয় হিন্দী গান। এর পর হিন্দী যেসব ছবিতে তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে তার একটি তালিকা দিলাম। মোট আশিখানারও বেশী ছবিতে সুরারোপ করেছেন কর্তা, তাই নির্বাচন করা শক্ত। তদুপরি আমার স্মৃতিশক্তি অতিপ্রখর ও নির্ভুল এত বড় গর্ব করার সাহস নেই।

তাঁর ছবিগুলো হল— 'দো ভাই' (গীতা দত্তের গায়িকা জীবনের সূত্রপাত। গান "মেরা সুন্দর স্বপ্না বিৎ গয়া"), শবনম্, বাজি ('তদবীর সে বিগরি হুই তকদীর বানা লে'—গীতা দত্তের জমজমকার), ট্যাক্সি ড্রাইভার (যাঁয়ে তো যাঁয়ে কাঁহা—তালাত মামুদের জনপ্রিয় গান), সজা (তুম না জানো কিস জাঁহা মে খো গয়া—লতা মঙ্গেশকর ও শচীন কর্তার যুগ্ম প্রতিভার প্রথম ফসল), জাল (এ রাত এ চাঁদনী ফির কাঁহা—হেমন্ত মুখার্জির বোম্বেতে জয়যাত্রার শুরু), পিয়াসা (জানে ও ক্যায়সে লোগ থে যিনকো প্যায়ারকো প্যায়ার মিলা—হেমন্ত মুখার্জির বিগ হিট গান, যিনে নাজ হ্যায় হিন্দপর ও কাঁহা হ্যায়—শাহীরের বিখ্যাত কবিতার বিখ্যাত গান মহম্মদ রফির কণ্ঠে। জানে ক্যায়া তুনে কহি, জানে কায়া ময়ানে শুনি—(গীতা দত্তের চটুল কণ্ঠের অপূর্ব চমৎকারিত্ব) পেইং গেস্ট (মানা জনাবনে পুকারা নেহি—কিশোর কুমারের প্রশংসনীয় আবির্ভাব), ফানটুস (দুঃখী মন মেরে শুন মেরা কহে না—কিশোরের প্রথম স্যাড সংগ), সোলবা সাল (হ্যায় আপনা দিল, তু আওয়ারা, না জানে কিসপে আয়েগা—হেমন্তকুমারের সুপারহিট গান), কাগজ কে ফুল (বক্ত নে কিয়া ক্যায়া হাসি সিতম্, তুম রহে না তুম হাম রহে না হাম—গীতা দত্তের মধুর আত্মসঙ্গীত), বোম্বাই কি বাবু (চল্‌রি সজনী অব্ ক্যায়া সোচে কাজলা না বহে যায়ে রোতে রোতে—মুকেশের হৃদয় নিংড়ানো গান), ইনসান জাগ উঠা (জান্ জানু রে কাহেঁকো খনকে তেরা কংগনা), বন্দিনী (যানেওয়ালে হো সকে তো লৌটকে আনা—মুকেশের আরেকটি দরদী কণ্ঠের গান), সুজাতা (জ্বলতে হ্যায় যিসকে লিয়ে—তালাত মামুদের কণ্ঠেই মানিয়েছিল এ গান), নদো গারা (জীবনকা সফরমে রাহী—কিশোরের টপ হিট), বাত এক রাত কি (না তুম হামে জানো, না হাম তুমে জানে—সুমন কল্যাণপুর ও হেমন্ত মুখার্জির অপূর্ব গান দুখানা), প্রেম পূজারী (ফুলোসে রংগসে ও সখিঁয়োসে খোলা যায়—কিশোরের দুটো রোমান্টিক গীত), কালাপানি (হাম বেখুদিমে তুমকো পুকারে চলে গয়া—মহম্মদ রফির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গজল), কালবাজার (আপনা তো হর আহ্ এক তুফান হ্যায়—রফির সুরেলা কণ্ঠে সার্থক সঙ্গীত), শর্মিলী (মেঘা ছায়ে আধিরাত বৈরন বন গয়া নিদিঁয়া—লতাজীর অপূর্ব একটি গান), অনুরাগ (নিদ চুরায়ে চৈন চুরায়ে—ডাকাতীয়া বাঁশীর সার্থক হিন্দী রূপান্তর), এ ছাড়া গাইড' তেরি সুরৎ, মেরি আঁখে, আরাধনা ও অভিমান- এর সব কটি গানই যে শচীনদার স্বর্ণস্বাক্ষর রয়েছে একথা কে অস্বীকার করবে ?

গীতা দত্ত ও কিশোরকুমার দুজনই তাঁদের সঙ্গীতজীবনে শচীন দেব বর্মণের মহৎ অবদানের কথা সর্বদা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এ দুজনের সার্থক শিল্পীজীবনের মূলে শচীনদার অনেকখানি হাত ছিল এ কথা সবাই জানেন।

বিনয় বিদ্যার ভূষণ। সেই দিক দিয়ে শচীনদা ছিলেন সত্যিকারের বিদ্বান। তাঁর বিনয়ের সাধুতা তাঁকে নির্লিপ্ত দেবতায় রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। গল্পচ্ছলে উনি যখন অতীতের বাতায়নে বসে স্মৃতিমন্থন করতেন তখন গুণীজনের আলোচনার আড্ডার কথা শুনে সে উর্বর প্রতিভার যুগটাকেই হিংসে হতো। সঙ্গীতবিশারদ ডঃ অমিয় সান্যাল ছিলেন তাঁর খুবই আপনার জন। শচীনদা স্বয়ং অমিয়বাবুর কাছে ঠুংরি গানের তালিম নিতেন। শচীন-প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অমিয়বাবু তাঁর একখানা গ্রন্থ শচীন দেব বর্মণের নামে উৎসর্গ পর্যন্ত করেছেন। তেজবাহাদুর সপ্রু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের রাজ্যপাল হরেন মুখার্জি ছিলেন শচীন- অনুরাগীদের কয়েকজন। এক

আসরে শচীন কর্তার গান শুনে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এই গুণী-সংগমের ফলশ্রুতি হিসেবে শচীনদা গান্ধীজীর প্রশস্তি গেয়েছিলেন একটি গানে। গানটি ছিল—'গুণপাম হামারে গান্ধীজী।' শচীনদার রাজা বসন্ত রায় রোডের আড্ডায় নিয়মিত যেতেন কুন্দনলাল সায়গল, রাইচাঁদ বড়াল, পংকজকুমার মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি গুণীজনেরা। এমন কি কুস্তিগীর গোবরও ছিলেন শচীন বন্ধুদের অন্যতম।

সারা জীবনে শচীনদা কোনদিন তাঁর "বাঙাল" ভাষায় কথা বলা ছাড়েননি। পূর্ব বাংলাকে উনি মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। ইচ্ছা করে ওই অঞ্চলের ভাষাকে আঁকড়ে ধরে থাকতেন। একটা ইংরেজী গল্প পড়েছিলাম—একটি শিশুকে তার দরিদ্র মা এক বড়লোকের দরজার সিঁড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন। শীতকাল, তাই তার অভাগী মা বাচ্চাকে তাঁর নিজের ছেঁড়া ওভারকোটটি দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন সন্তানের সুস্থ কামনায়। যাই হোক, সেই ধনী পরিবার সেই বাচ্চাটাকে (মেয়ে) গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই মেয়েটির একটা অদ্ভুত মানসিকতা দেখে ওঁরা অবাক হতেন। মেয়েটি বড় হয়েও ঋতুর শীতে বা মনের শীতে আশ্রয় খুঁজত তাঁর মায়ের সেই ছেঁড়া ওভারকোটের উষ্ণতায়। এটা যেন তার মা'র হৃদয়েরই উষ্ণতা। ওভারকোটটা ছিল মেয়েটির মাতৃমূর্তির প্রতীক; তাই মেয়েটির নির্ভরশীলতায় ছিল মাতৃস্নেহের সজাগ প্রহরার নির্ভয়তার শান্তি। মেয়েটি সর্বদা সেই ছেঁড়া ওভারকোটটি সঙ্গে সঙ্গে রাখত। যেন এটা তার শেকড়, এটা তার আত্মচিহ্ন, এটা তার রক্ষাকবচ, এটা তার বংশপরিচয়। শচীনদার বাঙাল ভাষা প্রীতির মূলটা অন্বেষণ করতে গিয়ে উপরোক্ত কাহিনীটাই আমার মনে পড়ল। ভাষাটা তাঁর হারিয়ে-যাওয়া দেশমাতৃকার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। সেজন্যই উনি ভাষাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সযত্নে, তাঁর গৌরবময় অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে। শচীনদার স্বকণ্ঠে গাওয়া স্ত্রী মীরা দেবী রচিত এই গানের পংক্তিতে রয়েছে তাঁর হৃদয়ের ছবি—

"বাংলা জনম দিল আমারে—
তোমার পরাণ আমার পরাণ এক নাড়িতেই বাঁধা রে—
মা-পুতের এই বাঁধন ছেঁড়ার সাধ্য কারো নাই।
সব ভুলে যাই তাও ভুলিনি বাংলা মায়ের কোল।
টাকদুম টাকদুম বাজাই বাংলা দেশের ঢোল।"

এর পর আঞ্চলিক মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

পুত্র রাহুল দেব বর্মণ প্রথম স্বকণ্ঠে গান গেয়েছিলেন আমার রচিত গীতে। মানে আমি ছিলাম সে গান দুটির গীতিকার। বলা বাহুল্য, সে রেকরডিংয়ে শচীনদা আমাকে ও তাঁর পুত্রকে আন্তরিক আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। আমার সাধুবাদটা যোগ্যতার জন্য নয়, তাঁর প্রশ্রয়কাতর সহৃদয়তার। কিন্তু পরে অন্য একটি গানে, "স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে' বলে গানটিতে এক জায়গায় পূর্ববঙ্গের লোকগীতি থেকে অংশ লাগিয়েছিলাম বলে বৃদ্ধের সে কি আনন্দ। তাঁর পছন্দের সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর প্রশংসাধ্বনি—'ওয়ানডার-ফুল' বলে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন তিনি। লাইন কয়টি পুত্র রাহুল রেকরডে গেয়েছিল সম্পূর্ণ বাবার ঢং-এ। লাইনগুলো হল—

"আমি যখন রান্দতে বসি,
তুমি তখন বাজাও বাঁশী
পোঁয়ার ছলে কানতে বসি
প্রাণ তো মানে না।"

প্রশংসা আমার রচনাপ্রতিভার জন্য নয়, সংগ্রহরুচির জন্য। আমাকে তিনি অনাবিল স্নেহ করতেন। এ স্নেহ আমার সৌভাগ্যের শুকতারা ছিল। ফিল্মি পারটি উনি

একেবারে পছন্দ করতেন না। চাটুকার-সংসর্গ বা পশ্চিমী ধারার আড্ডায় উনি যেতেনই না। প্রকৃতি ছিল তাঁর বন্ধু। পাহাড়, জঙ্গল, নদী আর বোম্বেতে প্রিয় ছিল জুহুর সমুদ্রতীর। কিন্তু আমার জন্মদিনে উনি প্রতিবার এসেছেন। আমার বিবাহে বরযাত্রী যাওয়া থেকে সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ড হোটেলে ফিলমি কায়দায় রিসেপসান পারটি পর্যন্ত সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। আমার স্ত্রী বাঁশরীকে কন্যাসম স্নেহ করতেন। আমার শ্বশুরমশাই সঙ্গীত জগতের লোক। তিনি হলেন বিখ্যাত তারসানাই ও দিলরুবা শিল্পী দক্ষিণামোহন ঠাকুর। শচীনদার প্রিয়পাত্র। আমার গলায় সুরজ্ঞান বিন্দুমাত্র নেই। তাই আমাকে রসিকতা করে বলতেন—অসুরমশাই, কেমন আছে তোর সুরমশাই? মানে আমি প্রচণ্ড বেসুরো বলে আমার নাম করেছেন—অসুর-মশাই। আর আমার শ্বশুরমশাই ওঁর ভাষায় হলেন—সুরমশাই। অসুরের বিপরীত হিসেবে উনি সুরমশাই! আমার স্ত্রীকে উনি দেখা হলেই আমার মা'র সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন—কি বাঁশরী, কেমন আছে তোর শাশুড়ী?

আমার উর্দু শেরের সংকলন গ্রন্থ ''শেরশায়রী'' আমি শচীনদা ও তাঁর পুত্র রাহুলের নামে উৎসর্গ করেছি। বইটির প্রথম কপি পেয়ে বৃদ্ধের সে কি শিশুসুলভ আনন্দ। স্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন—মীরা দেখো, শচীন আমাগো কি চমৎকার বই ডেডিকেট করছে। ওয়াণ্ডারফুল।

শচীনদা স্পোর্টসলাভার সেটা আগেই বলেছি। ছেলে পঞ্চম ও আমার ভুঁড়ি হচ্ছে দেখে এবার বললেন—কি খাচ্ছে তাই মোটা হয়ে যাচ্ছো তোমরা। কাল থেকে তোমরা দু'জন আমার সঙ্গে ফুটবল খেলবে।

পরদিন কি কাণ্ড, শচীনদা সকালবেলায় আমাকে বাড়িতে ডাকতে এলেন। তখন ভোর পাঁচটা। গাড়িতে এসে দেখি উনি একটা নতুন ফুটবল কিনে এনেছেন ও গাড়িতে সদ্য ঘুমভাঙা পুত্র পঞ্চমও বসে রয়েছে। নিয়ে এলেন খার জিমখানার মাঠে। এর পর বেশ কিছুদিন আমাকে ও পঞ্চমকে মাঠে সকালে গিয়ে ফুটবল খেলতে হয়েছে। ফ্যাট কমাবার জন্য সেটা ছিল তাঁর বিধান। এই প্রভাত-ব্যায়ামের সাজা থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেক দিন লেগেছিল। অসুস্থতার অজুহাত দিয়।। তবে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম!

একদিন প্রশ্ন করেছিলাম মীরা বউদিকে—পঞ্চমের নামকরণ কে করেছেন?

বউদি বললেন—কর্তা স্বয়ং। আমরা বম্বেতে নতুন এসেছি। সায়ানে থাকতাম। কর্তা ছেলেকে শিখিয়েছিলেন—বল তো বাবা, সা রে গা মা পা। ছেলে বলত সেটা। কর্তা বললেন—এবার 'পঞ্চম' কথাটা এই সা রে গা মা পা-র মতো সুরে বলতো? ছেলে সুর করে দীর্ঘ টানে বলতো প-ঞ্চ-ম। বাপ ছেলের এটা ছিল খেলা। বাইরে থেকে এসেই কর্তা বলতেন—সা রে গা মা পা।

ছেলে দূর থেকে প-ঞ্চ-ম বলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত বাবার কোলে। এইভাবে ছেলের ডাক-নামটা হয়ে গেল পঞ্চম।

শচীনদার কতকগুলো অবসেসন ছিল। যেমন পঞ্চমের ছোটবেলায়। ছেলের সঙ্গে খেলতেন একটাই ছড়া বার বার বলে। ছড়াটা ছিল—

টংকালী গো টংকালী
নাকে মুখে চুনকালী।

ছড়াটি যে তাঁর অবসেসন সেটা বোঝা যায় যখন এই ছড়ার আধারে উনি বম্বে টকীজের বাংলা একটা ছবি ''মশাল''-এ গান তৈরী করেছিলেন। গানটির শুরু ছিল—

"সুন্দরী গো সুন্দরী
দল বেঁধে আয় গান করি"।

আরেকটা বাতিকের কথা উল্লেখ করি।

যখনই কোন প্রযোজককে ছবির জন্য সুর শোনাতেন তখন অন্যান্য সঙ্গীত পরিচালকের মতো 'ডা-ডা ডা-ডা' বা 'পা পা পা পা' জাতীয় ধ্বনি মাধ্যমে শোনাতেন না। উনি কানন দেবীর গাওয়া পুরনো একটা ফিলমের গানের কথা দিয়ে শোনাতেন। সব সুরই ঐ একই বাংলা গানের কথা দিয়ে শোনাতেন! কেন যে ঐ একই গানের কথা ব্যবহার করতেন সেটা আমার কাছে রহস্য থেকে গেছে। গানটার কথা হল—

আড়ি আড়ি
বউ মান করেছে,
চলে যাবে বাপের বাড়ি।

এই লাইন তিনটে যে কর্তার মুখে কতো বিভিন্ন সুরে শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। শচীন দেব বর্মণ সঙ্গীত জগতের এক বিস্ময়। প্রতিভায় তিনি ছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ অথচ মানুষ হিসেবে ছিলেন শিশুর মতো, শিশুর মতো।

সত্যি কথা। মনে হচ্ছে এত কথা বলেও তাঁর প্রতিভার যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারলাম না। উনি যতই গানে উদাস কণ্ঠে নিবেদন করুন—"মনকে কিতাব্‌সে মেরা নামহি মিটা দেনা" মানে 'মনের গ্রন্থ থেকে আমার নামটা মুছে ফেলো।'

তা পারব না, পারা যায় না।

মৃত্যু না আসা পর্যন্ত স্মৃতির খাতায় সোনার আঁখরে তাঁর নাম লেখা থাকবে।

= সঙ্গীত লহরী =

কথাঃ শচীন ভৌমিক
গায়িকাঃ শারণ প্রভাকর
সুরঃ অরূপ প্রণয়

আমার কোলকাতা, আমার ক্যালকাটা।
মাই ক্যালকাটা, ও মাই ক্যালকাটা।
কত হাসি কান্না, গান, প্রাণ মমতার নগর।
সততার নগর, মমতার নগর।
তিনফোটা বছর এই ভাবেই বেড়ে বেড়ে বড় হলো
এই সোনার শহর, এই মমতার নগর,
এ মহানগর, এ রূপনগর।

ছড়িয়ে রয়েছে কতো স্মৃতি, কতো ঘটনা,
রয়েছে গেঁথে মনে রামকৃষ্ণদেবের বচনদক্ষিণা
বিবেকানন্দ, জীবানানন্দ
সুভাষচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র
কত হাসি কান্না, গান, প্রাণ মমতার নগর।
সততার নগর, মমতার নগর।
তিনফোটা বছর এই ভাবেই বেড়ে বেড়ে বড় হলো
এই সোনার শহর, এই মমতার নগর,
এ মহানগর, এ রূপনগর।
ছড়িয়ে রয়েছে কতো নিবেদিতা
আর মাদার টেরেসা
রবিঠাকুর, রামমোহন, সত্যজিৎ
দিয়েছে নব নব দিশা।
শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, আরো কত নাম
আমাদের নজরুল ইসলাম।
তিনফোটা বছর বেড়ে বেড়ে বড়ো হল
এই সোনার শহর, মমতার নগর।
কতো হাসি কান্না, গান, প্রাণ মমতার নগর।
সততার নগর, মমতার নগর।
তিনফোটা বছর এই ভাবেই বেড়ে বেড়ে বড় হলো
এই সোনার শহর, এই মমতার নগর,
এ মহানগর, এ রূপনগর।
মাই ক্যালকাটা, ও মাই ক্যালকাটা।

————x————

কথাঃ শচীন ভৌমিক
গায়িকাঃ শারণ প্রভাকর
সুরঃ অরূপ প্রণয়।

দিকে দিকে প্রজাপতি
তুমি মোর পুজারতি
তুমি অগতির গতি
তুমি দীপ, তুমি জ্যোতি।

খুশীর ছোঁয়ায় রঙিন প্রণয়,
দেহ মনে এনেছো প্রলয়
মনে হয়, মনে হয়,
তোমায় পাবো নিশ্চয়।
ভেঙে দিয়ে সব বাঁধা
এসো প্রেমের দেবতা।

জ্বালো প্রেমের আগুন
আলো মনে ফাগুন
মুছে ফেলো সব ভয়
হও তুমি নির্ভয়।

মনে হয়, মনে হয়
তোমায় পাবো নিশ্চয়
ভেঙে দিয়ে সব বাঁধা
এসো প্রেমের দেবতা।
দিকে দিকে প্রজাপতি
তুমি মোর পুজারতি
তুমি অগতির গতি
তুমি দীপ, তুমি জ্যোতি।

———x———

কথাঃ শচীন ভৌমিক
গায়ক ও সুরঃ রাহুল দেব বর্মণ

দিতে পারি এ জীবন হতে পারি ধন্য
তোমার জন্য।
সাক্ষী এ নীলাকাশ, সাক্ষী অরণ্য
তোমার জন্য।
শুধু ভেবে লাভ নেই, পাপ আর পুণ্য
দিতে পারি এ জীবন হতে পারি ধন্য
তোমার জন্য।

স্বপ্নের পৃথিবী কোনদিন চাইনি,
মমতার সন্ধান কোনদিন পাইনি
মরুর জীবনে, দিনরাত জ্বলেছি
আগুনের পথ ধরে আমি শুধু চলেছি।
শুধু ভেবে লাভ নেই, পাপ আর পুণ্য
দিতে পারি এ জীবন হতে পারি ধন্য
তোমার জন্য।

প্রেম হলো ঈশ্বর, প্রেমে নেই স্বার্থ
প্রেম হলো পুজা, প্রেম পরমার্থ
আমিই সারথী, আমিই পার্থ,
খুঁজে তবু পাইনি জীবনের অর্থ।
শুধু ভেবে লাভ নেই, পাপ আর পুণ্য
দিতে পারি এ জীবন হতে পারি ধন্য
তোমার জন্য।

আমি তুমি সকলে এক একটি বিন্দু
যদি হই একসাথ, হতে পারি সিন্ধু
যদি হই একপ্রাণ হতে পারি বলবান
মরুতে ফোটাকে ফুল, পাথরের বুকে গান
দিতে পারি এ জীবন হতে পারি ধন্য
তোমার জন্য।।

———x———

কথাঃ শচীন ভৌমিক
সুরঃ রাহুল দেব বর্মন

পুরুষকণ্ঠঃ তুমি এলে অনুপমা, এলে তুমি প্রিয়তমা।
মরুর বুকে যেন ফুলের মেলা
আঁধার রাতে যেন চাঁদের খেলা
কাছে এসো, আরো কাছে, লজ্জার কি বা আছে।
তুমি এলে অনুপমা, এলে তুমি প্রিয়তমা।
এখন মধুর রাতে, কাছে এসো তুমি, পাশে বসো তুমি
হাতখানা রাখো হাতে।
কলি তুমি ওগো, ফুল তুমি ওগো
তুমি যূথীর মালা।

নারীকণ্ঠঃ এমন দুষ্টু তুমি, দেখিনি তো আগে,
ভাবিনি তো আগে, এমন পাগল প্রেমী।
অধীর তুমি, বধীর তুমি, নয়নে আগুন জ্বালা।

পুরুষকণ্ঠঃ তুমি এলে অনুপমা, এলে তুমি প্রিয়তমা

দ্বৈতকণ্ঠেঃ হাসিখুশী দিনরাতে, থাকি যেন একসাথে
সুখে থাকি মোরা
থাকি সুখে মোরা
দুঃখের কিবা আছে।

নারীকণ্ঠঃ মরুর বুকে যেন ফুলের মেলা
আঁধার রাতে যেন চাঁদের খেলা
কাছে এসো, আরো কাছে, লজ্জার কি বা আছে।

পুরুষকণ্ঠঃ তুমি এলে অনুপমা, এলে তুমি প্রিয়তমা।

———x———

রচনাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ রাহুলদেব ও আশা ভোঁসলে
সুরঃ রাহুল দেব বর্মণ

বাঁশের কঞ্চি এগারো ইঞ্চি নাচে মেঘের বোনঝি
তাই দেখে ভিজে গেছে সুনীলের গেঞ্জি।
কি লাভ হবে করে এই চিৎকার কোলাহল,
তোমরা তো হারবেই, জিতবে আমাদেরই দল।
যত খুশী বলো হিংসায় জ্বলো শুধু গেয়ে চলো
বলো হরি বোল, বলো বলো হরি বোল, বলো বলো।

হুইয়া হুইয়া মালপোয়া। মারকে টেনে পানতুয়া।
ডাকবে সাধের পায়রাগুলি বক্ বক্ বকম্ বক্।
ডিমের ডেভিল খেয়েদেয়ে মনের সুখে থাক্।
আয়না, আয় না, এবার তোদের নাক কাটি।
আয় না, আয় না, এবার তোদের কান কাটি।
যত খুশী বলো হিংসায় জ্বলো শুধু গেয়ে চলো
বলো হরি বোল, বলো বলো হরি বোল, বলো বলো ।।

আরে ভোট নয় ছেলেখেলা
আর নয় রকবাজি।
ম্যাটার ভেরি সিরিয়াস।
খেয়ে নাও ডিগবাজি।
বল না, বল না, বল না ওরে মাকাল ফল।
যত খুশী বলো হিংসায় জ্বলো শুধু গেয়ে চলো
বলো হরি বোল, বলো বলো হরি বোল, বলো বলো।

কি লাভ হবে করে এই চিৎকার কোলাহল,
তোমরা তো হারবেই। জিতবে আমাদেরই দল ।।

———————x———————

কথাঃ শচীন ভৌমিক
গায়কঃ কুমার শানু
সুরঃ রাহুলদেব বর্মণ

আয়, আয়, ঘুম আয়।
ওগো পরীরাণী, ঘুমের পাটরাণী
রাত যে হীমানী, ফুরিয়ে না যায়।
চাঁদের বুড়ি চড়কা দিল থামিয়ে,
আকাশ জুড়ে তারা সব ঘুমিয়ে।
গাছেরা সব নিঃঝুম, পাখীদের চোখে ঘুম,
চাঁদ যেন ডুবে না যায়।
আয় আয় ঘুম আয়।
ওগো পরীরাণী, ঘুমের পাটরাণী
রাত যে হীমানী, ফুরিয়ে না যায়।
ঘুমের দেশে পরী ছিল ঘুমিয়ে,
জেগে উঠে আমায় দিল জাগিয়ে
প্রেম হল নির্দয়। মেনেছি পরাজয়।
মন কেন ফিরে পেতে চায়।
আয় আয় ঘুম আয়।
ওগো পরীরাণী, ঘুমের পাটরাণী
রাত যে হীমানী, ফুরিয়ে না যায়।
ঘুমকে আমার কি দিয়েছে তাড়িয়ে,
নিজের কাছে নিজেই গেছি হারিয়ে।
এই মন দর্পন, কাকে করি অর্পণ,
হৃদয় জুড়ে শুধুই হায় হায়।
আয় আয় ঘুম আয়।
ওগো পরীরাণী, ঘুমের পাটরাণী
রাত যে হীমানী, ফুরিয়ে না যায়।।

———x———

সঙ্গীত লহরী

রচনাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ আশা ভোঁসলে
সুরঃ রাহুলদেব বর্মণ

আজ অন্ধকার, যতোই হোক, দূর হবে,
এই বন্ধদ্বার। কাটাতার, চুর হবে।
তুমি আমি, দু'জনাতে, চলি সাথে, কিসের ভয়।
যেতে যেতে পথে হবে দেরী,
ঝড়ে জলে ডোবে যদি তরী
শুকতারা, দেখে মোরা, পাবো দিশা, কিসের ভয়।
আজ অন্ধকার যতোই হোক, দূর হবে,
এই বন্ধদ্বার। কাটাতার, চুর হবে।
বুকে আজি, বীণা বাজে, জোরে
কেটে যাবে, মহানিশা, ভোরে।
ভালোবাসা, দেবে ভাষা। দেবে আশা, কিসের ভয়।
আজ অন্ধকার যতোই হোক, দূর হবে,
এই বন্ধদ্বার। কাটাতার, চুর হবে।
সোনা মেঘে, ভরে যাবে, আকাশ
ফুলবাসে, ভরে যাবে, বাতাস।
আসুক প্রলয়, প্রেমের জয়, হবে নিশ্চয়, কিসের ভয়
আজ অন্ধকার যতোই হোক, দূর হবে,
এই বন্ধদ্বার। কাটাতার, চুর হবে।।

————x————

সঙ্গীত লহরী

কথাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ কবিতা কৃষ্ণমূর্তি
সুরঃ রাহুলদেব বর্মণ

এক ডাকে ঐ, দুই ডাকে ঐ
শোন শোন তোরা ভালোবাসার ডাক।
যত চাও মধু দেবো, আমি যে মৌচাক।
ধিন্ তিনাক ধিন ধিন তিনাক।

গানের নামে দিব্যি খেয়ে পেটের কথা কই,
টঙ্গালী গো টঙ্গালী, মনের মানুষ কই।
অনেক করে যতন, আমি রতন চিনিছি
আমি প্রেম করেছি, আমি প্রেম করেছি
গাছে তুলে দিয়ে কারিস কেন মই।
এক ডাকে ঐ দুই ডাকে ঐ
শোন শোন তোরা ভালোবাসার ডাক।

শিবের নামে দিব্যি খেয়ে সত্যি কথা কই।
এমন সোনার অঙ্গ নিয়ে একা কেন রই।
অনেক করে যতন, আমি রতন চিনেছি
আমি প্রেমে পড়েছি, আমি প্রেমে পড়েছি।
এক ডাকে-ঐ দুই ডাকে ঐ
শোন শোন তোরা ভালোবাসার ডাক।

পুরুষকণ্ঠঃ

গুরুর নামে দিব্যি খেয়ে এবার জবাব দিই
তুমি আমার ফুলের কলি, রূপা, শতাব্দী।
অনেক করে যতন আমি আতর চিনেছি
আমি আতর চিনেছি।
ছেড়ে চলে যাবো আমি এমন মানুষ নই।
এক ডাকে ঐ দুই ডাকে ঐ
শোন শোন তোরা ভালোবাসার ডাক।।

———x———

সঙ্গীত লহরী

রচনাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ উষা উত্থুপ
সুরঃ রাহুলদেব বর্মণ

বাতি নেই, বাতি নেই, কোলকাতাতে বাতি নেই,
দিনদুপুরে জ্যোতি আছে, রাত্তিরে তো বাতি নেই।
গানের শহর, প্রাণের শহর, শহর অনুপমা,
এই নগরী আমার কাছে রূপের তিলোত্তমা।
বাতি নেই বাতি নেই, কোলকাতাতে বাতি নেই,
দিনদুপুরে জ্যোতি আছে, রাত্তিরে তো বাতি নেই।

সিনেমাতে ছবি আছে। কফি হাউসে কবি আছে,
দিনের মধ্যে সবই আছে, শুক্র, শনি, রবি আছে।
ময়দানেতে মিটিং আছে, লাইফে অনেক ফ্যাচাং আছে,
দিনদুপুরে জ্যোতি আছে, রাত্তিরে তো বাতি নেই।
বাতি নেই বাতি নেই, কোলকাতাতে বাতি নেই,
দিনদুপুরে জ্যোতি আছে, রাত্তিরে তো বাতি নেই।

প্যাণ্ডেলেতে ঠাকুর আছে, দাদুর সঙ্গে নাতি আছে,
বর্ষাকালে ছাতি আছে, পাতালেতে মেট্রো আছে
ধনী আছে, কাঙাল আছে, ঘটি আছে বাঙ্গাল আছে
বিয়ে বাড়ি বাদ্যি আছে, রাত্তিরে তো বাতি নেই।
বাতি নেই বাতি নেই, কোলকাতাতে বাতি নেই,
দিনদুপুরে জ্যোতি আছে, কোলকাতাতে বাতি নেই।

কালীঘাটে কালী আছে, বালীগঞ্জে বালি আছে,
বেগবাগানে বাগান আছে, টালীগঞ্জে টালি আছে।
লালকুঠিতে রাণী আছে, ব্যাংকে অনেক মানি আছে
ঘরে বৌ রাণী আছে, রাত্তিরে তো বাতি নেই।
বাতি নেই বাতি নেই, কোলকাতাতে বাতি নেই,
দিনদুপুরে জ্যোতি আছে, কোলকাতাতে বাতি নেই।।

——————x——————

রচনাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ উষা উত্থুপ
সুরঃ রাহুলদেব বর্মণ

আগামী শিশুরা, স্বপ্নের শিশুরা
এসো না এ ধরাতে, এখানে দুঃখ আর কান্না
চারিদিকে হানাহানি, শুধু রক্তের বন্যা।
আগামী শিশুরা, স্বপ্নের শিশুরা
এসো না এ ধরাতে, এখানে দুঃখ আর কান্না
চারিদিকে হানাহানি, শুধু রক্তের বন্যা।
আজ এই পৃথিবীটা বাসের অযোগ্য,
নেই কোন প্রতিকার, নেই যে আরোগ্য।
মানুষ যে অমানুষ, নিষ্ঠুর ও বণ্য
হাসিখুশী ভালোবাসা সব যে পন্য
চারিদিকে দূরের দেশেতে
শুনেছি আছে যে সুখেরই বন্যা।
আগামী শিশুরা শিশুরা, স্বপ্নের শিশুরা
এসো না এ ধরাতে, এখানে দুঃখ আর কান্না
চারিদিকে হানাহানি, শুধু রক্তের বন্যা।
এসো যদি, এসো তুমি, সূর্যের রথেতে,
বসুধারে নিয়ে চলো স্বর্গের পথেতে,
এ নরক-পৃথিবীটা করে দাও ধ্বংস
শেষ করো যতো আছে রাবণ ও কংস
পৃথিবীর বুকেতে করে দাও সুখেতে
করো গো অনন্যা।
আগামী শিশুরা শিশুরা, স্বপ্নের শিশুরা
এসো না এ ধরাতে, এখানে দুঃখ আর কান্না
চারিদিকে হানাহানি, শুধু রক্তের বন্যা।।

———————x———————

কথাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ উষা উত্থুপ
সুরঃ রাহুলদেব বর্মণ

কাছে এসো হিরোজী, হিরোজী ও হিরোজী।
বাংলাদেশের মেয়ে আমি, তোমায় আমি করবো স্বামী।
জানি তুমি হিন্দিভাষী। তবু তোমায় ভালোবাসি।
আমার নেই গো লজ্জাসরম, বুকে শুধু আগুন গরম,
করবো শুধু হৈ চৈ, সর্ষে গাছ আর মিষ্টি দই।
পরবো আমি টাঙ্গাইল সাড়ি, রাঁধবো চিংড়ির মালাইকারী,
খেতে দেবো গঙ্গার ইলিশ, জানি তুমি করবে রেলিশ।
প্রেম যে আমি করবো ভীষণ। আমি রাধা তুমি কিষণ।
তুমি প্রেমের গুরুজী, গুরুজী
হিন্দী আমি বলতে পারি থোরা থোরাজী।
হিরোজী ও হিরোজী।।

কাছে এসো রাজাবাবু, কেন এত নারাজী
লাল সাড়ি পরে আছি, চোলি মোর ফিরোজি
আমি রাজা, তুমি রাণী, হিরোজী ও হিরোজী।

চলো যাই আমি তুমি ছাদনতলাতে, প্রেম খেলা খেলি মোরা দুজনে,
কেটে যাবে সারা বেলা আনন্দমেলাতে, এ আকাশ ভরে যাবে মধুকূজনে।
কাছে এসো রাজাবাবু কেন এত নারাজী
লাল সাড়ি পরে আছি, চোলি মোর ফিরোজি
আমি রাজা, তুমি রাণী, হিরোজী ও হিরোজী।

বসে আছি ভরে সাজি ফুলের বাসরে, আশার প্রদীপ জ্বেলে রেখেছি,
এসো মোর বাহুডোরে, কাছে টেনে নাও মোরে, লজ্জার মাথা কেটে
কাছে এসো রাজাবাবু কেন এত নারাজী
লাল সাড়ি পরে আছি, চোলি মোর ফিরোজি
আমি রাজা, তুমি রাণী, হিরোজী ও হিরোজী।

রচনাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ ঊষা উত্থুপ
সুরঃ রাহুলদেব বর্মন

রাতের তারা আছে আকাশ জুড়ে
পাখীরা সব এসেছে ফিরে
থেকোনা তুমি এত দূরে
বাঁশি বাজে ঐ মাতাল সুরে
কানে কেন শুধু বাজে, বাজে গো সানাই
প্রেমে পড়ে যাই গো আমি, প্রেমে পড়ে যাই।

তোমার চোখে কি যে আছে
ভয় হয় মোর যেতে কাছে
ধরা পড়ে যাই গো পাছে
ঢাকের বাদ্যি বুকের মাঝে
কানে কেন শুধুই বাজে, বাজে গো সানাই
প্রেমে পড়ে যাই গো আমি, প্রেমে পড়ে যাই।

ফুল এনেছি ভোরের বেলা,
গেঁথেছি আজ বরণডালা
ভেঙেছি আজ ঘরের তালা
শুরু ভালোবাসার পালা
কানে কেন শুধুই বাজে, বাজে গো সানাই।
প্রেমে পড়ে যাই গো আমি, প্রেমে পড়ে যাই।।

——— x ———

সঙ্গীত লহরী

রচনাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ ঊষা উত্থুপ -
সুরঃ রাহুলদেব বর্মন

সুখ নেই গো কপালে।
ডুবে থাকো গভীর জলে, খালে আর বিলে,
ধরা কেন দাও না ওগো আমার প্রেমজালে।
সুখ নেই গো কপালে। -

আশা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, চলে গেলে বিদেশে,
কাছে এসে, পাশে বসে, চলে গেলে অবশেষে
গাছে কত ফুল ছিল, ঝরে গেল অকালে।
সুখ নেই গো আমার প্রেমজালে।

হাত ছিলো মোর হাতে, রাত ছিল তারাভরা,
মন ছিল সুরে ভরা, মধুভরা, খুশী ভরা
দিনরাত কেঁদে সারা কোথায় হারালে।
সুখ নেই তো কপালে।
ধরা তুমি দাও না ওগো আমার প্রেমজালে।
সুখ নেই গো আমার প্রেমজালে।।

——————— x ———————

রচনাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ উষা উত্থুপ
সুরঃ রাহুলদেব বর্মন

আমি তুমি দু'জনাতে, পথ চলি সাথে সাথে।
এ চলা সারাজীবন, এ জীবন মহাজীবন।
চোখের চাহনী, মনে কাহিনী
কেন যে বোঝ না প্রিয়তম,
মনের গভীরে, দেখো যে ছবিরে
এ শুধু হৃদয়ের সংগম।
তুমি দীপ, আমি কিরণ।
এ চলা সারাজীবন।
আমি তুমি দু'জনাতে, পথ চলি সাথে সাথে।
ছিলে তুমি স্বপনে, এসে গেছো জীবনে
কি যাদু করেছো আমাকে,
তুমি মোর সাধনা, তুমি আরাধনা
কি ডোরে বেঁধেছি তোমাকে।
আমি চাঁদ, তুমি গগন
এ চলা সারাজীবন।
আমি তুমি দু'জনাতে, পথ চলি সাথে সাথে।
আমি যে তোমারই, প্রেমের পূজারী
এখনো জানোনা সজনী
তোমারই হাসিতে, প্রেমের বাঁশীতে
শুনি যে মিলন রাগিনী।
এ মিলন মহামিলন,
এ চলা সারাজীবন।
আমি তুমি দু'জনাতে, পথ চলি সাথে সাথে।।

———— x ————

সঙ্গীত লহরী

কথাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ রাহুলদেব বর্মন ও আশা ভোঁসলে
সুরঃ রাহুলদেব বর্মন

গান

রাহুলঃ জানিনা কোথায় তুমি হারিয়ে গেছো আর পাব কিনা
আমি তাই, খুঁজি তোমায়, কোথায়-কোথায় ?
আশাঃ এখানে, এখানে।
রাহুলঃ বারে বারে আমি, জ্বেলেছি আশার বাতি,
ফিরে গেছে, কত যে চাঁদ, কেঁদে সারা রাতি।
আমি তাই, খুঁজি তোমায়, কোথায় কোথায় ?
আশাঃ এখানে, এখানে।
জানি না কোথায় তুমি হারিয়ে গেছো আর পাবো কিনা
এই তো আমি আবার, এসেছি তোমার কাছে
তোমারই সুর, তোমারই গান, আমায় ঘিরে আছে।
আমি তাই খুঁজি তোমায়, কোথায় কোথায় ?
রাহুলঃ এখানে, এখানে।
আশাঃ জানিনা কোথায় তুমি হারিয়ে গেছো, আর পাবো কিনা,
আমি তাই, খুঁজি তোমায়, কোথায় কোথায় ?
রাহুলঃ এখানে, এখানে।।

—— x ——

সঙ্গীত লহরী

কথাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ রাহুল দেব বর্মন
সুরঃ রাহুল দেব বর্মন

মনে পড়ে রুবী রায়, কবিতায় তোমাকে
একদিন কত করে ডেকেছি
আজ হায় রুবী রায়, ডেকে বলো আমাকে
তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি।

রোদ জ্বলা দুপুরে, সুর তুলে নুপুরে
বাস থেকে তুমি যবে নাবতে
একটি কিশোর ছেলে, একা কেন দাঁড়িয়ে
সে কথা কি কোনদিন ভাবতে।
মনে পড়ে রুবী রায়, কবিতায় তোমাকে
একদিন কত করে ডেকেছি
আজ হায় রুবী রায়, ডেকে বলো আমাকে
তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি।

দীপজ্বলা সন্ধ্যায়, হৃদয়ের জানালায়
কান্নার খাঁচা শুধু রেখেছি
পাখি সে তো আসেনি, তুমি ভালোবাসোনি।
স্বপ্নের জাল বৃথা বুনেছি।
মনে পড়ে রুবী রায় রুবী রায়, কবিতায় তোমাকে
একদিন কত করে ডেকেছি
আজ হায় রুবী রায়, ডেকে বলো আমাকে
তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি।।

—————— x ——————

সঙ্গীত লহরী

কথাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ রাহুলদেব বর্মন
সুরঃ রাহুলদেব বর্মন

কে কাঁদে কাঁদেরে
হায় রে হায় রে হায় রে মা কাঁদে।
রাত দুপুরে, ভাঙা ঘরে, একটি ছেলের জন্ম হল।
বাপ তার চুরির দায়ে গেছে জেলে
মা তাই কাঁদে, ছেলেও কাঁদে
দুঃখিনী মা তাই কাঁদে, ছেলেও কাঁদে।
কত যে দিন গেল, রাত গেল হায়
ছেলে তার বড় হল।
বেকার ছেলে, গুণ্ডার দলে, নাম তো লেখালো।
চোখের মণি, ছেলেটি আজ, রাতের শনি হল।
আজ তাই মা, কেঁদে কেঁদে শুধু, ভাঙে অবসাদে।
মা কাঁদে, কাঁদে রে কাঁদে কেন
হায় রে হায় রে হায় মা কাঁদে।
গভীর রাতে, চলল গুলী, ছেলেটির প্রাণ গেল,
চোরের ছেলে, মরলো পথে, রক্তে রাঙা হলো।
জানলো না কেউ, এলো না কেউ, কে যে কি হারালো
মা কাঁদে। কাঁদে রে। মা কাঁদে রে।
মা কাঁদে কেন। হায় মা কাঁদে।

——— x ———

কথাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ রাহুলদেব বর্মন
সুরঃ রাহুলদেব বর্মন

ফিরে এসো অনুরাধা, ভেঙে দিয়ে সব বাঁধা,
প্রিয়তমা, মোনালিসা, তুমি আমার ভালোবাসা।
বলেছিলে তুমি গান গেয়ে
খোঁপা থেকে ফুল দিয়ে
হবে আমার বঁধু তুমি।
সাগর হবে মরুভূমি।
ফিরে এসো অনুরাধা, ভেঙে দিয়ে সব বাঁধা।
চলে গেলে, চলে গেলে
এত প্রেম, ভুলে গেলে
ভুলে গেলে এত সাধ, এত সাধ
অনুরাধা।
ফিরে এসো অনুরাধা, ভেঙে দিয়ে সব বাঁধা,
প্রিয়তমা, মোনালিসা, তুমি আমার ভালোবাসা।

— x —

সঙ্গীত লহরী

কথাঃ শচীন ভৌমিক
কণ্ঠঃ রাহুলদেব বর্মন
সুরঃ রাহুলদেব বর্মন

স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে, তারই স্মৃতিটুকু মনে আছে।
ছেলেটি কি আপনার ?
হ্যাঁ। আপনি কে ?
আমি ? আমি কেউ না। আমি তো এক অচেনা।
আমারও একটি ছেলে ছিল। আমারও একটি বৌ ছিল।
তাই নাকি। কোথায় তারা ?
নেই। সেই দস্যুরা এলো। বৌটাকে আমার
ধরে নিয়ে চলে গেল।
ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠলো। বাঁচাও বাবা, মাকে বাঁচাও।
পারলাম না বাঁচাতে কাউকে, জানেন। পারলাম না
বাঁচাতে কাউকে।
ছেলেটা দেখলাম মরেই গেছে। আর আমার
সব কিছু হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে।
স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে, তারই স্মৃতিটুকু মনে আছে।
জানেন আমি বাঁশি বাজাতাম। সেই যে বাঁশের বাঁশি।
তাই শুনে আমার ছেলের কি হাসি।
আমার স্ত্রী আমাকে খুব ভালোবাসতো
সুন্দর রাঁধতো। আর কি সুন্দরই না গান গাইতো।
শুনবেন ?
আমি যখন রাঁধতে বসি, তুমি তখন বাজাও বাঁশি
ধোয়ার ছলে কাঁদতে বসি, প্রাণ তো মানে নারে, প্রাণ তো মানে না
সেদিন রাতে, এ গানটিই গাইছিলাম। ও আর আমি।
দু'জনই আত্মহারা। স্ত্রী আর স্বামী।
এমন সময় ওরা এল, সব চুরমার করে ভেঙেদিল
আমি পাগল হয়ে গিয়েছি।
স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে, তারই স্মৃতিটুকু মনে আছে।।

——— x ———